শহীদুল জহির

নির্বাচিত উপন্যাস



শহীদুল জহির

SHAMABESH



শহীদুল জহির লেখেন শহীদুল জহিরের মতই। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জগতে তিনি হয়তো নিঃসঙ্গও, তেপান্তরের পথে কে যায়, যেতে চায়? শহীদুল জহিরের প্রথম উপন্যাস *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* তার দ্বিতীয় উপন্যাস, প্রকাশকাল ১৯৯৫ এ। এই দুটো বই নিয়েই এই সঙ্কলিত গ্রন্থ।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

বাঙ্গালি মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, বর্তমানে যারা বাংলাদেশের বাসিন্দা তাদের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন, কেউ কেউ দেখেন নাই। মানুষ সমাজ দেশ স্বাধীনতার ধারাবাহিকতায় এগিয়ে গেছে, পরিবর্তিত হয়ে গেছে অনেক কিছু– আমাদের জীবন এবং জীবনের আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিন্যাস। আমরা ব্যস্ত হয়েছি, আমরা ব্যস্ত থেকেছি বর্তমান নিয়ে, ভবিষ্যত চিন্তায়– মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সরে গেছে দূরে, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ওপারে ধুলা এবং কুয়াশার ভিতরে– আমরা ভুলে গেছি, ভুলে থেকেছি, কিন্তু আমরা ভুলে গেছি কি? সকলেই?

সে রাতে পূর্ণিমা ছিল

এই গল্প একটা গ্রামের, মফিজউদ্দিন এবং চন্দ্রভান, মোল্লা নাসিরউদ্দিন এবং দুলালি, আবু বকর সিদ্দিক এবং আলেকজানের। এই গল্প মফিজউদ্দিনের বন্ধু করিম খাঁর ছেলে আফজাল খাঁর পরিবারেরও। গরীব কৃষকের বংশধর, আমরা, আমাদের পথচলার গল্প এটা, এই গল্প আমাদের উত্থান এবং পতনের। একটা গ্রামতো একটা দেশই– আমরা বিবর্তিত হই, আমাদের গ্রামের সামাজিক সম্পর্কের সূত্রগুলো পাল্টায় এবং আমরা দেখি আমাদের দেশই বদলে যাচ্ছে। এই ধারা চলে। অথবা এই গল্প হয়তো শুধুই ভালবাসার, প্রেমের, ভালবাসার অলৌকিক আনন্দের এবং বেদনার হেমকান্তি সৌন্দর্যের।



ISBN 984 8243 40 2

টাকা ২৭৫.০০



আধুনিক ও নিরীক্ষাধর্মী সাহিত্য ও অনুবাদগ্রন্থ
প্রকাশনা এবং পরিবেশনা

শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা
সে রাতে পূর্ণিমা ছিল

শহীদুল জহির



সমাবেশ
ঢাকা ২০০৭॥

শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস
শহীদুল জহির

প্রথম প্রকাশ : সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
পৃথ্বীশ প্রত্যয়
সমাবেশ
২৭ আজিজ মার্কেট (দ্বিতীয় তলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬২৭৬৬, ৯৬৬৩৫২৩, ই-মেইল : pathak@bol-online.com
Website : www.pathakshamabesh.com

প্রচ্ছদ : সেলিম আহ্‌মেদ

অক্ষরবিন্যাস
পাঠক সমাবেশ কম্পিউটার

মুদ্রণ
কালচার প্রেস, ঢাকা

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা; প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।
সে রাতে পূর্ণিমা ছিল; প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।

Shaheedul Jahir Nirbachita Upannash
© Shaheedul Jahir
First Published : February 2007
Publisher :
Prithish Prottoy
SHAMABESH
27 Aziz Market (First Floor)
Shahbag, Dhaka 1000
Tel : 88-02-9662766, 9663523

Bangladesh ISBN 984-8243-40-2

Outlet - 1 PATHAK SHAMABESH, Gulshan, 204/B Tejgoan Link Road, Tel : 9861003
Outlet - 2 . PATHAK SHAMABESH, Shahbag, 17/A Aziz Market, G.F. Tel : 9662766

উৎসর্গ

আব্বা (মরহুম) ও
মাকে

লেখকের অন্যান্য বই

১. ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প (মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪)
২. মুখের দিকে দেখি (মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬)
৩. শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প (সমাবেশ, ২০০৭)।

সূচি

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

উনিশ শ পঁচাশি সনে একদিন লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনের যুবক আবদুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়ে ফট করে ছিঁড়ে যায়। আসলে বস্তুর প্রাণতত্ত্ব যদি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে হয়তো বলা যেত যে, তার ডান পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতে বস্তুর ব্যর্থতার জন্য নয়, বরং প্রাণের অন্তর্গত সেই কারণে ছিন্ন হয়, যে কারণে এর একটু পর আবদুল মজিদের অস্তিত্ব পুনর্বার ভেঙে পড়তে চায়। রায়সা বাজারে যাওয়ার পথে কারকুন বাড়ি লেন থেকে বের হয়ে নবাবপুর সড়কের ওপর উঠলে তার স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায় এবং সে থেমে দাঁড়ায়। তখন নবাবপুরের মানুষ আর যানবাহনের শব্দ ও চাঞ্চল্যের ভেতর সে আরো অধিক কিছু অনুভব করে। মানুষ আর গাড়ি যে শব্দ সৃষ্টি করে, যে শব্দ সম্পর্কে মানুষ সব সময় সচেতন হয় না, তার বাইরে, এক ঝাঁ ঝাঁ শব্দের জগতে সে ঢুকে পড়ে। সে দেখে, নবাবপুরের ওপর অপরাহ্নের ম্লান আকাশ উইপোকায় ছেয়ে আছে আর পলায়নপর উইয়ের পেছনে অসংখ্য কাক হুটোপুটি করে। তার মনে হয় যেন কাকের চিৎকার এবং উইপোকার নিঃশব্দ পলায়ন প্রচেষ্টার দ্বারা নবাবপুর রোডের ম্রিয়মাণ বিকেলের ভেতর এক ধরনের নীরব সন্ত্রাসের অনুভব ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার ইন্দ্রিয় আর একটি বিষয়ে সচেতন হয়, সে খুব নিকটে লাউড স্পিকারের শব্দ শোনে। নবাবপুর রোডে সে সময় অবস্থানকারী প্রতিটি লোকের মতো সে এই শব্দের উৎস সন্ধান করে এবং তার সামনে, রাস্তার উল্টোদিকে পুলিশ ক্লাবের কাছে মাইক্রোফোন হাতে আবুল খায়েরকে দেখতে পায়। আবদুল মজিদ দেখে, আবুল খায়ের একটি দাঁড় করানো রিকশায় বসে মাইক্রোফোন মুখের কাছে তুলে কথা বলে আর রিকশার হুডের ওপর বসানো চোঙের ভেতর থেকে তার কথা বিস্ফারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আবদুল মজিদ তখন, সেই ক'টি মুহূর্ত, কাক এবং উইপোকার ওপর চোখ রেখে আবুল খায়েরের কথা শোনে। আবুল খায়ের কি বলে তা নবাবপুরের ওপর দিয়ে তখন চলমান সকলেই বুঝতে

পারে। আবুল খায়ের বলে, আপনেদের ধন্যবাদ। সকলে তার এই কথা তেমন বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই বুঝতে পারে, কারণ যারা তার কথা শুনতে পায় তারা সকলেই জানে কোন প্রসঙ্গে আবুল খায়ের এই কথা বলে। তারা জানে আগের দিন বিভিন্ন দলের আহ্বানে যে হরতাল হয়েছিল, পরদিন, কাকের চিৎকার এবং যান্ত্রিক শব্দের ভেতর আবুল খায়ের তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দেয়। আবদুল মজিদের মনে হয়, তার হৃদয়টি বহুদিন থেকেই বিদীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এই দিন, উইপোকার হত্যাযজ্ঞের বিষণ্ন বিকেলে আবুল খায়েরের কথা শুনে তার হৃদয়ের তন্তু তার স্যান্ডেলের ফিতার মতো পুনরায় ছিন্ন হয়। আবদুল মজিদ যখন তার দৃষ্টি আবুল খায়েরের দীর্ঘ এবং তরুণ শ্মশ্রু আর নীল রঙের জোব্বার ওপর রাখে, তার মনে হয়, আকাশে যত কাক ওড়ে সেগুলো আবুল খায়েরের জোব্বার ভেতর থেকেই যেন বের হয়ে আসে। তার মনে হয়, এ সেই কাক; সে তো জানে কাকের সঙ্গে আবুল খায়েরের পারিবারিক সূত্রে ঘনিষ্ঠতা। তার পিতা বদরুদ্দিন মওলানার সে এক অজ্ঞাত রহস্যময় ভালোবাসা ছিল কাকের জন্য। লক্ষ্মীবাজারের লোকদের মনে পড়ে, একাত্তর সনে বদু মওলানা নরম করে হাসত আর বিকেলে কাক ওড়াত মহল্লার আকাশে। এক থালা মাংস নিয়ে ছাদে উঠে যেত বদু মওলানা আর তার ছেলেরা। মহল্লায় তখনো যারা ছিল, তারা বলেছিল, বদু মওলানা প্রত্যেকদিন যে মাংসের টুকরোগুলো আকাশের দিকে ছুড়ে দিত, সেগুলো ছিল মানুষের মাংস। কারণ, মহল্লার সবচাইতে প্রাচীন মুসলমান পরিবারটির প্রধান, খাজা আহমেদ আলী বলেছিলেন যে, একদিন এক টুকরো ছুড়ে দেয়া মাংস কাকেরা ধরতে ব্যর্থ হলে সেটা এসে পড়েছিল তার বাড়ির ছাদের ওপর। তিনি ছাদের ওপর বিকেলের একচিলতে রোদে বসে অতীত যৌবনের স্মৃতির ভেতর নিমজ্জিত হয়ে ছিলেন, তখন মাংসখণ্ডটি তার পায়ের কাছে এসে পড়ে। তিনি কিছুক্ষণ দেখে অনুধাবন করেন যে টুকরোটির গায়ের একদিকে চামড়া রয়ে গেছে এবং তিনি দেখেন যে এই চামড়া একেবারে মসৃণ। এসব কথা মহল্লার সকলে পরে জেনেছিল। সেই বিকেলে মাংসটুকরোটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি দেখেন যে, সেটার গায়ে ছোট্ট মুসুরের ডালের মতো একটি পাথরের ফুল। তিনি হাহাকার করে ওঠেন, দুহাতের অঞ্জলিতে টুকরোটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বড় ছেলে খাজা শফিকের সহায়তায় সেটা দাফন করেন নিজের বাড়ির আঙিনায়। তারপর মাগরিবের নামাজ পড়ার সময় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। একটি অদেখা মেয়ের জন্য লক্ষ্মীবাজারের এক বিষণ্ন বৃদ্ধের হৃদয় সেদিন ভেঙে পড়ে। এখন তার বাসার আঙিনায় তার নিজের আর তার বড় ছেলের জোড়া কবর। অন্য একটি টুকরো, সেটা ছিল পায়ের বুড়ো আঙুলের, পেয়েছিল এক অচেনা পথিক, রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর। আবু করিমের বড় ছেলে সেটা দেখেছিল এবং লোকে সব জেনেছিল। আঙুলটির নখ খুব বড় এবং শক্ত ছিল এবং নখের ওপর ঘন এবং মোটা লোম ছিল। নখে লাগানো ছিল টকটকে লাল নখরঞ্জক। রঞ্জকের কথা শুনে সবাই ভেবেছিল যে

সেটা একটি মেয়েমানুষের পায়ের আঙুল, তারপর ঘন মোটা কেশের কথা শুনে সবাই ভেবেছিল, সেটা পুরুষের। তারপর সবাই ভেবেছিল সেটা একজন হিজড়ের হবে। আঙুলের এই কাটা টুকরোটির কি হয়েছিল, তা কেউ জানে না। কিন্তু আবু করিমের বড় ছেলেটি রায়সা বাজারের দোকান থেকে ফেরার পথে একদিন নিখোঁজ হয়। অন্য আর একটি টুকরো পড়েছিল জমির ব্যাপারির বাড়ির কুয়োতলায়, বিকেলে ভাতের চাল ধোয়ার সময়, হাঁড়ির ভেতর। এটা ছিল একটি কাটা পুরুষাঙ্গ। হাঁড়ির ভেতর এসে পড়তেই জমির ব্যাপারির কিশোরী কন্যাটি চমকে উঠেছিল, কিন্তু হাঁড়ির ভেতর থেকে বের করে এনে সে বস্তুটি চিনতে পারে নাই। সে সেটা তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলে ব্যাপারির স্ত্রী অভিজ্ঞতার কারণে জিনিসটা চিনতে পারে। কাটা লিঙ্গটি খাতনা করানো, মুণ্ডিত। ব্যাপারির স্ত্রী সেটা দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তার মেয়ে 'এটা কি মা', 'এটা কি মা' করতে থাকলেও সে তাকে কিছু বলে না। সে মানুষের কাটা জননেন্দ্রিয়টি একটি ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রেখে দেয়। রাতে জমির ব্যাপারি বাসায় ফেরার পর তাকে ন্যাকড়া খুলে জিনিসটি দেখালে সে একই সঙ্গে তার স্ত্রী এবং অন্য সকলের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন তার সেই মেয়েটি ফিসফিস করে জিনিসটি কি জানতে চাইলে সে বলে, ল্যাউড়া। এর পরেও মেয়েটি জিনিসটি চিনতে পারে না, তার মনে হয়, তার পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে গাল দিল। এরপর জমির ব্যাপারি ন্যাকড়ায় জড়ানো অঙ্গটি সে রাতেই বদু মওলানার বাসায় গিয়ে দিয়ে আসে। এ সবই মহল্লার লোক বিস্তারিত জানতে পারে। বদু মওলানার দ্বিতীয় তরুণী স্ত্রী লতিফা বদু মওলানার সামনে বসে উপহারটির মোড়ক খুলে অনাবৃত করেই তা হাত থেকে ফেলে দেয়, এ মা, জোঁক মনে হয়। বদু মওলানা তার পরেও চৌকি থেকে ওঠে নাই। তখন তরুণী লতিফা ভালো করে বাতি জ্বেলে একটি পেন্সিলের চোখা আগা দিয়ে খুঁচিয়ে দেখে জিনিসটি চিনে ফেলে এবং বদু মওলানা তখন জানতে চায় জিনিসটি কি। তার স্ত্রী তার কথার উত্তর না দিয়ে নিরুত্তর থাকলে সে শোয়া থেকে উঠে ঝুঁকে পড়ে ভয়াবহ লিঙ্গটা দেখে। তখন তার স্ত্রী বলে, মুসলমানের। এ কথা শুনে বদু মওলানা নির্বাক হয়ে থাকে। বদু মওলানা কেন নির্বাক হয়েছিল সেটা প্রথমে বোঝা যায় না, তবে বদু মওলানা এই ভেবে নিশ্চয়ই বিচলিত হয় নাই যে দেহাঙ্গটি একজন মুসলমানের। বস্তুত একাত্তর সনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মহল্লায় প্রথম যে ব্যক্তি নিহত হয়, সে ছিল একজন মুসলমান ও অপ্রাপ্তবয়স্ক। বদু মওলানার এই তথ্যটি মনে রাখার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মহল্লার লোকদের সেটা মনে থেকে যায়। তাদের এই কথাটি আজীবন মনে থেকে যায় যে একাত্তর সনে মহল্লায় প্রথম নিহত হয়েছিল, আলাউদ্দিন; যে মোটর গ্যারেজে কাজ করত এবং নিহত হওয়ার দিন, তার মায়ের হিসেবে অনুযায়ী, তার বয়স হয়েছিল তেরো বৎসর। আলাউদ্দিন নিহত হওয়ার পর মহল্লার লোকদের সেই কথাটিও মনে পড়েছিল, যা এখনো তাদের মনে আছে যে, হাফপ্যান্টের এক পাশ গুটিয়ে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে পেশাব করার

সময় তার শিশ্নের ওপর নজর পড়ায় বদু মওলানা ক্ষেপে গিয়েছিল একদিন, হারামযাদা, খাঁড়ায়া খাঁড়ায়া মোতচ, খাঁড়ায়া মোতে কুত্তা। তখন আলাউদ্দিন কয়েক দিন পর নির্মমভাবে নিহত হওয়ার শর্ত পূরণ করেছিল। প্রথমত, সে বদু মওলানার কথা শুনে গালের ভেতর জিভ নেড়ে তাকে ভেঙায়, তারপর বলে, কুত্তা তো মুখ দিয়া খায়বি, আপনে অখনথন হোগা দিয়া খায়েন। বদু মওলানাকে এই অশ্লীল কথা বলায়, তার বাপ শুনতে পেয়ে, তাকে পেয়ারা গাছের সঙ্গে বেঁধে বেদম প্রহার করে, আর আলাউদ্দিন 'আর করুম না, আর করুম না' বলে চিৎকার করলে মহল্লার লোকেরা বিশদ জানতে পারে। এর তিন মাস নয় দিন পর, একদিন দুপুরে, মহল্লার লোকজন যখন 'মিলিটারি আইছে', 'মিলিটারি আইছে' বলে কাকের তাড়া খাওয়া উইপোকার মতো দৌড়াচ্ছিল এবং যেদিন প্রথম বদু মওলানা এবং ক্যাপ্টেন ইমরান পরস্পরকে আবিষ্কার করে, আলাউদ্দিনের প্রাণ-বিযুক্ত দেহ মহল্লায় তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ে। তাই বোঝা যায় যে, বদু মওলানা যখন কাটা পুরুষাঙ্গটি দেখে নির্বাক হয়ে থাকে তা এই কারণে নয় যে, তার স্ত্রীর কথায় সে জেনেছে অঙ্গটি একজন মুসলমানের। সে লতিফার কথায় তার এই প্রতিক্রিয়ার মূল বিষয়টি নিজের সঙ্গে দীর্ঘ বোঝাপড়া শেষে ভীরুতার আবরণ খসিয়ে ভোররাতে উদ্‌ঘাটন করে। সে বুঝতে পারে, লতিফা, অপরিচিত একজন পুরুষের যৌনাঙ্গ অবলোকন শুধু করে নাই, এ ব্যাপারে সে অনেক আগ্রহ দেখিয়েছে; সে সেটাকে পুরুষের যৌনাঙ্গ হিসেবে শনাক্ত করেছে। তার পরেও সে ছাড়ে নাই, সে শনাক্ত করেছে যে, সেটা মুসলমানের। বিষয়টি জানা হয়ে যাওয়ার পর বদু মওলানার নির্বাক বিষণ্নতা দূর হয়ে যায়। সে লতিফাকে ডেকে তুলে তিন তালাক দেয়। মহল্লার লোকেরা অনেকে পালিয়ে গেলেও, যারা ছিল, তারা পরে বিস্তারিত সব জানতে পারে। সব ঘটনার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ পরদিন বদু মওলানার দ্বিতীয় তরুণী স্ত্রীটি বাসা ত্যাগ করে এবং তার আগে লক্ষ্মীবাজারে রাত জুড়ে একটি নারীকণ্ঠের করুণ এবং একটানা কান্নার শব্দ সকলকে জাগিয়ে রাখে। কেউ তাদের বাসা থেকে এগিয়ে যায় না। বাতি না জ্বেলে, বিছানায় শুয়ে থেকে মহল্লার অবশিষ্ট লোকেরা শনাক্ত করে যে, বদু মওলানার দ্বিতীয় স্ত্রী, সুন্দরী গ্রাম্য তরুণী লতিফা কাঁদে; তার কোনো কষ্ট হয়েছে। সকলে অন্ধকারে জেগে থাকে, কেবল একবার অসহ্য লাগলে কিশোর আবদুল মজিদ বাতি জ্বালে। পরদিন সকালে আবদুল মজিদের মা, বদু মওলানার বাসায় গেলে সে সেখানে জড়ো হওয়া আরো সব লোককে বলে যে, তার কিছুই হয় নাই। সে ঈশ্বরের প্রশংসা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ দেয়। তার বাসায় আগত এই লোকদের ভেতরে সে দুজনের সঙ্গে পৃথক আচরণ করে। প্রথমে সে আবদুল মজিদের বিধবা মাকে বলে যে, এই মহল্লায় এখনো তাদেরই কেবল সাহস রয়ে গেছে। তারপর সে হঠাৎ করে জমির ব্যাপারির শুকনো গালে চপেটাঘাত করে, কিন্তু সে তাকে একটি কথাও বলে না। উপস্থিত জনতা এই সব বিমূঢ় বিস্ময়ে দেখে, যেমন বিমুগ্ধ

দর্শক দেখে জাদুকরের ব্যাখ্যাতীত আচরণ, এবং বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, তারা নীরবে অবলোকন করে যায়। তারা দেখে, চড় খাওয়া জমির ব্যাপারি এবং প্রশংসিত আবদুল মজিদের মা– দুজনের চেহারাই একই রকম বিষণ্ন এবং বিপদগ্রস্ত মনে। মার্চের পঁচিশ তারিখের পূর্বের দিনগুলোর নিদারুণ উৎকণ্ঠা আর হীনম্মন্যতা কাটিয়ে বদু মওলানা দ্রুত যে গাম্ভীর্য এবং আত্মপ্রত্যয় অর্জন করে, সেটা এক মুহূর্তের জন্য ভেঙে পড়ার সুযোগে জমির ব্যাপারি তার ভেতরটা দেখে ফেলার সুযোগ পায়। এবং আর-একটি সকাল আসার আগে বাড়ির দরজায় তালা ঝুলিয়ে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে সে সাড়ে সাত মাসের জন্য নিখোঁজ হয়। চড় খেয়ে সে বেঁচে যায়, কিন্তু আবদুল মজিদের মা তার পরিবারকে ক্ষয়ক্ষতিহীন রাখতে পারে না। বদু মওলানার প্রশংসায় আতঙ্কিত হয়ে এই বিধবা রমণীটি ঘরে ফিরে ছেলেমেয়েদের সেই কথাটিই বলে, যে কথাটি বদু মওলানা তাকে বলেছিল, কইলো, মহল্লার ভিতরে আপনেগোই অখনও সাহস আছে, কেন কইলো? কেন বলল, সেটা তার চার ছেলেমেয়ের কেউ বলতে পারে না। তারা শুধু শুনে রাখে এবং বিপদগ্রস্ত বোধ করে তাদের মায়ের মতো। তারা তাদের গোটা সংসারে সাহসের কোনো উপাদান খুঁজে পায় না; পরিবারের বয়স্ক পুরুষটি পাঁচ বছর হলো মৃত, একমাত্র ছেলেটির বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর, বড় মেয়েটির বয়স কুড়ি এবং এখনো অনূঢ়া। এরকম একটি পরিবার সাহসের অভিযোগে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিশোর আবদুল মজিদ সারা দিন কপাল কুঁচকে রাখে, তারপর সন্ধেয় তার মা আর বড় বোনের দিকে তাকিয়ে বলে বাদ দেও, বাদ দেও তো। সে এমনভাবে বলে যে, যেন সে ধরে নেয় তার মা ও বোন তারই মতো একই প্রসঙ্গে চিন্তিত হয়ে আছে, এবং সে দেখে যে তার ধারণাই ঠিক। কারণ তার কথা শুনে তার বোন বলে, হ, এই লয়া ভাবিছ না। কিন্তু আবদুল মজিদের মনে হয়, সেই ভাবনার শেষ নাই। সে তারপর, জীবনের বিভিন্ন সময়ে এই উপলব্ধিটা আবিষ্কার করেছিল যে, কৈশোরের আতঙ্কের সেই দিনে সে যে বিষয়টি বাদ দেয়ার কথা বলেছিল সেটা কোনোভাবেই বাদ হয়ে যায় নাই এবং তাই, পনেরো বছর পর সেই একই আলখাল্লা পরা বদু মওলানার ছেলে, খায়ের মওলানার কথা শুনে রায়সা বাজারে বাজার করতে যাওয়া ত্যাগ করে সে ছেঁড়া স্যান্ডেল হাতে বাসায় ফিরে তার স্ত্রী ইয়াসমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দেখে ইয়াসমিনের শীর্ণ গ্রীবার গোড়ায় একটি শিরা দপদপ করে, সে সেখানে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে; মোমেনার গলার পাশে এই জায়গায় বেয়োনেট গেঁথে দেয়া হয়েছিল। স্ত্রীর মুখের ওপর চোখ রেখে তার পুনরায় সাহস এবং সাহসহীনতার কথাটি মনে আসে। আবদুল মজিদ জানে, এমনকি কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সে এই রহস্যটি জেনেছিল যে, তাদের ঘৃণা ছিল। এবং বদু মওলানা হয়তো সেই কথাটি বলেছিল তার মাকে, বদু মওলানার স্ত্রী যেদিন বাড়ি ত্যাগ করে সেদিন সকালে। আবদুল মজিদ বুঝতে পারে যৌবনে পদার্পণ করেও সে কেমন দুর্বল

পুরুষ, তার ভয় হয় এবং সে সর্বদা কেমন শঙ্কিত; কিন্তু তার পরেও সে ভুলে যেতে পারে না ঘৃণার কথা এবং ইয়াসমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় তার ঘৃণা থেকে ক্রোধ উৎসারিত হয়। হয়তো এই শীতল আগুনের মতো ক্রোধ বদু মওলানা দেখেছিল, হয়তো এখনো দেখে। আবদুল মজিদ বুঝতে পারে, ঘৃণার এই সাহসে তার ভীরু জীবন কেমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইয়াসমিনের বাহুর ভেতর নিজেকে সমর্পণ করে সে সুস্থির হতে চায়, এই দ্যাশের মাইনষেরে এ্যালায় বদু মওলানার পোলায় কয়, ভাইছাব। কয়, আপনেগো ধন্যবাদ। জ্বরগ্রস্তের মতো আবদুল মজিদ ইয়াসমিনের গলা জড়িয়ে ধরে 'আপা, আপা' বলে ফোঁপায়। এই ভীরুতায় তার লজ্জা করে, কিন্তু সে কিছু করতে পারে না। সে বুঝতে পারে, সাহসী হওয়াটা প্রয়োজন। কিন্তু সাহসী হওয়ার নিয়ম সে খুঁজে পায় না; জীবনে সে ক্রমাগতভাবে সাহসী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যায়। প্রথম যেদিন কিশোর আবদুল মজিদ সাহসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, সে ঠিক করেছিল যে, সে গুণ্ডা হয়ে যাবে। কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ার সময় মোমেনাকে বদু মওলানা রাস্তায় গাল দিলে সেদিন সে ভেবেছিল এর প্রতিকার সে একমাত্র গুণ্ডা হয়েই করতে পারে, তখন এই লক্ষ্মীবাজার এলাকায় মোমেনা ছিল একমাত্র মুসলমানের মেয়ে যে গান গাইত। বাসন্তী গোমেজের সঙ্গে তার ভাব ছিল। আর বাসন্তী গোমেজ তাকে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের চার্চে প্রার্থনা-সঙ্গীতে অংশগ্রহণের জন্য নিয়ে যেত। মোমেনা ওয়ারিতে সিলভারডেল স্কুলের এক অনুষ্ঠানে গান গেয়ে ফেরার সময় বদু মওলানা সামনে পেয়ে তাকে গাল দেয়। সেদিন ঘরে ফিরে মোমেনা এক অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় ছটফট করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিলাপ করেছিল, কয় কি, ডিম পারবার যাও। হারামির পোলা আমারে কয় কি, মাগি, ডিম পারবার যাও। মোমেনা আপাকে দেখে আবদুল মজিদের মনে হয়েছিল, তাকে মুরগির মতো জবাই করে কুয়োতলায় ঝাঁকার নিচে চাপা দেয়া হয়েছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আবদুল মজিদ তখন সেই অনুভূতিটির বিষয়ে সচেতন হয়েছিল, যার নাম ঘৃণা এবং আক্রান্ত হয়েছিল সেই আবেগের দ্বারা, যার নাম প্রতিহিংসা। কিশোর আবদুল মজিদ অনুভব করতে পেরেছিল যে, সে মোমেনা আপার অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায়, কান্দিচ না আপা, মান্দারপোর থোতা ফাটায়া দিয়া আমুনে। কিন্তু সে নিশ্চিতরূপেই বুঝতে পারে নাই সে কিভাবে তা করবে এবং ওই সময়ই সে সেই বোধটিও আবিষ্কার করে, যার নাম কাপুরুষতা। এই বোধের সামনে দাঁড়িয়ে আবদুল মজিদ ঠিক করে যে, সে করিমের মতো গুণ্ডা হবে এবং বাসন্তী গোমেজের ভাই পঙ্কজ গোমেজের মতো পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গিটার বাজাবে। কিন্তু তার কিছুই করা হয় না। সে দিনকয় গুণ্ডা হওয়ার পথ খুঁজে বেড়ায়, করিমের সঙ্গে সিগারেট টানে, মেয়ে-দেখে ঠোঁট টেনে ধরে লম্বা করে শিস দেয়। কিন্তু এসব কিছুতে সে হয়রান হয়ে যায়, তার মা এবং মোমেনার জন্যও সে আর এগোতে পারে না। তার মা তার পকেটে সিগারেট পেয়ে তাকে বকাঝকা করে, তারপর

মোমেনা তার চৌকির পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে তার দায়িত্বের কথা বলে, তুই এমুন করচ! তর উপরে মার কত আশা, তুই পইড়াশুইনা কত বড় হবি। আবদুল মজিদ মোমেনার মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে থাকে, তারপর তার মোমেনার যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে, কয় কি, ডিম পারবার যাও, মাগি। কিশোর আবদুল মজিদের চোখ সেইদিন অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে যায়। নোনা পানির তল থেকে যেন সে শ্যামল পৃথিবীর দিকে তাকায়, সে মোমেনা আপার মুখ দেখে। তার বুকের ভেতর যে বেদনা হয়, সেই বেদনায় সে জীবনে প্রথম ভালোবাসার কথা টের পায়। সে মোমেনার শাড়িতে মুখ গুঁজে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে; যে মোমেনাকে, সে তখনো জানে না, সে আবিষ্কার করবে মৃত, গলার বাম দিকে কাঁধের কাছে বেয়োনেট বিঁধিয়ে দেয়ার এক হা-করা ক্ষত– মুখটা কাত হয়ে আছে। মায়ের চোখ এবং মোমেনা আপার শাড়ির মাড়ের ঘ্রাণ আবদুল মজিদকে গুণ্ডা হয়ে উঠতে দেয় না এবং এর সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় যখন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলসহ সে নাইনে ওঠে এবং বাসন্তী গোমেজ তাঁদের পারিবারিক পাঠাগারের দরজা তার জন্য খুলে দেয়। বাসন্তী গোমেজদের বইয়ের ভেতর সে ধুলো আর ন্যাপথলিনের গন্ধ আবিষ্কার করে এবং একসময় তার মনে হয় যে তার আর রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বদু মওলানাকে 'মান্দারপো' বলে গাল দেয়ার পথ নাই। বদু মওলানা আবদুল মজিদের শত্রু হয়ে যায় যেদিন সে তার বোনকে কুৎসিত কথা বলে এবং তার বোন অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরায়, এবং সে পুরো মহল্লার শত্রু হয়ে যায় একাত্তর সনে নয়াবাজারের লেলিহান আগুনে আকাশ জ্বলে ওঠার পরের দিনগুলোতে। তখন সে হঠাৎ করে কাঁধের ওপর কালো খোপ খোপ চেকের স্কার্ফটি ফেলে এগিয়ে আসে এবং মহল্লার লোক পাঞ্জাবি মিলিটারির পাশে তাকে দেখে বুঝতে পারে না সে বাঙালি কি না এবং লক্ষ্মীবাজারে যারা শেষ পর্যন্ত টিকে থেকে তারা পুরোটা বছর তার কাক ওড়ানো দেখে। তারা দেখে, বদু মওলানার একাত্তরের প্রথম দিককার চেহারার টানাপোড়েন পঁচিশে মার্চের পর কেমন প্রশান্ত হয়ে আসে এবং মহল্লায় যেদিন প্রথম মিলিটারি আসে সে দিন সে কিভাবে আবিষ্কৃত হয়। মহল্লার লোকেরা সেদিন মাত্র এক ঘণ্টার প্রলয়ের পর বুঝতে পারে তার বিশেষ মর্যাদার কথা। সেদিন এক ঘণ্টায় মিলিটারি প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে, মহল্লায় নিহত হয় সাত জন, তিন জন নারী তাদের শ্লীলতা হারায়। নিহত সাত জনের নাম মহল্লাবাসী একটু পরেই জানতে পারলেও ধর্ষিতা তিন জন নারীর নাম কেউ জানতে পারে না; সে তিনজনকে তারা শনাক্ত করতে পারে না, এমনকি বুঝতে পারে না তারা বালিকা, তরুণী, নাকি বৃদ্ধা। কারণ মহল্লার হতবিহ্বল লোকেরা খবরটা বদু মওলানার বাড়ির যে ভৃত্যের কাছ থেকে জানতে পারে, সেই ভৃত্য তিন জন মেয়ের নাম বলতে পারে না। মহল্লায় সাতটি লাশ এবং একটু পরেই কারফ্যু শুরু হওয়ার দুশ্চিন্তা নিয়ে বসে থাকা মানুষদের সে বলে যে, সে মিলিটারিদের মুখে শুনেছে তিন জন মিলিটারি তিনজন রমণীর সঙ্গে সহবাস

করেছে। মহল্লার লোকেরা তার কথা ফাঁকা দৃষ্টি মেলে শোনে এবং লাশগুলোর দিকে তাকায়। তারা তাদের পরিবারের বেঁচে থাকা লোকজন গুনে দেখে, পাঁচটি পরিবারে একজন করে কমে যায়, খাজা আহমেদ আলীর পরিবারে কম পড়ে দুজন। মহল্লার লোকজন জানতে পারে যে, মিলিটারি খাজা আহমেদ আলীর বাসায় প্রবেশ করেই তার বড় ছেলে খাজা শফিককে গুলি করে মারে। সে সময় বাড়ির প্রাঙ্গণে পিতা এবং পুত্র দুজনে দণ্ডায়মান ছিলেন। পিতার চোখের সামনে বিনা করণে খাজা শফিকের প্রাণ-বিযুক্ত দেহের পতন হলে পিতা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গিয়ে আজান দিয়েছিলেন। মহল্লাবাসী সকলেই পরে বলে যে, হ্যাঁ, তারা আজানের ধ্বনি শুনেছিল। সেই ঝঞ্ঝার সময় যখন দিনের আলো ছিল কৃষ্ণবর্ণ তরলের মতো এবং শব্দের জগৎ পাহাড় ভেঙে পড়ার মতো সহস্রখণ্ডিত, সেই সময় তারা শুনেছিল লক্ষ্মীবাজারের পলেস্তারা-খসা বাড়িগুলোর ছাদ ছুঁয়ে আজানের ধ্বনি গড়িয়ে যেতে। এবং তারা যখন জানতে পারে যে খাজা আহমেদ আলী ছিল সেই ঝঞ্ঝাকালের মুয়াজ্জিন, তারা সকলেই বলে যে, তারা যখন আজান শুনেছিল তারা তার কণ্ঠ চিনতে পেরেছিল। তারা সকলেই বলে যে, এমন মধুর স্বরে আজান দেয়া তারা ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই এবং তারা মনে করেছিল, বেলালের কণ্ঠই কেবল এমন হতে পারে। তারা এ-ও বলে যে, তিনি আজান দেয়া সমাপ্ত করেছিলেন এবং আজানের শেষ স্তবকে দুবারের জায়গায় তিনি চারবার 'আল্লাহু আকবর' বলেছিলেন। কিন্তু মহল্লার লোকেরা যখন খাজা আহমেদ আলীর ছাদে গিয়ে তার মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে এবং জানতে পারে যে, আজানের মাঝখানে তাকে গুলি করা হয়, তারা তা মেনে নিতে পারে না। তারা বলে যে, তিনি আজানের শেষে চারবার মহল্লার সকলকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ। তারা বিভ্রান্ত বোধ করে এবং তাদের এই বিভ্রান্তি আজীবন থেকে যায়। তারা খাজা আহমেদ আলীর লাশ চিৎ করে দেখে তার মুখের শুভ্র দাড়িতে রক্তের বুদ্বুদ লেগে আছে। তখন তারা তার লাশ নামিয়ে এনে উঠোনে খাজা শফিকের লাশের পাশে রাখে। সেদিন মহল্লার রাস্তা আর বাড়ি থেকে তারা মোট সাতটি লাশ সংগ্রহ করে। মৃত ব্যক্তিদের সকলে ছিল পুরুষ এবং এদের ভেতর সবচাইতে কম বয়স্ক বালকটির বয়স ছিল তেরো বৎসর এবং সবচাইতে বৃদ্ধের আশি। এদের ভেতর দুজন ছাড়া অন্য সকলকে তারা মাটির ওপর থেকে কুড়িয়ে আনে, যেন তারা ঝড়ে উৎপাটিত সেইসব বৃক্ষ সরিয়ে আনে, যেগুলো শাখা পল্লব বিস্তার করে আঙিনায় খাড়া ছিল। অন্য দুজনের একজন, খাজা আহমেদ আলীকে পাওয়া যায় অন্তরীক্ষে আর চৌষট্টি নম্বর বাড়ির আলতাফ হোসেনকে কুয়োর পানিতে। আলতাফ হোসেন গুলি খেয়ে পানিতে পড়েছিল, না পানিতে পড়ার পর গুলি খায়– তা মহল্লার লোক প্রথমে বুঝতে পারে না। দড়ি আর হুক নামিয়ে লাশ টেনে তোলার পর গুলির ক্ষত খুঁজতে গিয়ে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা কোনো গুলির ক্ষতের চিহ্ন দেখে না এবং তাদের মনে হয় যে, সে হয়তো পানিতে ডুবে মরেছে। কিন্তু পরে মহল্লার লোকেরা

বলে যে, তখন তারা কুয়োর পানির দিকে খেয়াল করে দেখে যে পানি রক্তের মতো লাল হয়ে আছে এবং তখন তারা আবার সর্বত্র অনুসন্ধান করে আলতাফ হোসেনর মাথার চাঁদিতে চুলের ভেতর সরু ক্ষতটা আবিষ্কার করে। কিন্তু তারা গুলির নির্গমন পথ দেখে না; তারা নিশ্চিত হয় যে, যে গুলিতে আলতাফ হোসেন তার প্রাণ হারিয়েছে সেই গুলিটিকে তার দেহ বেরুতে দেয় নাই। এতে মৃত আলতাফ হোসেনের কি লাভ হয়েছিল সে কথা মহল্লার লোকেরা বলে না, তারা শুধু বলে, গুলি ঢুকছে, কিন্তু বাইরয়া পারেনিকা। এবং চাঁদির মধ্যখানে গুলির ক্ষত দেখে তারা নিশ্চিত হয় যে, কুয়োর পানিতে পড়ে যাওয়ার পর তাকে গুলি করে মারা হয়। মহল্লার লোকেরা সবগুলো মৃতদেহ খাজা আহমেদ আলীর বাড়ির উঠোনে এনে জড়ো করে এবং কারফ্যুর ভেতর কোথাও যেতে না পেরে লাশ নিয়ে বসে থাকে। সাতটি লাশ নিয়ে তাদের বিহ্বলতা হয়, শোকের উচ্ছ্বাস হয় না। সেদিন সাতটি লাশ নিয়ে লক্ষ্মীবাজারের জনতা নির্বাক হয়ে বসে ছিল; লক্ষ্মীবাজারের রাস্তা মৃতের মতো নিঃশব্দ ছিল, রাস্তায় একটি কুকুর ছিল না, আকাশে একটি পেঁচা উড়ে আসে নাই বাতাসে ডানার শব্দ করে। তাদের মনে হয়েছিল, তারা সৃষ্টির আদি থেকে কোনো শব্দ শোনে নাই। কিন্তু তারপর, রাত ক্রমাগত বাড়তে থাকলে তারা বুঝতে পারে, একটি নারীর কান্নার শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। অনেকটা বিস্মৃতির তল থেকে যেন তারা মানুষের এই ধ্বনিগত আচরণের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং দেখে যে, তারা নিজেরা কেউ কাঁদে না। তারা বরং কান পেতে অচেনা রমণীর কান্নার শব্দ শোনে, আস্তে আস্তে তাদের এমন মনে হতে থাকে যে, কান্নার এই শব্দ এমনকি মিলিটারি চলে যাওয়ার আগেই তারা পেয়েছিল। মহল্লার লোকেরা তখন নিশ্চিত হয় যে, আরো একটি লাশ কোথাও রয়ে গেছে, কোনো বাড়িতে, যাদের সঙ্গে যেভাবেই হোক, অন্যান্যদের যোগাযোগ ঘটে নাই। তারা তখন তাদের অসাড় হয়ে আসা ইন্দ্রিয় সজাগ করে শোনে এবং বুঝতে পারে যে. কান্নার শব্দ বদু মওলানার বাড়ির দিক থেকে ভেসে আসে। বদু মওলানার বাড়িতেই কেউ দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদছে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মহল্লার মানুষের প্রথমে অবিশ্বাস হয়, তারপর তারা তাদের শোকের ভেতরে উল্লসিত হতে থাকে। কারণ, মহল্লার লোকেরা বদু মওলানাকে সেদিন একটু আগে দেখেছে একা, পৃথক পরিচয়ে। একদল খাকি পোশাক পরা লোকের সঙ্গে ধূসর রঙের পপলিনের জোব্বায় আবৃত বদু মওলানা লক্ষ্মীবাজারের রাস্তায়, ঘরে, আঙিনায়, কুয়োতলায়, বাড়ির ছাদে শিকারোৎসব করেছিল। এখন এই কান্নার শব্দে মহল্লার লোকদের ক্ষোভ এবং উল্লাস একত্রিত হয়ে তাদেরকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যায়, যখন তাদের মনে হয় যে, বদু মওলানার রক্তের রমণীকে কাঁদতে না দেখলে তাদের এই শোকের শেষ হবে না, তাদের এই উল্লাস পূর্ণ হবে না। তখন মহল্লার লোকেরা বদু মওলানার বাসায় যায় এবং গিয়ে তারা ভুল বুঝতে পারে। তারা জানতে পারে যে. প্রথমত যে কাঁদছিল. সে কোনো নারী নয়. সে বদু মওলানার ছোট ছেলে

আবুল বাশার। আবুল বাশার কাঁদছিল কারণ, পাকিস্তানি মিলিটারি আবুল বাশারের প্রিয় কুকুর ভুলুকে গুলি করে মারে। মহল্লার লোকেরা বদু মওলানার উঠোনে ইলেকট্রিকের আলোয় লালচে খয়েরি রঙের ভুলুকে ঘিরে বসে থাকা বাড়ির চাকরদের দেখে। তারা জানতে পারে যে, ভুলুকে যে কারণেই হোক মেরে ফেরার পর আবুল বাশার কাঁদতে থাকলে বদু মওলানা তার মুখ চেপে ধরেছিল আর তখন মিলিটারিদের নেতা পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন, বদু মওলানাকে বলেছিল ছেলেকে ছেড়ে দিতে। বলেছিল, উনকো রোনেদো। লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা যখন বাড়ির ভেতর লাশ রেখে নিস্তব্ধতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল, ঠিক তখন পাকিস্তানি মিলিটারি বদু মওলানাকে এই বিশেষ মর্যদা দেয়। তার ছেলে নিহত প্রিয় কুকুরের জন্য শোক প্রকাশের পায় এবং মিলিটারি মহল্লা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই সে কান্না শুরু করে। আর মহল্লার লোকেরা নিহতের শোক নিয়ে পুরো রাত অপেক্ষা করে, পুরোটা বছর অপেক্ষা করে; সেই সময় পর্যন্ত, যখন হেমন্তের এক বৃহস্পতিবারে স্টেনগান হাতে, জলপাই রঙের পোশাক আর মুখ ভর্তি লম্বা দাড়ি নিয়ে একদল মুক্তিযোদ্ধা মহল্লায় এসে দাঁড়ায়। তারা বলে, আর ভয় নাই, শালারা খতম। মহল্লার লোকেরা রাস্তায় নেমে এসে জংলি চেহারার লোকগুলোর কাঁধে চাপড় দিতে থাকে। তখন গাঢ় সবুজ রঙের ভেতর লাল সূর্য এবং সোনালি মানচিত্র আঁকা একটি পতাকা নিয়ে আবুল কাশেমের ছেলে জসিম দৌড়ে এসে চিৎকার করে ওঠে, জয় বাংলা, আর তখন মুক্তিযোদ্ধা দেখতে এসে আলাউদ্দিনের মা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে ওঠে, অরা আমার আলাউদ্দিনরে মাইরা ফালাইছে। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেগুলো ধুলোয় লুটানো এই নারীকে টেনে তোলে না, কোনো সান্ত্বনা দেয় না, তারা তাকিয়ে দেখে না পর্যন্ত; তারা শুধু এই শোকার্ত নারীকে ঘিরে রাখে। তাদের সকলের পিঠে ঝোলানো আগ্নেয়াস্ত্র এবং কোমরের বেল্টে বাঁধা গুলির বাক্স। তারা নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, রোগা এবং নোংরা আঙুল দিয়ে লম্বা চুলের জট ছাড়ায়, সিগারেট ঠোকে। এদের বৃত্তের ভেতর আলাউদ্দিনের মা মাটির ওপর পড়ে থেকে কেঁদে নেয়। মহল্লায় মুক্তিযোদ্ধার আগমনের খবরে অন্যান্যের ভেতর তিনজন নারীর বিশেষ ঔৎসুক্য হয়, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে জনতার সঙ্গে অপরিমিত চুলদাড়ি গজানো এবং নোংরা পোশাক পরা ছেলেগুলোকে দেখে। তারপর, তারা যখন এগিয়ে এসে এই নিরাসক্ত তরুণদের কাছে নিজেদের পুত্রদের পরিচয় প্রকাশ করে এবং তাদের সম্পর্কে জানতে চায়, তখন দাড়িওয়ালা এই জংলি তরুণরা তাদেরকে ঘিরে ধরে এবং পিতা যেমন কন্যাকে বাহুর ভেতর নেয়, সেভাবে তাদের কাঁধের ওপর হাত রেখে বলে যে, তাদের ছেলেরা ফিরবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের এই কথা সর্বাংশে সত্য প্রমাণিত হয় না; বাবুল এবং আলমগীর ফিরে আসে কিন্তু মোহাম্মদ সেলিম ফিরে আসে না। তার মায়ের সব প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়, তার ছেলেটি মুক্তিযুদ্ধ শেষে আর ফেরে না। সে বুঝতে পারে সে আর ফিরবে না, তবু তার মন পুরনো প্রতীক্ষায় জেগে থাকে। মহল্লার লোকেরা বলে যে, মোহাম্মদ সেলিমের জন্য

তার মা প্রতীক্ষা করে আছে, আর আছে মায়ারাণী মালাকার। কিন্তু আবদুল মজিদ জানে যে, মায়ারাণী মোহাম্মদ সেলিমের জন্য প্রতীক্ষা করে না, সে অবশ্য জানে না মায়ারাণী তবে কার প্রতীক্ষা করে এবং কেন ক্রমাগতভাবে কুমারী থেকে যায়। আবদুল মজিদ নিশ্চিতভাবেই জানে, যুদ্ধের পর মোহাম্মদ সেলিমের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা যখন শেষ হয়ে যায় তখন তার বাক্স ভেঙে মায়ারাণীর লেখা যে একটিমাত্র চিরকুট পাওয়া যায়, সেটা মায়ারাণী লেখে নাই। একমাত্র আবদুল মজিদ এই দুর্ভাগ্যজনক তথ্যটি জানে যে, মোহাম্মদ সেলিমের একুশটি প্রেমপত্রের উত্তরে এক লাইনের যে পত্রটি তার হস্তগত হয়েছিল সেটা আসলে মায়ারাণীর লেখা ছিল না। আবদুল মজিদ পারিবারিক ঝামেলায় নিমজ্জিত হয়ে না থাকলে শোনে, শনিবার সন্ধেয় মায়ারাণী শনিপুজো করে। তার বিষণ্ন কণ্ঠ পাশের বাড়ি থেকে দেয়ালের ওপর দিয়ে এমন এক বাউলসঙ্গীতের মতো ভেসে আসে, যার অর্থ সে বোঝে না। শনিবারের সন্ধেয় মায়ারাণী বিষণ্ন স্তোত্রের মতো উচ্চারণ করে— আসেন শনি বসেন খাটে, পস্‌সাদ দেব হাতে হাতে। আবদুল মজিদ বুঝতে পারে না মায়ারাণী কেন শনিকে ডাকে, তবে তার মনে হয় এই অনন্ত আহ্বানে তার কোনো আনন্দ নেই, তার কণ্ঠে শুধু বিষণ্নতা। আবদুল মজিদের মনে পড়ে, মায়ারাণীর মায়ের কণ্ঠে এমন বিষণ্নতার ঘোর ছিল না। সে সময়, সে যখন হাফপ্যান্ট পরত, তখন, শনিবার সন্ধেয় সে দুবাড়ির মাঝখানের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে থাকত। তখন মায়ারাণীর মা আসত মাথায় ঘোমটা টেনে, কপালে থাকত পূর্ণিমার চাঁদের মতো বড় এবং গোল সিঁদুরের টিপ। মায়ারাণীর মা কাঁসার থালার ওপর সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে ফটকের কাছে তুলসী গাছের কাছে এসে বসত এবং একইভাবে শনিকে ডাকত। তুলসী গাছের গোড়ায় বাঁধানো নিচু বেদির ওপর রাখা প্রদীপ জ্বলত, আদুল মজিদ শুনত মায়ারাণীর মার শনি-আবাহন— আসেন শনি বসেন খাটে, পস্‌সাদদ দেব হাতে হাতে। এভাবে পুজো হয় গেলে, মায়ারাণী হাতে করে একটি বড় বাটি নিয়ে আসত এবং প্রাঙ্গণে অপেক্ষমাণ বালক-বালিকা ও দেয়ালের ওপর বসে থাকা আবদুল মজিদের প্রসারিত করতলের ওপর কলা ও দুধ মাখানো ভিজে চিড়ার একটি করে মণ্ড অর্পণ করত। আবদুল মজিদের এখন কখনো কখনো মনে হয়, হাত পাতলে একইভাবে তার হাতে প্রসাদ তুলে দেবে কালো এবং বোকাটে চেহারার মায়ারাণী। মোহাম্মদ সেলিম কেন এই কালো মেয়েটিকে দেখে বিমোহিত হয়েছিল তা আবদুল মজিদ বুঝতে পারে না, তবে তার মনে হয়, মোহাম্মদ সেলিমের যে রকম প্রাণপ্রাচুর্য ছিল তাতে তার পক্ষে কালো মায়ারাণীর প্রেমে পড়া এবং সেই প্রেম ত্যাগ করে যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব ছিল। মায়ারাণী তখন বাংলাবাজার স্কুলে দুবার ফেল করার পর তৃতীয়বার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সেই সময় মোহাম্মদ সেলিম পুষ্পশরে বিদ্ধ হয়ে বেপথু হয়ে পড়ে। মহল্লার লোকেরা কয়েক দিন মোহাম্মদ সেলিমের অস্বাভাবিক ব্যবহার অবলোকন করেছিল, তারা খেয়াল করেছিল মোহাম্মদ সেলিম, মায়ারাণী রাস্তায় বের

হলে তার পিছনে ধীরগতিতে এলেবেলেভাবে সাইকেল চালাতে থাকে অথবা রাস্তার মোড়ে চুলে টেরি কেটে দাঁড়িয়ে থাকে হাঁ-করে। তারা এ-ও খেয়াল করেছিল যে, মোহাম্মদ সেলিমের এই উত্তেজনার প্রতি মায়ারাণীর লক্ষ ছিল না, সে বুকের ওপর বই চেপে ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হেঁটে যেত। মোহাম্মদ সেলিমের প্রণয় উত্তেজনায় মহল্লার লোকেরা বিরক্ত হয়ে ওঠার আগেই তারা লক্ষ করে যে, তার উত্তেজনা নেমে গেছে। আসলে তখন মোহাম্মদ সেলিম এই সত্যটি আবিষ্কার করে যে, আবদুল মজিদ প্রতি শনিবারে মায়ারাণীর নিজ হাতে তুলে দেয়া দুধ-কলার প্রসাদ খায় এবং সে মায়ারাণীকে প্রেম নিবেদনের পন্থা বদলে ফেলে। তখন তার তৎপরতা লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়ে যায়। সে আবদুল মাজিদকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার পিতার কনফেকশনারির দোকানের বয়াম খুলে তার হাত ভরে লাড্ডু বিস্কুট দেয় এবং বলে, ল, খা। আবদুল মজিদের এখন মনে হয়, সে নির্বোধের মতো লাড্ডু বিস্কুট খেয়েছিল, কারণ তার পরদিনই মোহাম্মদ সেলিম তাকে একটি চিঠি দেয় মায়ারাণীকে পৌঁছে দেয়ার জন্য। আবদুল মজিদ এবারও নির্বোধের মতো সেটা নিয়ে যায় মায়ারাণীর কাছে এবং মায়ারাণী তাদের শেফালি ফুলগাছ তলায় দাঁড়িয়ে সেটা নিতে অস্বীকার করলে আবদুল মজিদ চিঠিটা এনে তাদের ঘরের ভেতর ইট খসানো একটি ফোকরের ভেতর রেখে দেয়। এভাবে, মোহাম্মদ সেলিমের ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষার আগে যখন যুদ্ধ লেগে যায় এবং সে মায়ারাণীকে রেখে যুদ্ধে চলে যায়, তখন পর্যন্ত আবদুল মজিদদের বাড়ির দেয়ালের ফোকরে একুশটি চিঠি জমা হয়। আবদুল মজিদের পরবর্তী সময়ে মনে হতো যে, মোহাম্মদ সেলিমের ভালোবাসা পাওয়া উচিত ছিল, মায়ারাণীর উচিত ছিল এটুকু তাকে দেয়া; কারণ সে তো ছিল তাদেরই একজনের মতো, যারা একদিন শরীরে যুদ্ধের ক্লান্তি এবং বারুদের গন্ধ নিয়ে এসে মহল্লায় দাঁড়িয়েছিল আর তখন আলাউদ্দিনের মা এতদিন পর ধুলোয় বিছিয়ে পড়ে কান্নার উৎসব করেছিল। আর যেদিন খাজা আহমেদ আলীর উঠোনে পুরনো মাদুর এবং চাটাইয়ের ওপর আলাউদ্দিনের লাশ অন্য ছটি লাশের সঙ্গে রাখা ছিল সেদিন তার মা চুপ করে বসে ছিল, ভীত মূঢ় জন্তুর মতো। সেদিন মহল্লায় শুধু আবুল বাশার কেঁদেছিল। সেই কান্নার শব্দ একবার শোনার পর মহল্লার লোকদের মনে হয়েছিল যেন সে রাতে আবুল বাশারের কান্না সকাল পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। এই বালকটি যে বদু মওলানার খুব প্রিয় সন্তান ছিল, মহল্লার সকলে তা জানত। এই কারণেই হারাম জীবপোষায় ছেলের ইচ্ছেয় সে সম্মত হয়েছিল এবং ফলে এই কুকুরের জন্য শোক করার অনুমতি দেয়ায় তার হৃদয় আপ্লুত হয়, পুত্র, পুত্রের কুকুর এবং সেই পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের জন্য। কিন্তু একাত্তর সনের উত্থান-পতনের কারণে বদু মওলানা কালক্রমে তার এই ছেলেটিকে হারায়; তার আর কোনো বড় ক্ষতি হয় না। এই একটি মৃত্যু ছাড়া সে তার পরিবারকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া-বিষয়ক তার যে দুর্যোগ হয় সেই অবস্থার ভেতর দিয়ে পার করে নিয়ে

আসে এবং আশি সনে সেই একই দলের বড় নেতা হয়। আবদুল মজিদ এখন দেখে আজিজ পাঠানদের সঙ্গে বদু মওলানার দল একসঙ্গে সরকারবিরোধী আন্দোলন করে। আবদুল মজিদ শোনে মহল্লার মানুষকে বদু মওলানা এবং তার ছেলেরা 'ভাইসব' বলে সম্বোধন করে সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য ডাক দেয়। শুনে আবদুল মজিদের স্যান্ডেলের ফিতে ফট্ করে ছিঁড়ে যায়; সে দেখে, বদু মওলানার ছেলের আলখাল্লার ভেতর থেকে কাক ওড়ে। সে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে তার মৃত বোনের কথা ভুলে যেতে পারে না; তার ঘাড়ের পাশে বেয়োনেটের ক্ষত ছিল, বুকের নিচ থেকে ছিন্নভিন্ন ছিল এবং দেশ যখন মুক্তি প্রক্রিয়ার শেষ সীমানার নিকটে পৌঁছেছিল তখন সে রায়েরবাজারে একটি মাঠের ওপর আকাশের দিকে স্থির চোখ রেখে পড়ে ছিল। আবদুল মজিদ বদু মওলানার সেই সব দিনের কথা ভুলতে পারে না, কারণ সে মোমেনার কথা ভুলতে পারে না। সে নবাবপুর রোডের ওপর মাইকে বদু মওলানার ছেলের দেয়া ধন্যবাদের মুখোমুখি হয়ে ঘরে ফিরে ইয়াসমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তখন মহল্লার ভেতর আবার মাইকের শব্দ বিকশিত হয়। এই লোকটিও তাদেরকে 'ভাইসব' বলে সম্বোধন করে হরতাল সফল করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করে। 'জয় বাংলা' বলে সে এই বিবৃতি শেষ করে, তারপর আবার 'ভাইসব' বলে শুরু করে। মহল্লার লোকেরা বিভ্রান্ত বোধ করে। তাদের এই কথাটি হয়তো অকারণেই মনে পড়ে যে, যেদিন বদু মওলানা তার কালো চেকের স্কার্ফটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে এসে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের সম্মুখে দাঁড়ায়, সেদিন মহল্লায় আজিজ পাঠান অনুপস্থিত ছিল। আবার সে বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে সে যখন মহল্লায় সপরিবারে প্রত্যাবর্তন করে তখন মহল্লায় বদু মওলানা ছিল না। মহল্লার লোকদের মনে পড়ে, মহল্লায় যেদিন প্রথম মিলিটারি আসে, বদু মওলানা তাদেরকে আজিজ পাঠানের বাড়িতে নিয়ে যায়। মিলিটারি আজিজ পাঠানের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তার বাড়ির গেটে নৌকো দিয়ে তৈরি তোরণে একজন মিলিটারি 'শালা' বলে গাল দিয়ে একঝাঁক গুলি করে, তারপর বাড়ির সঙ্গে সেটা ভস্মীভূত হয়। আজিজ পাঠান কবে মহল্লা ত্যাগ করে তা লোকেরা মনে করতে পারে না, তাদের শুধু মনে পড়ে, মার্চের পঁচিশ তারিখের পর একদিন বদু মওলানা একদল লোক নিয়ে আসে। তারা মহল্লার হিন্দুদের বাসার তালা ভেঙে লুট করে। তারা আজিজ পাঠানের বাসার তালা ভেঙে সব জিনিসপত্র বদু মওলানার বাসায় নিয়ে জড়ো করে। তারা শাবল দিয়ে এই লুণ্ঠিত বাড়িগুলোর পুরনো দরজা আর জানালা চৌকাঠসহ খুলে নেয়। তারপর মিলিটারি যে দিন আজিজ পাঠানের বাড়িতে আগুন দেয় তখন সেটা পুড়তে চায় না; শুধু গুলি খাওয়া, গলুই ভাঙা নৌকোটা দাউদাউ করে জ্বলে। মহল্লার লোকেরা এই বিষয়ে অবগত ছিল যে, বদু মওলানা আজিজ পাঠানের সব অস্থাবর সম্পত্তি নিজের বানিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঘটনা এমন আকার নিয়ে ঘটে, যাতে করে মহল্লার লোকদের মনে হয় যেন বদু মওলানা, আজিজ

পাঠানের সম্পত্তির জিম্মেদারি গ্রহণ করেছিল মাত্র। একাত্তর সনের শেষ বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বরের ত্রিশ তারিখে আজিজ পাঠান ফিরে এলে মহল্লার মানুষ উল্লসিত হয়ে পড়ে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত দীর্ঘদেহী আজিজ পাঠান নিজের বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে লক্ষ্মীবাজারের রাস্তা দিয়ে বিজয়ী সেনাপতির মতো পা টেনে টেনে হেঁটে যায়। তাকে দেখে পুত্র এবং স্বামীহারা নারীরাও হর্ষধ্বনি করে। আজিজ পাঠান মহল্লার প্রতিটি বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রতিটি লোকের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়, তারপর খাজা আহমেদ আলী এবং তার ছেলের কবর জিয়ারত করে নিজের বাসায় যায়। তার দরজা-জানালার চৌকাঠ ওপড়ানো দগ্ধ বাসা কঙ্কালের করোটির মতো দেখায়। সে তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে একবার মুখ তুলে বিধ্বস্ত বাড়ির দিকে দেখে, তারপর ঘুরে দাঁড়ায় রাস্তায় তাকে অনুসরণ করে আসা এবং নীরবে অপেক্ষমাণ জনতার দিকে। তার চেহারায় জনতা দুঃখ কিংবা বিষাদ লক্ষ করে না। সে তার হাত তখন জনতার দিকে বাতাসে উড়তে থাকা পতাকার মতো প্রসারিত করে দিলে তারা ঢেউয়ের মতো উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চায়। তখন সে স্মিত মুখে বলে, আমাগো অনেক কিছু দেওন লাগচে, তবু আমরা স্বাধীন হইচি। আজিজ পাঠান তার বাসায় প্রবেশ করার পর মহল্লার লোকেরা বদু মওলানার বাড়ির দরজা ভেঙে সব জিনিসপত্র এনে আজিজ পাঠানের উঠোনে স্তূপ করে রাখে। এইসব জিনিসপত্র পরীক্ষা করে আজিজ পাঠানের স্ত্রী বলে যে, এ সবই তাদের, শুধু দুটো বস্ত্রখণ্ড ছাড়া। এ কথা শুনে মহল্লার লোকেরা সন্তুষ্ট হয় এবং কিছুক্ষণ পর যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। এই সময় কয়েক দিন পর বদু মওলানার লুণ্ঠিত পরিত্যক্ত বসতবাড়ি এবং আজিজ পাঠানের বাসার সামনে পুনরায় নির্মীয়মাণ এক কাঠের নৌকা দেখে কিশোর আবদুল মজিদের বুকের ভেতরের সেই সংকটের টানাপোড়েন অবচেতনভাবেই নেমে যায়, যার সূচনা হয়েছিল বদু মওলানা মোমেনাকে গাল দেয়ার পর। সে ঘরে ফিরে তার মাকে খবরটা দিয়ে আশ্বস্ত করে, আজিজ পাঠানের বাসার গেটে এউকগা নতুন নাও বানাইবার লাগছে। কিন্তু বাহাত্তর সনের গোড়ায় মহল্লার লোকেরা এবং আবদুল মজিদ বুঝতে পারে নাই যে, বিষয়টির নিষ্পত্তি তখনো হয় না এবং তারা আরো অনেক কিছু দেখবে। তারা জানে নাই যে, আজিজ পাঠানের বাড়ির ফটকে নির্মিত নৌকোটি জীর্ণ হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার আগেই, দুবছরের ভেতর বদু মওলানা মহল্লায় ফিরে আসবে এবং লক্ষ্মীবাজারের রাস্তা দিয়ে প্রথমে ছায়ার মতো হেঁটে যাবে তারপর আশি সনে আবদুল মজিদ সহ তারা কেউ কেউ একদিন বদু মওলানাকে দেখবে তার ভারপ্রাপ্ত আমিরকে সংবর্ধনা প্রদান করতে। আবদুল মজিদ কলতাবাজারের মোড়ের পানির ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে বদু মওলানার বক্তৃতা শুনবে। এই বক্তৃতা থেকে মহল্লার লোকেরা সেদিন জানতে পারবে, স্বাধীনতার পর পলাতক অবস্থায় কিভাবে বদু মওলানার আদরের ছেলে মারা যায়। এখন মহল্লার লোকদের মনে পড়ে সেদিন বক্তৃতার সময় বদু মওলানা আকাশের দিকে দুহাত উঁচু করে ধরে বলেছিল যে, সেটা

ছিল এক পরীক্ষা। আল্লাহ যেমন হযরত ইব্রাহীমকে প্রিয় পুত্র কোরবানি করতে বলে পরীক্ষা করেছিলেন, তেমনি তারও জীবনে পরীক্ষা আসে এবং সে তখন তার প্রিয়তম পুত্রকে হারায়। তিয়াত্তর সনে বদু মওলানা মহল্লায় ফিরে আসার পর মহল্লার লোকেরা জানতে পারে আবুল বাশারের মৃত্যু হয়েছে এবং যদিও এই মৃত্যুর কারণ তারা আশি সনে দেয়া বদু মওলানার বক্তৃতার আগে জানতে পারে না, তারা মনে করে, এটা এক রকমেঃ প্রতিশোধ। পরে বদু মওলানা হজরত ইব্রাহীম এবং তার পরীক্ষার বিষয়ে যেদিন বর্ণনা করে, মহল্লার লোকেরা যারা তখন তার বক্তৃতা শুনছিল, জানতে পারে যে, আবুল বাশার খেপুপাড়ার এক গাঁয়ে লুকিয়ে থাকার সময় পুকুরের পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল। মহল্লার লোকেরা একটি ব্যাপারে একমত ছিল যে, আবুল বাশার, বদু মওলানার যথার্থই প্রিয় ছিল। এ ব্যাপারে মহল্লাবাসীর একটি তত্ত্ব ছিল এই যে, এই বালকটির একধরনের পঙ্গুত্ব ছিল এবং তাই তার পিতার বিশেষ দুর্বলতা ছিল তার প্রতি। আবুল বাশারের পঙ্গুত্বের ব্যাপারে মহল্লার লোকদের এই সন্দেহ পরবর্তী সময়ে সঠিক প্রমাণিত হলেও প্রথমে তারা নিশ্চিত ছিল না। তারা বলেছিল যে, আবুল বাশার বালক অথবা বালিকা কোনোটিই নয়। এই ধারণার সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না, তবে কথাটি ছড়িয়ে গেলে তারা সন্দেহ করতে থাকে কিন্তু নিশ্চিত হতে পারে না। বদু মওলানা তার এই ছেলেটিকে জন্মের পর থেকেই ডেমরায় তার শ্বশুর বাড়িতে রেখে দেয় এবং মহল্লায় যখন সে প্রথম আসে তখন সে ছবছরের বালক এবং মহল্লার লোকেরা দেখে যে, তাকে সব সময় কাপড়চোপড় পরিয়ে রাখা হয়। বিষয়টি মহল্লার লোকের জন্য কোনোভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না, কিন্তু তাহলেও ব্যাপারটি সম্পর্কে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যখন ডিসেম্বরের একুশ তারিখে জিঞ্জিরায় রাজাকার আবদুল গণি ধরা পড়ে। আবদুল গণিকে সেদিনই দুপুরে লক্ষ্মীবাজারে নিয়ে আসে দুজন মুক্তিযোদ্ধা এবং তার নিকট থেকে লোকেরা জানতে পারে এতদিন দেশে এবং মহল্লায় যা কিছু ঘটেছে তা কেমন করে ঘটেছে। প্রথমত, নয় মাসে মহল্লায় নিহত ব্যক্তিদের ছাড়া আটজন নিখোঁজ লোকের তালিকা ছিল মহল্লার লোকদের কাছে। এর ভেতর তিনজন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে গৃহত্যাগ করেছিল বলে পরে জানা গিয়েছিল, অন্য পাঁচজন সম্পর্কে তাদের জানার প্রয়োজন ছিল। দুপুরের একটু আগ দিয়ে আবদুল গণিকে এনে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের ভেতরের প্রাঙ্গণে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এ অবস্থায় সে কিছু বলতে অস্বীকার করে, তার চেহারা এবং চাহনি দেখে জনতার কোণঠাসা শৃগালের কথা মনে পড়ে। তখন তাকে ভিক্টোরিয়া পার্কের চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে একটি পাকা বেঞ্চের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেয়া হয়। তাকে এমনভাবে শোয়ানো হয় যেন তার মাথাটা বেঞ্চের বাইরে থাকে। তারপর তাকে দড়ি দিয়ে বেঞ্চের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে তার মুখের নিচে পেতে দেয়া হয় একটি নিচু টেবিল এবং টেবিলের ওপর বসানো হয় একটি মাইক্রোফোন, রাখা হয় তিনটি দীর্ঘ নামের

তালিকা, আর মুখের নাগালের ভেতর স্ট্র-সহ একটি ভিটাকোলার বোতল। তারপর একজন মুক্তিযোদ্ধার এসএলআরের নল তার লুঙ্গি উঁচু করে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। তখন চারদিক থেকে লোক এসে শহীদ সিপাইদের স্মৃতিস্তম্ভের সিঁড়ি এবং বেদির ওপর এবং নিচে সবুজ ঘাসের চত্বরে জমা হয়। তারা বুঝতে পারে না এসএলআরের নলটি রাজাকার আবদুল গণির পাছার ছিদ্রের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে কি না। তাদের একদলের মনে হয় নলটা প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য দল নিশ্চিত হয় যে, নলটি ঢোকানো হয় নাই; কারণ আবদুল গণি যখন নড়ছিল তখন লুঙ্গির তল দিয়ে বেরিয়ে থাকা অস্ত্রটি নড়ছিল না। তারা বলে যে, নলের মুখটি কেবলমাত্র উরুসন্ধিতে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল। তবে এই সময় তাদের তর্ক থেমে যায়, কারণ মাইকে আবদুল গণির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তিনটি তালিকা শেষ করতে আবদুল গণির দুঘণ্টার বেশি লেগে যায়। তালিকার নাম পড়ে সে কতগুলোকে শনাক্ত করে, কতগুলোকে শনাক্ত করতে পারে না। মাইকে যখন তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে, তাকে ঘিরে দাঁড়ানো জনতা এক অস্বাভাবিক নীরবতায় প্রস্তরীভূত হয়ে থেকে শোনে সেই দিনগুলোর কথা, যার ভেতর দিয়ে তারা পার হয়ে এসেছিল এক দুঃস্বপ্নের মতো এবং এখন তাদের মনে হচ্ছিল যেন তারা সবকিছুই নতুন শুনছে অথবা তারা কোনো কিছুই আগে জানে নাই। আবদুল গণি যখন একটি নাম শনাক্ত করছিল এবং বর্ণনা করছিল তার অন্তিম পরিণতির কথা, তখন জনতার ভেতর থেকে বিলাপ করে উঠছিল একটি পুরুষ, স্ত্রীলোক অথবা এমন কেউ নিখোঁজ ব্যক্তিটি ছিল যার স্বামী, সন্তান, বন্ধু অথবা প্রতিবেশী। আবদুল গণি যখন কথা বলা শেষ করে তখন ভিক্টোরিয়া পার্কের চত্বরে একুশ জন পূর্ণবয়স্কা নারী মাটি চাপড়ে বিলাপ করে, দশ জন পুরুষ এবং বালক ফোঁপায় আর গোটা জনতা উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। আবদুল গণির কাছ থেকে লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা জানতে পারে, আবু করিমের বড় ছেলেকে বাড়ি ফেরার সময় কলতাবাজার খাদ্য-গুদামের সামনে থেকে সন্ধের পর ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা রাতে জবাই করে। তার কাছ থেকে লক্ষ্মীবাজরের লোকেরা মালিটোলার ইসমাইল হাজামের নিহত হওয়ার কথা শোনে। লক্ষ্মীবাজারের নিখোঁজদের তালিকায় ইসমাইল হাজামের নাম না থাকলেও তখন তাদের তার নাম মনে পড়ে। বদু মওলানার বাড়ির বাইরের আঙিনায় জুন মাসের এক মঙ্গলবারে পাথরের শিলের ওপর পানি ছিটিয়ে সে ঘাড় গুঁজে ক্ষুর ধার দিচ্ছিল মহল্লার লোকের নিস্পৃহ ঘোলা দৃষ্টির সামনে। বদু মওলানার বাড়ি সেদিন রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছিল, মহল্লার লোকেরা সেটা দেখে ভেবেছিল, বদু মওলানা নিশ্চয়ই আর-একটি বিয়ে করছে। তাদের এ ভুল অবশ্য ভাঙে, কারণ বদু মওলানা তাদেরকে দাওয়াত করে, আর তারা এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে যখন বদু মাওলানার বাড়ি এসে হাজির হয়, আঙিনার আতা গাছের সবুজ ছায়ায় ইসমাইল হাজামকে দেখতে পায়। তারা পায়ের গোড়ালির নিচে এক

টুকরো কাঠ দিয়ে বসা ইসমাইল হাজামকে একমনে ক্ষুরে শান দিতে এবং ঝকঝকে ক্ষুরের কিনারায় হাতের বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে ধার পরীক্ষা করতে দেখে। তারা কেবলমাত্র তখন জানতে পারে যে, বদু মাওলানার ছেলে বাশারের খাতনা হবে; কারণ বদু মাওলানার চাকর যখন তাদের দাওয়াত করে, সে শুধু বলেছিল, মাওলানা সাবে আপনেরে দুপুরে যাইতে কইছে। এখন কথাটা জানতে পেরে মহল্লার লোকেরা হেসে উঠে এবং বদু মওলানার এই ছেলেটির পুরুষাঙ্গের অনুপস্থিতি সংক্রান্ত গুজব-নির্ভর তাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়। তারা আঙিনায় ডেকোরেটরের দোকান থেকে আনা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে থাকে, বাড়ির চাকর এবং আতাগাছ তলার ইসমাইল হাজাম ছাড়া তাদের সামনে আর কেউ আসে না। ইসমাইল হাজাম যেন অনন্তকাল ধরে ক্ষুরে শান দেয়, কিন্তু তার বুড়ো আঙুলকে তৃপ্ত করার মতো ধার যেন ওঠে না; সে বুড়ো আঙুল বুলিয়ে পুনরায় শিলের ওপর এপিঠ-ওপিঠ করে ক্ষুর ঘষে। ইসমাইল হাজামের ক্ষুর ঘষার শব্দে যখন মহল্লার লোকদের চোখে দুপুরের ঘুম এসে যায় তখন তাদের ক্লান্ত চোখের সামনে দিয়ে আবুল বাশারকে বদু মওলানা নিয়ে আসে। একটি আলপনা আঁকা মাদুরের ওপর তাকে বসিয়ে গোলাপ জল মেশানো পানিতে গোসল করিয়ে যখন ভেতরে নিয়ে যায় তখনো ইসমাইল হাজাম তার ক্ষুরে পরতের পর পরত ধার ওঠাতে থাকে। মহল্লার লোকেরা তার এই একঘেয়ে আচরণে বিরক্ত হতে গিয়েও তার প্রশংসা করে এই বলে যে, সে ক্ষুরে যে ধার চড়িয়েছে, এখন ক্ষুর এবং বালকের শিশ্ন কেউ বুঝে ওঠার আগেই বাড়তি চামড়াটুকু খণ্ডিত হয়ে পড়বে। একটু পর ইসমাইল হাজাম শেষবারের মতো আঙুল বুলিয়ে ক্ষুরটা যত্ন করে খাপের ভেতর রেখে সাদা পরিষ্কার ন্যাকড়া ভাঁজ করে মোটা সলতের মতো বানায়, তারপর সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে একটা কাটা কলাপাতার ওপর রাখে। লোকেরা ইসমাইল হাজামের কাজের কুশলতা দেখে। শিশ্নাগ্র ছেদনের জন্য ক্ষুর এবং ক্ষতে জড়িয়ে দেয়ার জন্য ছাইয়ের পট্টি তৈরি করার পর সে তার সব যন্ত্রপাতি নিয়ে রাবারের জুতোয় ফট্ ফট্ শব্দ করে বাড়ির ভেতরে যায়। এরপর মহল্লার লোকেরা আর কিছু দেখে না। ভেতরের যে ঘরে খাতনার মূল কাজটি সম্পন্ন হয় সেখানে মহল্লার কেউ ছিল না এবং সে সময় জানালাহীন সেই ঘরের দরজা লাগানো ছিল। এই সময় মহল্লার লোকেরা চলে আসতে পারত, কারণ গরম এবং ক্ষুৎপিপাসায় এমনিতেই তারা কাতর হয়ে পড়েছিল এবং তাদের সামনে তখন শূন্য উঠোন ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু কেন তারা তা না করে অপেক্ষা করে তা তারা বলতে পারে না। আসলে বন্ধ ঘরটির ভেতর তাদের দৃষ্টি না গেলেও তারা সকলেই যেন ব্যাপারটি দেখতে পায়। কারণ তাদের সকলেরই শিশ্নাগ্র ছিন্ন হয়েছিল এভাবে একদিন। তারা দেখে যে, আবুল বাশারের পরনের কাপড় খুলে নেয়া হয় আর তাতে তাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হয় বালকের ফর্সা নিতম্ব। তখন তাকে একটি পিঁড়িতে বসিয়ে তার পিতা পিছন থেকে তার পা এবং হাত পেঁচিয়ে চেপে ধরে তার উরুসন্ধি উঁচু এবং

উন্মোচিত করে তুলে ধরে হাজামের সামনে। তখন তারা আবার বালকের সামনে উবু হয়ে বসা ইসমাইল হাজামকে দেখতে পায় দ্রুত ক্রিয়ারত। তাদের মনে হয় যে, ইসমাইল হাজামের হাত এত দ্রুত কাজ করে যে, বালকটি গোঙানোর সময় পায় না, যেন একটিমাত্র মহূর্তে হাজামের ক্ষুর বালকের শিশ্নাগ্র পেঁয়াজের নরম খোসার মতো ছিন্ন করে এবং সেই একটি মুহূর্তের ভেতরই তারা শুনতে পায় বালকের চিৎকার। পরমুহূর্তে তারা হাজামকে যেন ক্ষুর হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ক্ষুর বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে এবং তাদের মনে হয় যেন, যে তৃষ্ণা ইসমাইল হাজাম তার ক্ষুরের শরীরে জাগিয়ে তুলেছিল তা রক্তের স্বাদ পেয়ে নেমে আসে। এবার সবকিছু দেখা হলে পড়ে মহল্লার লোকেরা হাসে। এই সময় ইসমাইল হাজাম ভেতর থেকে বের হয়ে আসে, সে উপস্থিত কাউকে কিছু বলে না, কারো দিকে তাকায়ও না, কিন্তু তারা বুঝতে পারে যে বদু মওলানার ছোট ছেলের খাতনা হয়ে গেল। এরপর তারা যার যার বাড়িতে ফিরে যায় এবং ফেরার পথে তাদের মনে পড়ে যে বদু মওলানা তাদেরকে ডেকে নিয়ে উঠোনে বসিয়ে রাখা ছাড়া এক গ্লাস শরবত দিয়েও আপ্যায়ন করে নাই। তারপর তারা ব্যাপারটি ভুলে যায় এবং এর ছমাস দশ দিন পর আবদুল গণি মাইকের সামনে উপুড় হয়ে ইসমাইল হাজামের নামোচ্চারণ না করা পর্যন্ত তা আর মনে করার প্রয়োজন এবং সময় তাদের হয় না। আবদুল গণির কথা শুনে তারা বুঝতে পারে যে ইসমাইল হাজামের ক্ষুরে ধার দেয়া দেখানোর জন্যই কেবলমাত্র বদু মওলানা সেদিন তাদেরকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখেছিল, কারণ তারা জানতে পারে যে, সেদিন ইসমাইল হাজাম আবুল বাশারের খাতনা করে নাই এবং সেই নাটকের পরবর্তী দিন আসার আগেই সে নিহত হয়। তাকে সে রাতেই তার মালিটোলার বাসা থেকে ডেকে এনে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে জবাই করা হয়। লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা জানতে পারে যে, ছমাস দশ দিন আগে জুনের উত্তপ্ত সেই দুপুরে ইসমাইল হাজামকে আবুল বাশারের শিশ্নাগ্র ছিন্ন করতে হয় নাই। তাকে শুধু ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পর তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয় এবং বলা হয় মুখ বন্ধ রাখার জন্য। ইসমাইল হাজাম মুখ খোলে নাই, কারণ মহল্লার লোকদের মনে পড়ে যে ইসমাইল হাজামের চোয়াল পাথরের মতো দেখাচ্ছিল এবং সে উঠোনে বসা কারো দিকে না তাকিয়ে আতা গাছের ছায়ার দিকে গিয়েছিল। তবু এখন সকলে বুঝতে পারে, ইসমাইল ক্ষুব্ধ হয়েছিল। হয়তো ব্যাপারটি এমন ছিল যে, সে অসীম ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তার ক্ষুরে যে ধার চড়িয়েছিল সেটা নিশ্চুপভাবে নামিয়ে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তার হয়তো মনে হয়েছিল যে, কোনোভাবেই কিছু বলতে না পারলে তার পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব। এখন মহল্লার লোকেরা ভিক্টোরিয়া পার্কের চত্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল গণির কাছ থেকে জানতে পারে যে, আতা গাছের প্রতারক সবুজ ছায়ায় প্রবেশ করে ইসমাইল হাজামের নিজের ওপর প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়, টিনের হাতবাক্সে জিসিনপত্র

গুছিয়ে রাখার সময় সে নিম্নস্বরে বিড়বিড় করেছিল। যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছিল, এমনভাবে উচ্চারণ করেছিল একটি বাক্য, যে বাক্যটি আবদুল গণির মুখ থেকে এবার মহল্লার লোকেরা শোনে, হালার হিজড়ার আবার মুছলমানি! এ সময় একটিমাত্র লোক তার শ্রুতিসীমার ভেতর ছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেই লোকটি ছিল আবদুল গণি। সে তখন লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়ে ছিল আর মালিটোলার ইসমাইল তাকে চিনতে পারে নাই। হয়তোবা আতা গাছের সবুজ ছায়ার ক্লোরোফিল তার চেতনা নাশ করেছিল সেই মুহূর্তের জন্য অথবা সে হয়তো আবদুল গণিকে সত্যি চিনত না। আবদুল গনি বলে যে, যখন ইসমাইল হাজাম এই কথা বলে তখন সে তার অর্থ বুঝতে পারে নাই, কারণ ব্যাপারটি কি তার জানা ছিল না। কিন্তু শত্রুপরিবৃত এই দেশে একজন সতর্ক রাজাকার হিসেবে এমনকি হাওয়ার গতিপ্রবাহ সম্পর্কেও সে বদু মওলানাকে সব সময় অবহিত রাখত। তাই সে ইসমাইল হাজামের নিজে নিজে বলা কথাটি বদু মওলানাকে সঙ্গত কারণেই অবহিত করেছিল। তার কথা শুনে বদু মওলানা প্রথমে বিচলিত-শীতলতার সঙ্গে তাকে সতর্ক করে, যাতে করে এই নিন্দা এবং কুৎসা তার কাছ থেকে দ্বিতীয় কানে না যায় এবং তারপর বদু মওলানা তার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি অপরিসর আয়তক্ষেত্রের মতো আকাশের দিকে বিষণ্ন চোখ রেখে যা বলে, তার ফলে সেদিন রাতে ইসমাইল হাজাম দেখে, প্রাইমারি স্কুলের আধো অন্ধকার ঘরে ছুরি হাতে অপেক্ষমাণ একজন মানুষ। সে, সেই অন্ধকারের ভেতর জবাইয়ের এই অস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য দেখে বুঝতে পারে, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই অস্ত্রের ধাতুতে ধার তোলা হয়েছে এবং এই উন্মুখ অস্ত্র এবং অস্ত্রধারী রক্তপানবিনা তৃপ্ত হবে না। আবদুল গণির কাছ থেকে লোকেরা জানতে পারে যে, আজীবন ছেদন-অস্ত্রের ধাতব প্রবৃত্তির সঙ্গে বসবাস করে ইসমাইল হাজামের আপাত মূর্খতার ভেতর যে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা গড়ে উঠেছিল, তার দ্বারা সে অপেক্ষমাণ কসাইয়ের ছুরি দেখে তার ঘৃণা এবং ভালোবাসার, দুঃখ এবং বিরল উল্লাসের এই জীবনের প্রান্ত শনাক্ত করতে পারে। জবাইয়ের সময় জোর করে শোয়ানোর জন্য উপস্থিত তিনজন রাজাকারের বলপ্রয়োগ ছাড়াই সিমেন্টের শীতল মেঝের ওপর সে নিজেকে সমর্পণ করে। উপস্থিত জনতা আবদুল গণির বর্ণনা থেকে বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করে যে, তার অন্তিম মুহূর্তে ইসমাইল হাজাম একজন অভিযাত্রীর মতো অবিভূত হয়েছিল। যেমন, রৌদ্র এবং তুষারপাতের ভেতর দিয়ে উনত্রিশ হাজার আটাশ ফুট বেয়ে ওঠার পর শেষ পদপাত করে তেনজিং নোরগে হয়তো বলেছিল, এই-ই এভারেস্ট; তেমনি, আবদুল গণির কাছ থেকে জানা যায় যে, ছুরির নিচে মাথা রেখে ইসমাইল হাজাম একবার শুধু বলে, এ্যামনে এইটা শ্যাষ হইল। ইসমাইল হাজামসহ আবদুল গণি তিনটে তালিকার একুশ জনকে শনাক্ত করতে পারে এবং জানায় যে তাদের সকলেই মৃত। তার কাছ থেকে শোকাহত এবং ক্রুদ্ধ লোকেরা জানতে পারে যে, এদের প্রত্যেককে জবাই করে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং

মস্তকহীন ধড় রাতের বেলায় রিকশা ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়া হয় এবং ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে গিয়ে খ্রিষ্টানদের কবরস্থানে পুঁতে ফেলা হয়। তখন, তার কথা শুনে, লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা, নয়াবাজার এবং সিদ্দিকবাজারের লোকেরা, পটুয়াটুলি এবং নারিন্দার লোকেরা ভিক্টোরিয়া পার্কের চত্বর শূন্য করে খ্রিষ্টানদের কবরস্থানের দিকে যায়। যারা ভিক্টোরিয়া পার্কের এই সমাবেশে আসে নাই অথবা আসতে পারে নাই তারা পৌষের মরা অপরাহ্নে জিলকদ মাসের তিন তারিখে দেখে মহরমের আশুরার দিনের মতো নীরব এবং শোকার্ত এক জনতা নারিন্দা দিয়ে অথবা পদ্মনিধি লেনের ভেতর দিয়ে অথবা রথখোলার মোড় ঘুরে টিপু সুলতান রোড দিয়ে হেঁটে যায়; তারা উত্তর-পূর্বে খ্রিষ্টানদের কবরস্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। তারা কবরস্থানের দেয়ালের বাইরে পুরনো রেললাইনের পাশে খনন করে ছাপ্পান্নটি মাথার খুলি পায় এবং এর ভেতর থেকে আবদুল গণির শনাক্ত করা একুশটি বেছে বের করতে পারে না। পানিতে ধুয়ে ঝকঝকে পরিষ্কার করে তারা মাথার খুলিগুলো যখন মাটির ওপর বিছানো কলাপাতার ওপর সাতটি সারিতে সাজিয়ে রাখে তখন তাদের মনে হয়, সবুজ রঙের জমিনে এক অপূর্ব জামদানি সৃজন করেছে যেন প্রকৃতি ও মানুষের করোটি মিলে। বিষাদঘন সেই অপরাহ্নে মহল্লার লোকদের কলাপাতার ওপর বিছানো করোটি দেখে এক বুটিতোলা জামদানি শাড়ির কথা মনে হয়েছিল, যে জামদানি অঙ্গে ধারণ করে, এখন তাদের মনে হয়, তাদের মা এবং প্রেমিকারা, কন্যা এবং কন্যাদের কন্যারা জীবনের উৎসবে সঞ্চারিত হয়। সে দিন লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা দেখেছিল যে, তাদের পাঁচজন নিখোঁজ লোককে, আবদুল গণি যাদেরকে মৃত বলে শনাক্ত করেছিল, বিচ্ছিন্ন করে বেছে নেয়া যায় না, যেমন মহল্লায় প্রথম যেদিন পাকিস্তানি মিলিটারি আসে সেদিন তারা তিনজন নারীকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নাই। সেদিন মিলিটারি চলে যাওয়ার পর মহল্লার লোকেরা সাতটি লাশ এবং নিজে নিহত না হওয়ার বিস্ময় নিয়ে যে সময়টায় চূড়ান্ত অবসাদে ডুবে ছিল, সেই সময়ও তারা তাদের নারীদের মুখে লাঞ্ছনার বিষণ্নতা দেখেছিল। মহল্লার প্রতিটি বালক এবং বালিকার কাছে, পুরুষ এবং রমণীর কাছে যেন এই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল যে, জগৎ-সংসারে একটি ব্যাপার আছে, যাকে বলাৎকার বলে। তারা আজীবন যে দৃশ্য দেখে কিছু বোঝে নাই– যেখান একটি মোরগ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় মুরগিকে– মহল্লায় মিলিটারি আসার পর তাদের মনে হয়েছিল যে, প্রাঙ্গণের মুরগির মতো তার মা এবং কিশোরি কন্যাটি, পরিচিত ভালোবাসার স্ত্রী, তাদের চোখের সামনে প্রাণভয়ে এবং অনভিপ্রেত সহবাস এড়ানোর জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটি এমন মর্মান্তিকভাবে তাদের জানা থাকে যে, তাদের বিষণ্নতা ছাড়া আর কোনো বোধ হয় না। তাদের বিষণ্ন লাগে কারণ, তাদের মনে হয় যে, একমাত্র মুরগির ভয় থাকে বলাৎকারের শিকার হওয়ার আর ছিল গুহাচারী আদিম মানবীর। কিন্তু পাকিস্তানি মিলিটারি এক ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে মানুষের বুনে তোলা সভ্যতার

চাদর ছিঁড়ে ফেলে এবং লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা তাদের মহল্লায় মানুষের গুহাচারিতা এক মর্মান্তিক অক্ষমতায় পুনরায় অবলোকন করে; তারা মা এবং ছেলে, পিতা এবং যুবতীকন্যা একসঙ্গে বলাৎকারের অর্থ অনুধাবন করে। এই সময় কিশোর আবদুল মজিদ তার যুবতী বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। তখন মিলিটারি চলে গেছে এবং তারা উন্মত্ত ঝড়ের পর ক্লান্ত বৃক্ষশাখার মতো স্থিত হয়েছে, সেই সময় আবদুল মজিদ মোমেনার মুখের দিকে কেন যেন তাকিয়ে দেখে। বলা যায় যে, সে হয়তো তার বোনের চেহারায় কিছু খুঁজছিল না, নিশ্চিত করে কিছু ভাবছিলও না, শুধুমাত্র মিলিটারি চলে গেছে এই ভাবনা ছাড়া; তা সত্ত্বেও, সে তার মোমেনা আপার চেহারায় মলিন বিষণ্নতা দেখেছিল এবং মোমেনা বুঝতে পেরেছিল যে আবদুল মজিদ তার বিষণ্নতা দেখছে। কিংবা, সত্য এ-ও হতে পারে যে, আবদুল মজিদ হয়তো মোমেনার বিষণ্নতাও দেখছিল না, হয়তো শুধু চোখ রেখেছিল, দৃষ্টি নিয়োজিত করে নাই; তবু মোমেনা তাকে ধমক দিয়েছিল, কি দেখচ তুই বারে বারে! তখন আবদুল মজিদের এই কৃষ্ণ দিনের ভেতর অন্য এক কৃষ্ণতর দিনের কথা মনে পড়েছিল যখন মোমেনা একইভাবে বলেছিল, কি দেখছ তুই! একাত্তর সনের এপ্রিল মাসের দুই তারিখে জুম্মার দিন জিঞ্জিরায় তারা যখন মিলিটারির তাড়া খেয়ে একটি অপরিচিত বাড়ির দোতলায় আশ্রয় নিয়ে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে বসেছিল তখন তার চোখ পড়ে তার প্রৌঢ়া মায়ের ওপর, মোমেনার আঙ্কিত ঘর্মাক্ত মুখ এবং ক্রন্দনরত ছোট দুটো বালিকা বোনের ওপর। আবদুল মজিদ তার মা, ছোট দুই বোন এবং তার মোমেনা আপার দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখে নাই। আসলে তার মনে হয়, সেই নয় মাস তার বোনের দিকে তাকিয়ে দেখা তার হয়ে ওঠে নাই এবং সে বস্তুত তাকে যখন প্রথম দেখে তখন তার গলায় খয়েরি জবার মতো ক্ষত ছিল, মুখটা কাত হয়ে ছিল এবং চোখ অনন্তের দিকে মেলা ছিল। কিশোর আবদুল মজিদ বুকের ওপর দুহাত চেপে ধরে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল এবং চোখ রেখেছিল চোখের ওপর। কিন্তু তখন সে বলে নাই, কি দেখচ তুই; যেমন জিঞ্জিরার সেই ঘরের ভেতর বলেছিল। জিঞ্জিরার সেই ঘরের ভেতর মোমেনার ভর্ৎসনায় আবদুল মজিদের কিছুই মনে হয় নাই অথবা সে তখন তার কথাটি ঠিকমতো শোনে নাই। মাঠ, রাস্তা এবং হিন্দুদের পোড়ো বাড়ির ওপর দিয়ে তার মা এবং তিন বোনসহ ছুটে আসার পর তারা যখন এই বাড়িতে আশ্রয় পায় এবং দোতলায় একটি ঘরের মেঝের ওপর তাদেরই মতো ছুটে আসা মানুষের ভিড়ের ভেতর বসে তখন আবদুল মজিদের মনে হয়েছিল যে, তার অস্তিত্ব থেকে চেতনা বিযুক্ত এবং দেহের ওপর মনের ক্রিয়া স্থগিত হয়ে গেছে। সেই বিহ্বল মুহূর্তগুলোয় সে দেখে যে, তার হাতগুলো আর কাজ করে না, কাঁধ থেকে অপ্রয়োজনীয় বোঝার মতো ঝুলে থাকে এবং সে বুঝতে পারে যে তার পাজামা উরুর কাছে ভিজে যাচ্ছে আর এই প্রক্রিয়া সে কোনোভাবেই রোধ করতে সক্ষম হয় না। এখন আবদুল মজিদের মনে হয়, সে সময় সে চেতনা এবং

চেতনাহীনতার মধ্যের এক বিপজ্জনক তৃতীয় স্তরে অসহায়ের মতো নিজের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেরই প্রত্যঙ্গের স্বাধীন হয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেছিল। সে তখন তার অসহায়তা নিয়ে তার মা এবং মোমেনার মুখের দিকে তাকিয়েছিল এবং তখন মোমেনা তাকে বলেছিল, কি দেখচ তুই! তারপর আবদুল মজিদের দেহ-তরল যখন তার সকল ভয় এবং বিপন্নতাকে অবজ্ঞা করে গড়িয়ে বের হয়ে আসতে থাকে তখন নিমজ্জিত বালকের কাছে বোনের ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়। মোমেনা তার লজ্জা ঢেকে দেয়, সে তার শাড়ির আঁচলে মেঝেতে নেমে আসা আবদুল মজিদের মূত্ররস মুছে নেয়। তারপর আবদুল মজিদের মনে হয় যেন তার দেহ এবং মনের ভেতর ছিন্ন হয়ে যাওয়া সঙ্গতি ফিরে আসে এবং বিহ্বলতার স্তর অতিক্রম করে সে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে থাকে। তখন, প্রৌঢ়া এবং ভীত জন্তুর মতো চুপ করে বসে থাকা তার মা বুঝতে পারে, তার ছেলেটি কত ছোট এবং সে তার মাথা টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর স্থাপন করে, চুমো খায়; বলে, বাপ, বাপ আমার! কিন্তু কিশোর আবদুল মজিদের অপৌরুষ এই একদিন ছাড়া আর প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। বস্তুত মার্চের ছাব্বিশ তারিখের সকালে যখন সূর্যের আলো ফোটে এবং দরজা খুলে তারা যুদ্ধের প্রথম দিনটির ভেতর দাঁড়ায় তখন তার মা আর বোনদের দিকে তাকিয়ে আবদুল মজিদের ভেতর অবচেতনভাবে সেই বোধটির জন্ম হয়, প্রতিটি পুরুষের ভেতর যে বোধ একসময় জন্মো, যে, এই লোকগুলোর দায়িত্ব তার। আবদুল মজিদ সেদিন মহল্লার রাস্তায় নেমে দেখেছিল যে প্রতিটি মানুষ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে আর অনুভব করেছিল চারদিকে জমাট হয়ে আসা স্তব্ধতা। সে তখন মহল্লা থেকে বের হয়ে লুকিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত যায়! নয়াবাজারের দিক থেকে সে ধোঁয়া উড়তে দেখে, তার নাকে পোড়া কয়লার গন্ধ আসে। ঘরে ফিরে সে তার মা এবং বড় বোনের দিকে তাকায়, মহল্লার মানুষের ভেতর যে স্তব্ধতা সে দেখেছিল সেই চাপা দেয়া নির্বাক ভয় সে দেখতে পায় তার মা আর বোনদের ভেতর। সে নিজের ভেতরও এক বোবা আতঙ্ক পরিষ্কার দেখতে পায়, তবু পঁচিশ তারিখের শেষ রাতে গুলি আর হৈ চৈয়ের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে তারা যখন দিশেহারা হয়ে হয়ে পড়ে, দেখে আগুনের লেলিহান শিখায় দেশ পুড়ছে, তখন আবদুল মজিদকে বলতে হয়, ডরায়ো না। পরদিন উপদ্রুত মানসিক অবস্থার ভেতর তারা দেখে যে, কারফ্যুর ভেতরও মহল্লার লোকেরা পালাতে থাকে। হিন্দুরা সবার আগে এবং অলক্ষ্যে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যায়, তাদের পেছন পেছন পালাতে থাকে মুসলমানরা। বিকেল নাগাদ মহল্লার নিস্তব্ধ রাস্তায় ঝিঁঝির ডাক শোনা যেতে থাকে। মহল্লা খালি হয়ে আসায় তার মা আরো বিচলিত হয়ে পড়ে, আবদুল মজিদেরও মনে হয় যে এভাবে একা মহল্লায় থাকা যায় না। তবু তারা মহল্লায় থেকে যায় যেহেতু তারা বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবে তা ঠিক করতে পারে না এবং তাদের পাশের বাড়ির রহিম ব্যাপারি বলে যে, সেও কোথাও যাবে না। কিন্তু তার পরদিন সে পরিবার নিয়ে দরজায়

তালা ঝুলিয়ে চলে গেলে আবদুল মজিদের মা ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় আবদুল মজিদ তার পরিবার জিঞ্জিরায় নিয়ে যায় এবং মাত্র একটি রাতের ব্যবধানে, যেন এক দুঃস্বপ্নের পর, মা এবং বোনদের হাত ধরে পুনরায় মহল্লায় ফিরে আসে, দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকে আশ্চর্য রকমের নিরাপদ বোধ করে এবং তারা বলে যে, তারা আর বাড়ি ছেড়ে যাবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা এটা দেখতে পেয়েছিল যে, বাড়ির ভেতরটাও আর নিরাপদ ছিল না এবং পরিণতিতে একদিন কিশোর আবদুল মজিদকে খুঁজে বের করে বয়ে নিয়ে আসতে হয় মোমেনার লাশ। যেদিন রহিম ব্যাপারি মহল্লা ত্যাগ করে এবং আবদুল মজিদের মা অস্থির হয়ে পড়ে সেদিন তখন আবদুল মজিদের যে অনুভূতি হয়, সেটা ছিল দিক্‌চিহ্নহীন সাগরে কোনো নাবিকের বন্দরের বাতিঘর খোঁজার মতো একটি ব্যাপার। প্রথমে তার মনে হয়, কুমিল্লার গ্রামে তার খালার বাড়ি তারা যেতে পারে কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সে বুঝতে পারে যে, অতদূর তারা যেতে পারবে না। তারপর তার আনোয়ারের নাম মনে আসে এবং সে ঠিক করে যে, সে তার মা-বোনদের নদী পার করে আনোয়ারদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। এপ্রিলের এক তারিখে দুপুরের পর তারা দ্রুত গুছিয়ে নিয়ে রাস্তায় বের হয়। রাস্তার নির্জনতায় তাদের মনে হয় যেন তারা কোনো এক তেপান্তরে এসে পড়েছে এবং হয়তোবা এখন দিনের বদলে রাত। মহল্লা থেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত পথটুকু তারা রাস্তার ধার ঘেঁষে নিশ্চুপ ছায়ার মতো এগিয়ে গিয়ে রিকশায় চড়ে। এই সময়টুকুতে সেদিন কারফ্যু ছিল না, তাদের রিকশা আরমানিটোলা মাঠের পাশ দিয়ে জেলখানার সামনে এসে উঠেছিল। জেলখানার সামনে এসে চারদিকে বালুর বস্তার বাঙ্কারের ভেতর তাক করে রাখা মেশিনগানের নল আর খাকি পোশাকপরা মিলিটারি দেখে তাদের নির্জনতার বোধ আরো বেড়ে যায়, আবদুল মজিদ দম বন্ধ করে রাখে কিন্তু তার মা নিজের আতঙ্ক আর ধরে রাখতে পারে না, সে শব্দ করে কলেমা পড়তে থাকে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। এভাবে রিকশা তাদেরকে নিয়ে চক সার্কুলার রোড ঘুরে চম্পাতলীর সংকীর্ণ গলির ভেতর দিয়ে গিয়ে সোয়ারীঘাটে বুড়িগঙ্গার তীরে নামিয়ে দেয়। কেরায়া নৌকোয় নদী পার হয়ে তারা যখন জিঞ্জিরার মাটিতে পা রাখে, তারা ফেলে যাওয়া অন্য পারের দিকে তাকায়, তাদের মনে হয় যে, জিঞ্জিরা এক স্বাধীন দেশ, তাদের আর ভয় নাই। তারা দেখে অসংখ্য মানুষ নদী পার হয়ে এপারে উপচে পড়ে এবং এই জনতা এপারের মাটিতে পা রেখে কেমন নিশ্চিন্ত এবং সজীব হয়ে ওঠে। তারা সে সময় বুঝতে পারে না যে, পলায়নের জন্য দেশে বস্তুত তখন কোনো জায়গা ছিল না; আর জিঞ্জিরা তো ছিল একেবারে নাগালের ভেতর। আবদুল মজিদ এবং তার পরিবার কলেজিয়েট স্কুলে তার সহপাঠী আনোয়ারদের চড়াইল গ্রামের বাড়িতে একটি রাত যে নিশ্চিন্ততার আত্মপ্রবঞ্চনার আড়ালে তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমায়, সেটা পরদিন খুব ভোরে নদীর ওপার থেকে তোপ দেগে পাকিস্তানি মিলিটারি চুরমার করে দেয়। সেদিন দুপুর নাগাদ যখন জিঞ্জিরার অপারেশন শেষ হয় তখন

আবদুল মজিদ, তার মা এবং বোনের এই বোধ জন্মে যে, পালানোর জায়গা নেই। পাকিস্তানি মিলিটারির আক্রমণের মুখে আনোয়ারদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে গিয়ে তারা যখন দেখেছিল যে মিলিটারি বৃত্ত রচনা করে আছে তখন তারা মাঠের ভেতর সেই দোতলা বাড়িটিতে আশ্রয় নেয়, যেখানে আবদুল মজিদের দেহযন্ত্র ক্ষণিকের জন্য ভেঙে পড়ে। তারপর সেদিন বিকেলে তারা আবার লক্ষ্মীবাজারে তাদের বাড়িতে ফিরে আসে এবং তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে যে, দুদিনের ভেতর মহল্লার অন্য সকলে প্রত্যাবর্তন করে, কেবলমাত্র হিন্দুদের বাড়িগুলো পরবর্তী ন মাস জনমানবহীন থেকে যায়। মহল্লার লোকেরা পরে জেনেছিল যে পঁচিশ তারিখের পর প্রতিটি প্রাণী বাড়ি ত্যাগ করেছিল, কেবলমাত্র দুজন ছাড়া। এদের একজন ছিলেন খাজা আহমেদ আলী, শনিবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীবাজারে একমাত্র তিনি বাতি জ্বালিয়েছিলেন। মহল্লার লোকেরা জেনেছিল যে, এ সময় আর-একজন লোক বাড়ি ছাড়ে নাই, সে বদু মওলানা। এ সময় তার বাড়ি ছাড়ার প্রয়োজন ছিল না, যদিও মহল্লার লোকেরা মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত তাকে একবারও দেখে নাই। পরে তারা জেনেছিল যে, সে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল, কারণ পঁচিশে মার্চের গোলাগুলি আর ঢাকার আকাশের আগুনের শিখা দেখে সে বুঝতে পারে যে, 'জয় বাংলা' শেষ হয়ে গেছে এবং সংকট শেষে তার সুসময় আসার এই অন্তর্বর্তি সময়টিতে সে হঠাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনায় মরে যেতে চায় নাই। মহল্লার লোকেরা পরে জানতে পারে যে, বদু মওলানা এই কটি দিন তার রান্নাঘরের পাশে অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। এখান থেকে বের হয়ে বদু মওলানাকে কবে প্রথম রাস্তায় নেমে আসতে দেখা গিয়েছিল তা মহল্লার লোকেরা মনে করতে পারে না, তবে তারা বলে যে, তারা যেদিন তাকে আলখাল্লা পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে, তাদের ভয় হয়েছিল এবং এই ভয়ের কারণে তাদের একধরনের ঘৃণা হয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল যে, এই লোকটিকে তারা আগে কখনো যেন দেখে নাই এবং এই লোকও দেখে নাই তাদেরকে, সে জানে না যে, লক্ষ্মীবাজারের বাড়িঘর পঁচিশ তারিখের রাতের পর নয়া বাজারের আগুনের ভৌতিক লাল আভায় ডুবে ছিল এবং গুলির শব্দে মহল্লার লোকেরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। তাদের মনে হয়েছিল যে, মহল্লার লোকেরা যখন ছিল বিপর্যস্ত তখন বদু মওলানা ছিল একমাত্র লোক, যে এসব কিছুর ভেতর সুস্থির ছিল। ভাঁড়ার ঘর থেকে বের হয়ে আসার পর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সে তার প্রতিবেশীদের আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আসসালামু আলাইকুম। তবু, এ সময় বদু মওলানাকে নিয়ে তাদের যে অনুভূতি হয় তাতে অস্পষ্টতা থাকলেও, মহল্লায় প্রথম যেদিন মিলিটারি আসে এবং বদু মওলানা আবিষ্কৃত হয়, সে দিন তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, বদু মওলানাকে দেখে তারা আগেই চিনেছিল। এর পর থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মহল্লার লোকেরা যেন এক মড়কের ভেতর দিয়ে পার হয়ে আসে। একাত্তর সনে মহল্লার সংকীর্ণ গলিতে মোট দুবার মিলিটারি আসে। মহল্লার লোকেরা

বলে যে, মহল্লায় প্রথমবার মিলিটারি আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বদু মওলানাকে খুঁজে বের করা; বদু মওলানা প্রথমেই 'হাজির হুজুর' বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তারপর মহল্লার লোকেরা তাকে চিনেছিল মহল্লার দণ্ডমুণ্ডের মালিকরূপে। প্রথম দিন সাতজন লোক এবং বদু মওলানার ছোট ছেলের পোষা কুকুর ভুলুকে গুলি করে মারার পর মিলিটারি চলে গিয়েছিল। সেই মিলিটারিদের নেতা, ক্যাপ্টেন ইমরান জিপে ওঠার আগে ভেবেছিল যে, তার পেশাব করা প্রয়োজন এবং সে তখন একটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে, দেয়ালের কিনারায় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে প্যান্টের সামনের বোতাম খুলে আয়েশ করে পেশাব করতে থাকে। এ সময় মিলিটারি সিপাইরা তাদের ট্রাকে গিয়ে ওঠে, ক্যাপ্টেনের জিপের ড্রাইভার ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বসে থাকে; তখন, মধ্যাহ্নের রোদের ভেতর শুধু বদু মওলানা হাত দুটো নাভির নিচে বেঁধে বিনীত এবং কোমল এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের পেশাব করা দেখে। মহল্লার লোকেরা যখন সাতটি লাশ নিয়ে নিশ্চুপ বসে ছিল এবং বদু মওলানার ছোট ছেলে, ভুলু নিহত হওয়ায় কাঁদছিল, তখন বদু মওলানা পেছন থেকে, দীর্ঘদেহী যুবক পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের দুপায়ের মাঝখানে তরলবিদ্যুৎ রেখার মতো একটি সাদা ধারা মাটিতে ক্রমাগতভাবে বিদ্ধ হতে দেখে। বদু মওলানার সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়ে এই জল-পতনের শব্দ ছড়িয়ে থাকে এবং ক্যাপ্টেন এত আয়েশ করে এই ক্রিয়াটি সম্পাদন করে যে, মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল ধরে সে এই কাজটি করে যাবে এবং বদু মওলানার চেতনা জুড়ে ক্যাপ্টেনের পেশাব করার ভোঁতা শব্দ একটি হালকা সঙ্গীতধ্বনির মতো তার জীবনকাল পর্যন্ত ভেসে বেড়াবে। সে সময় মহল্লায় যারা বদু মওলানাকে দেখেছিল তারা বলেছিল যে, তাদের মনে হয়েছিল, বদু মওলানা যেন একটি স্বপ্নের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল। ক্যাপ্টেনের পেশাব করা শেষ হলে সে বোতাম লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তখন বদু মওলানার চোখে পড়েছিল, ক্যাপ্টেনের পেশাববিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত জমিতে জমে আছে ফেনার রঙিন বুদ্বুদ। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বদু মওলানাকে পুনরায় শনাক্ত করে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল জিপে ওঠার আগে। বদু মওলানা তখন হেসেছিল, সে হাসি কেমন ছিল মহল্লার লোকেরা এখন তা কাউকে বলতে পারে না, তারা শুধু নিজেরা বুঝতে পারে, যারা সেদিন ক্যাপ্টেনের হাতের ছোঁয়ায় বদু মওলানার মুখে সেই হাসি উদ্ভাসিত হতে দেখেছিল। মুখের সেই হাসি নিয়ে বদু মওলানা লম্বা আলখাল্লা পরে কাঁধে স্কার্ফ ঝুলিয়ে মহল্লার রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। মহল্লার লোকেরা পরে লক্ষ করেছিল যে, বদু মওলানা তার সেই ধূসর রঙের কামিজ আর গায় দিচ্ছিল না। তারা বলে যে, তারা মনে করেছিল, বোতাম লাগানোর সময় ক্যাপ্টেনের হাতে প্রস্রাব লেগে যায় এবং সে তার ভেজা হাত নিজের পকেটে রুমাল না থাকায় বদু মওলানার পিঠের কাপড়ে মোছে। কিন্তু তারা পরে জেনেছিল যে, তাকে ক্যাপ্টেন ছুঁয়েছিল এই ব্যাপারটির প্রতি সম্মান দেখানো এবং স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই সে তার জোব্বাটি সংরক্ষণ করেছিল। বদু মওলানা

ডিসেম্বর মাসে পালিয়ে যাওয়ার পর, যেদিন লোকেরা তার বাড়ির সব মালামাল এনে আজিজ পাঠানের বাসায় জড়ো করে সেদিন আজিজ পাঠানের স্ত্রী সব দেখে বলেছিল যে, শুধু একটি আলখাল্লা আর একটি কাঁধের স্কার্ফ ছাড়া সব তাদের। মহল্লার লোকেরা তখন বহুদিন পর বদু মওলানার সেই ধূসর রঙের আলখাল্লাটি দেখতে পায়, তাদের তখন মনে পড়ে যে, পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন বদু মওলানার এই কাপড়ে পেশাব মুছেছিল আর তাতে সে, সেই অপার্থিব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। মহল্লার লোকেরা তখন একটি লাঠির মাথায় করে বদু মওলানার আলখাল্লা এবং ওড়না মহল্লার রাস্তার মাথায় নিয়ে গিয়ে আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে। সেটা ছিল একাত্তর সনের ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখ। কিন্তু দুবছর পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলে বদু মওলানা যখন লক্ষ্মীবাজারে ফিরে আসে মহল্লার লোকেরা তার গায়ে পুনরায় পপলিনের ধূসর সেই আলখাল্লা দেখতে পায়, বদু মওলানার মুখের সেই হাসিটি তখন শুধু থাকে না। এবার বদু মওলানা যেন পুনরায় শূন্য থেকে শুরু করে, মহল্লার লোকেরা তাকে পুনরায় মাটির দিকে তাকিয়ে হেঁটে যেতে দেখে। ফিরে আসার পর প্রথম দিন সে মহল্লার সকলের সঙ্গে বিনীতভাবে কুশল বিনিময় করে, সে একাত্তর সনে মহল্লায় নিহত আট ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। মহল্লার লোকেরা পরে তাদের এই বিশ্বাসের কথা বলেছিল যে, এই দুঃসাহসিক কাজের দ্বারা সে আসলে সাতটি ক্ষতচিহ্ন পরীক্ষা করতে চেয়েছিল মাত্র। তখন সেই মঙ্গলবারের অপরাহ্নে আবদুল মজিদ তাদের প্রাঙ্গণের ফটকের কাছে কামিনী গাছতালায় বদু মওলানাকে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কেমন আছ তোমরা? এই প্রশ্নের ভেতরকার পরিহাস এমন নিদারুণ ছিল যে, নিজের বাড়ির প্রাঙ্গণের ভেতর তা শুনে এবং বদু মওলানাকে দেখে আবদুল মজিদ বাক-রহিত হয়ে থাকে। তখন তার মা এগিয়ে এসে বদু মওলানাকে দেখে। কেমন আছেন আপনেরা? এই কুশল জিজ্ঞাসা যেন আবদুল মজিদের মায়ের সহ্যের বাইরে চলে যায়। ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত এবং শোকার্ত এই নারী দ্রুত বারান্দা থেকে প্রাঙ্গণে নেমে এসে চিৎকার করে উঠেছিল, তাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল এবং হাহাকার করে বলেছিল, থুক দেই, থুক দেই, থুক দেই মুখে। একইভাবে এই নারী একদিন তার কন্যার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখে হাহাকার করেছিল। তখন বদু মওলানাকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই, সে তখন পালিয়েছিল। একাত্তর সনের ডিসেম্বরের সেই বিষণ্নতম বিকেলে আবদুল মজিদ যখন তার বোনের মৃতদেহ কুড়িয়ে আনে, সে সেটা একটি শাড়ি দিয়ে জড়িয়ে এনেছিল। মোমেনার দেহ আবদুল মজিদ বস্ত্রহীন দেখেছিল, আর দেখে তার মা, মেয়ের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখে আবদুল মজিদের মায়ের কান্না জমে গিয়েছিল। মেয়েকে সে সেদিন শেষ গোসল করাতে দেয় নাই এবং কাফন ছাড়া, পরনের শাড়িতে জড়িয়ে তাকে দাফন করতে মহল্লার লোকদের বাধ্য করেছিল। স্খলিত চেতনার প্রান্ত থেকে বিভ্রমের প্রলাপের মতো মহল্লার সকলকে সে এই কথা বলেছিল যে, সে তার মেয়ের লাশ এ রকম রক্ত

মাখা এবং কাফনহীন অবস্থায় হাসরের মাঠে আল্লাহর আরশের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। বারান্দায় চৌকির ওপর শোয়ানো মৃত মোমেনার কাত হয়ে থাকা মুখে সে আদর করেছিল, রক্ত ও ধুলো জমা ঠোঁটে চুমো খেয়েছিল, আধ-বোজা চোখের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করেছিল, মা রে, মা রে, মা রে। তখন মহল্লার সব লোক কামিনী গাছতলায় দাঁড়িয়ে চোখ আনত করে রেখেছিল, মহল্লার সব রমণী এবং শিশু ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, তাবৎ বৃক্ষ শোকার্ত হয়েছিল। মহল্লার লোকেরা আবার এক মঙ্গলবারের হিমেল অপরাহ্নে আবদুল মজিদের মায়ের হাহাকার শুনতে পায়, থুক দেই, থুক দেই, থুক দেই মুখে। লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা জানতে পারে আবদুল মজিদের মা কেন আবার হাহাকার করে; মহল্লায় আর এক বদু মওলানা প্রকাশিত হয়। মৃত খাজা আহমেদ আলী এবং খাজা শফিকের বিধবা স্ত্রীরা, আলাউদ্দিনের মা, পুত্রহারা আবু করিম এবং আরো তিনজন পুরুষ ও রমণী সেই শীতের মঙ্গলবারে তাদের বাড়ির প্রাঙ্গণের ভেতর বদু মওলানাকে দণ্ডায়মান দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, বদু মওলানাকে দেখে খাজা আহমেদ আলীর বিধবা স্ত্রী এবং খাজা শফিকের মা দ্রুত নেমে এসে বদু মওলানাকে প্রাঙ্গণের গভীরে প্রবিষ্ট হওয়া থেকে আটকায়। তখন মহল্লায় যারা ছিল, তারা শুনতে পেয়েছিল একটি নারী কণ্ঠে উচ্চারিত হুঁশিয়ার ধ্বনি, খবরদার, খবরদার! তখন জয়নব বেগমকে যারা দেখেছিল তারা পরে বলে যে, উত্তোলিত হাতে তসবির মালা ঝোলানো জয়নব বেগমকে দেখে মনে হয়েছিল যেন সে তার প্রাঙ্গণে আযাযিলের পুনঃপ্রবেশ রোধ করতে চাচ্ছিল এবং তার চোখের আগুন দেখে বদু মওলানা একটিও কথা না বলে সেই উঠোন ছেড়ে একটি অপছায়ার মতো দ্রুত অপসৃত হয়েছিল। মহল্লার লোকেরা আলাউদ্দিনের মা এবং আবু করিমের স্ত্রীর কথাও শুনেছিল। তারা জানতে পারে যে, বদু মওলানাকে জানালা দিয়ে আঙিনায় দাঁড়ানো দেখে আবু করিমের স্ত্রী রান্নাঘরের ছড়ানো-ছিটানো তৈজসপত্রের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে। মূর্ছা যাওয়া এই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে বাড়িতে হাঁকডাক পড়ে গেলে বদু মওলানা সে স্থান ত্যাগ করে আসে। আর তারা জানতে পারে যে, বদু মওলানা মৃত আলাউদ্দিনদের বাসায় বাইরের প্রাঙ্গণে কাউকে না পেয়ে গলি দিয়ে ভেতরের উঠোনে পৌঁছেই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আলাউদ্দিনের মা, কুয়োতলা থেকে থালাবাসন ধুয়ে ঘরে আসার মুখে বদু মওলানা সামনে পড়ে গেলে, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, আলাউদ্দিনের মা হাতের বাসনকোসন বদু মওলানার মুখের ওপর ছুড়ে মারে। পরে পাশের বাড়ির একজন লোক, যে ব্যাপারটি দেখেছিল, বলে যে, সে তাদের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আলাউদ্দিনদের বাড়ির গলির ভেতর থেকে তাড়া খাওয়া শৃগালের মতো একটি লোককে ছুটে বেরিয়ে উঠোনের ফটক পার হয়ে পলায়ন করতে দেখে। সে বলে যে, লোকটি ছিল বদু মওলানা এবং বদু মওলানার পেছন পেছন সে খড়ির চুলোর ফুঁকনি হাতে মৃত আলাউদ্দিনের রণচণ্ডীবেশী মাকে ছুটে আসতে দেখে। সে

আরো বলে যে, ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফটকের চৌকাটে লেগে বদু মওলানা আছড়ে পড়ে আর তখন পশ্চাদ্ধাবনকারিণী তার লোহার ফুঁকনি ছুড়ে মারে। সেদিন অপরাহ্ণে যারা মহল্লায় ছিল না তারা পরে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বিশদ শুনেছিল তাদের কাছ থেকে, যারা ঘটনাগুলো চাক্ষুষ করেছিল অথবা অন্য কারো কাছ থেকে শুনেছিল। সে রাতে লক্ষ্মীবাজারের লোকদের ঘুম আসে নাই বলে পরদিন সকালে তারা একে অন্যকে বলেছিল। তারা বলেছিল যে, সে দিন রাতে তাদের স্ত্রীরা স্খলিত শয্যায় শোকার্ত রমণীর মতো পড়ে ছিল এবং তারা অস্থিরতার এক প্রবল প্রবাহে উড্ডীন হয়েছিল। সেই সকালে মহল্লার লোকেরা বদু মওলানাকে হেঁটে আসতে দেখেছিল, শুনেছিল 'আসসালামু আলাইকুম' বলতে। কিন্তু মহল্লার লোকেরা প্রত্যুত্তর দেয় নাই, তাদের মনে হয়েছিল যে, তাদের রাতজাগা শরীর এই কাজ করতে চায় না; তাদের মুখ এবং জিহ্বার বদু মওলানাকে প্রত্যাভিবাদন করার আগ্রহ নাই। তারা দেখেছিল যে, বদু মওলানার নাকের কাছে ফুলে আছে এবং সে খুঁড়িয়ে হাঁটে। তারা তাকে দেখে প্রথম ভেবেছিল যে, সে হয়তো ফজরের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে ফিরছিল, কিন্তু পরে তারা জানতে পারে যে, সে সেই ভোরে ফিরছিল আজিজ পাঠানের বাসা থেকে। তারা জেনেছিল যে, আগের দিন সন্ধ্যায় আলাউদ্দিনের মায়ের তাড়া খেয়ে সে ছুটে গিয়েছিল আজিজ পাঠানের বাসায়। কিন্তু তখন পাঠান বাসায় না থাকায় খুব ভোরে সে আবার যায়। লুঙ্গি এবং স্যান্ডো গেঞ্জির ওপর চাদর জড়িয়ে আজিজ পাঠান যখন দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাইরের ঘরে আসে তখন বদু মওলানা অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল; তার পরস্পরকে আঁকড়ে থাকা হাত দুটো ছিল সামনের দিকে তলপেটের নিচে ঝোলানো, আর দৃষ্টি ছিল পাঠানের ঘরের চামড়া ওঠা, চল্টানো পাকা মেঝের ওপর। মহল্লার লোকেরা পরে শুনেছিল যে, বদু মওলানা একটি কথাও আজিজ পাঠানোর সামনে উচ্চারণ করে নাই, সে শুধু দাঁড়িয়েছিল নিশ্চুপ এবং বাঁকা হয়ে। আজিজ পাঠান ব্রাশ দিয়ে দাঁত ঘষছিল আর বারে বারে জানালা দিয়ে রক্ত আর লালা মাখানো পেস্টের থোকা থোকা আবিল ফেনা ফেলছিল। সে মুখের ভেতর জড়ো হয়ে আসা লালা আর ফেনা মেঝেয় পড়ে যাওয়া রোধ করতে করতে ভাঙা ভাঙাভাবে বদু মওলানাকে এবার ভালো হয়ে যেতে বলেছিল, সে বলেছিল যে, তার নেতা যেহেতু বদু মওলানাদের মাফ করেছে, তার নিজের কোনো প্রতিহিংসা নাই। মহল্লার লোকেরা জেনেছিল যে, তার এ কথায় বদু মওলানার চোখ দিয়ে পানি ঝরে পড়েছিল মেঝের ওপর এবং সেদিকে তাকিয়ে বিব্রত আজিজ পাঠান বলেছিল, কাইন্দেন না, কাইন্দেন না। মহল্লার লোকেরা আরো একটি কথা জানতে পেরেছিল, তা হলো, যে মঙ্গলবার রাতে তাদের নিদ্রাহীন কাটে সে রাতে মহল্লায় শুধু আজিজ পাঠান ঘুমিয়েছিল। মঙ্গলবার অপরাহ্ণে বাসায় না থাকায় মহল্লার সাত জন নারী পুরুষের হাহাকার সে শুনতে পায় নাই। অনেক রাতে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে সে ঘুমিয়ে থাকে। সকালে বদু মওলানাকে দেখে সে বিচলিত

হয়, তার নীরব বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারে না। তার মনে পড়ে, বিজয়ের পর মহল্লায় ফিরে সে জেনেছিল মহল্লায় সাত জনের নিহত হওয়ার কথা, দেখেছিল বিধবা এবং সন্তানহারা নরনারীর ম্লান মুখ, খাজা আহমেদ আলীর বাড়ির উঠোনের জোড়া কবর এবং মহল্লার রাস্তার মাথায় জনতার বদু মওলানার কুর্তা পোড়ানোর উৎসব। সে সময় আজিজ পাঠানের, নিজের লুণ্ঠিত বাড়িটির চেহারাও মনে পড়েছিল। কিন্তু ব্রাশের ঘায়ে মাড়ি ক্ষতবিক্ষত করে, বদু মওলানার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় যে, একাত্তরের মার্চের পঁচিশ তারিখের আগেও বদু মওলানা এ রকমই ছিল, বিষণ্ন ও নতমুখ এবং মহল্লার লোকেরা জেনেছিল যে, যে মঙ্গলবার বিকেলে মোমেনার মার হাহাকার শোনা গিয়েছিল, 'থুক দেই মুখে' তার পরদিন সকালে আজিজ পাঠান ক্রন্দনরত বদু মওলানাকে বলেছিল কাইন্দেন না মওলানা, কাইন্দেন না। কিন্তু তারপর বদু মওলানা যখন সকলের সম্মুখ দিয়ে 'স্লামালেকুম' বলে হেঁটে গিয়েছিল তখন মহল্লার লোকেরা নির্বিকার থাকে, কারণ তখন তাদের অনিদ্রাপীড়িত চেতনায় মোমেনার মার আগের দিনের চিৎকার জেগে ছিল, তবে তখন মহল্লার লোকের এই আচরণে বদু মওলানা আর বিচলিত হয় না। আজিজ পাঠানের বাড়িতে বদু মওলানার অশ্রুপাতের কাহিনী মহল্লায় প্রচারিত হয়ে পড়লে মহল্লার লোকেরা সে বিষয়ে তার নিজের বক্তব্য শুনতে পায়। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, বদু মওলানা এই কথা বলে যে, একমাত্র মানী লোক-ই মানীর সম্মান রাখতে জানে। বালক-বালিকাদের স্কুলের গল্পের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে বলে যে, বীর রাজা পুরুর মতো সে বিজয়ী আলেকজান্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সে দেখেছিল যে, আলেকজান্ডাররা সব সময় পুরুদের সঙ্গে একই ব্যবহারই করে; কারণ, একমাত্র বীরই চিনতে পারে বীরের লক্ষণ সকল। বদু মওলানার এইসব কথা মহল্লার লোকেরা বুঝতে পারে না। তাদের অনেকে পুরু রাজা কিংবা আলেকজান্ডারকে চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না বদু মওলানার বীরত্ব কোথায়। তারা বদু মওলানার এইসব কথাবার্তা ভুলে যায়। কিন্তু আবদুল মজিদ দীর্ঘদিন পর আলেকজান্ডার আর পুরু রাজার ব্যবহারের তাৎপর্য পুনরায় উপলব্ধি করে এবং নিজেকে এক সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। হরতালের পর যেদিন সব পক্ষই মহল্লার লোকদের 'ভাইসব' বলে সম্বোধন করে ধন্যবাদ দেয় এবং যেদিন বাজারে যাওয়ার পথে আবদুল মজিদের স্যান্ডেলের ফিতে ফট্ করে ছিঁড়ে যায় তার পরদিন সে আজিজ পাঠানকে এক মুহূর্তের জন্য রাস্তায় পায়; তখন দুএকটি কথার ভেতর সে তাকে এ-ও বলে যে, বদু মওলানারা এখন তাদেরকে 'ভাইসব' বলে ডাকে এবং হরতাল করার জন্য ধন্যবাদ দেয়। এই কথা শুনে তখন আজিজ পাঠান যেন তার মর্মস্থল দেখতে পায় এবং সে বিষণ্নভাবে হেসে আবদুল মজিদের কাঁধের ওপর প্রাচীন বৃক্ষ শাখার মতো তার শিরা-ওঠা হাত রাখে। সে তাকে বাসায় নিয়ে যায় বহুদিন পর এবং তার সঙ্গে এত কথা বলে যে, আবদুল মজিদ তার প্রায় কিছুই বুঝতে পারে না, শুধুমাত্র একটি কথা ছাড়া,

তা হচ্ছে এই যে, রাজনীতিতে চিরদিনের বন্ধু অথবা চিরদিনের শত্রু বলে কিছু তো নেই, কাজেই অতীত ভুলে যাওয়া ছাড়া আর কিইবা করার থাকে মানুষের। কিন্তু, ক্রমাগতভাবে অতীত ভুলে যাওয়া লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা দেখে যে, তাদের অতীত যেন অনবরত ঘাসের অঙ্কুরের মতো মাটি ভেদ করে উঠে আসে। তারা এখন এই সত্যটি ভুলে থাকে যে, মসজিদে জমায়েত হওয়ার এই অধিকারও চিরন্তন নয়; কারণ একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ সকালে যখন তারা দেখেছিল নয়াবাজারের লাল আগুন আকাশ থেকে একটি পর্দার মতো ঝুলে আছে এবং তারা আতঙ্কিত জন্তুর মতো ভেবেছিল পালাতে হবে, সেই শুক্রবারে মসজিদে কোনো মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ ধ্বনিত হয় নাই, সেদিন কারফ্যুর ভেতর জুমার নামাজ কেউ পড়ে নাই। অবস্থা তো তখন এমন হয়েছিল যে, প্রতিনিয়তই তাদের মুখে আল্লাহর নাম ধ্বনিত হয়েছিল এবং তারা 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' করতে করতে মহল্লা ছেড়ে পালিয়েছিল। তারপর আবার তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতো সকলেই ফিরে এসেছিল মহল্লায়। তারা কে কোথায় পালাতে চেয়েছিল তা নিয়ে তাদের আলোচনা হয় নাই, তারা শুধু এই সত্যটি জেনেছিল যে, পালানোর কোনো পথ এবং স্থান ছিল না দেশে। সেই সময় তারা বদু মওলানাকে দেখেছিল হেঁটে আসতে; সে তাদেরকে বলেছিল যে, তাদের কোনো ভয় নাই, আল্লাহ মুসলমানদের রক্ষা করবেন, এবং তারপর মহল্লায় সে কাক ওড়াতে শুরু করেছিল। তারপর মহল্লায় যেদিন প্রথম পাকিস্তানি মিলিটারি আসে, বদু মওলানা সালাম দিয়ে দাঁড়ায় এবং তারা সাত জন লোককে গুলি করে মারে। পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাপ্টেন আয়েশ করে প্রস্রাব করে তার সৈন্যদের নিয়ে চলে যাওয়ার পর তখন সেখানে দণ্ডায়মান বদু মওলানা তার সেই স্মিত হাসিটিকে বিকশিত হতে দেয় এবং সে মহল্লার বাড়িঘরের দিকে ঘুরে তাকায়। মহল্লার লোকেরা তখন যারা তাকে দেখেছিল তাদের মনে হয় যেন কোনো ব্যাখ্যাতীত বায়ুচারিতার কারণে বদু মওলানার দেহ সম্প্রসারমাণ হয়ে ওঠে এবং মহল্লার কৃষ্ণতম দিনটিতে কাকতাড়ুয়ার মতো আকাশের দিকে মুখ করে ঝুলে থাকে। কিন্তু যখন সে শোনে যে, মহল্লার লোকেরা বলে, খাজা আহমেদ আলীর দেয়া আজান তারা শুনতে পেয়েছিল এবং তিনি তার আজান সমাপ্ত করেছিলেন, সে চিৎকার করে ওঠে এবং অন্ধকার রাতে কারফ্যুর ভেতর তার হাঁকডাক শোনা যায়। বদু মওলানা মহল্লার লোকদের বলে যে, তারা নিশ্চয়ই জানে খাজা আহমেদ আলী একজন মুনাফেক ছিল। কিন্তু মহল্লার লোকেরা এ রকম কিছু স্মরণ করতে ব্যর্থ হলে বদু মওলানা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সকালে খাজা আহমেদ আলী আর তার ছেলেকে বাড়ির উঠোনে দাফন করার সময় মহল্লার লোকেরা যখন বলে যে, খাজা আহমেদ আলী আজান সমাপ্ত করেছিলেন এবং তিনি আজানের শেষে চারবার উচ্চারণ করেছিলেন 'আল্লাহই শ্রেষ্ঠ' তখন বদু মওলানা তাদেরকে মূর্তিপূজক কাফের বলে গাল দেয় এবং বলে যে, খাজা আহমেদ আলী কোনো ফেরেশতা ছিল না, সে নিশ্চিতরূপেই আজান দেয়া সমাপ্ত করে নাই।

কারণ তাকে যখন ছাদের ওপর গুলি করে মারা হয় তখন সে সিঁড়ির ওপর ছিল এবং সে গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আজান বন্ধ হয়ে যেতে শুনেছিল। কিন্তু মহল্লার লোকেরা তার কথা গ্রহণ করে না, তারা বলে যে, তাদের মনে হয়েছিল একমাত্র কিন্নরকণ্ঠ বেলালের দেয়া আজানই এমন মধুর হতে পারে। তাদের এ কথা শুনে বদু মওলানা চলে যায় এবং সে যখন পুনরায় ফিরে আসে তখন লোকেরা কবরে মাটি চাপা দেয়া শেষ করে দাঁড়িয়েছে। তারা দেখে, বদু মওলানার চাকরেরা হৈ হৈ করতে করতে ভুলুর মৃতদেহ বয়ে আনে। তাদের মনে পড়ে, তারা সেদিন বদু মওলানার চোখে সাপের চেয়েও ভয়াবহ এক দৃষ্টি দেখেছিল এবং তারা তার দিকে তাকিয়ে নীরব নিশ্চল হয়ে ছিল। বদু মওলানার লোকেরা ধপাধপ করে মাটি খুঁড়ে খাজা আহমেদ আলীর বাড়ির উঠোনে, তার আর তার ছেলের কবরের পাশে কুকুরের মৃতদেহটি কবর দেয় এবং তারপর মহল্লার আতঙ্কিত লোকদের দিকে তাকিয়ে সে বলে, এই কবরে কোনো পীর নাই, কুত্তা আছে। তখন বদু মওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে মহল্লার লোকদের মনে হয়েছিল যে, বদু মওলানাকে কিছু বলার জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কালক্রমে তারা দেখতে পায় যে, বদু মওলানাকে তাদের কিছুই আর কোনোদিন বলা হয় না; বরং বদু মওলানা পুনরায় তাদেরকে বলতে শুরু করে। মহল্লার লোকেরা খাজা আহমেদ আলীকে দাফন করার দিন এটা বুঝতে পেয়েছিল যে, তার প্রতি তাদের সম্মানবোধের ওপর বদু মওলানা ঘৃণিত এক কুকুরের লাশ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু উনিশ শ আশি সনে মহল্লার লোকেরা জেনেছিল যে, এই কুকুরের মৃতদেহ বদু মওলানার কাছে প্রিয় ছিল সাতটি মানুষের লাশের চাইতে। ভিক্টোরিয়া পার্কের সভায় দাঁড়িয়ে সেদিন বদু মওলানা বলে যে, তার পুত্রের মৃত্যুর কথা বাদ দিলে একাত্তর সনে দুটো দুঃখজনক মৃত্যু সে দেখেছিল; বস্তুত সে একটি মৃত্যু দেখেছিল, সেটা ছিল তার প্রিয় পুত্রের কুকুর ভুলুর মৃত্যু। ভুলুর মৃত্যুতে সে মনে বেদনা অনুভব করেছিল। অপর মৃত্যুটি সে সংঘটিত হতে দেখে নাই; সে পরে শুনেছিল। সেটা ছিল রাজাকার আবদুল গণির মৃত্যু। বদু মওলানা অঙ্গুলিনির্দেশ করে শ্রোতাদের সেই বেঞ্চটি দেখিয়ে দেয় এবং বলে যে, যারা তখন ওই বেঞ্চের ওপর বসেছিল তারা জানে না, ওই বেঞ্চের ওপর আবদুল গণি শহীদ হয়েছিল, বদু মওলানার কথা শুনে লক্ষ্মীবাজার এবং কলতাবাজারের, পটুয়াটুলি এবং আরমানিটোলার লোকদের, যারা তার কথা শুনছিল, মনে হয়েছিল যে, সে হয়তো অন্য কোনো আবদুল গণির কথা বলছে। তাদের মনে হওয়া সত্ত্বেও, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এটা সেই আবদুল গণিই, যে ভিটাকোলার স্ট্র চুষতে চুষতে একুশ জন নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত বলে শনাক্ত করেছিল এবং এই সব মহল্লার লোকেরা শোকার্ত মিছিল করে গিয়ে খ্রিষ্টানদের কবরস্থানের পাশ থেকে খুঁড়ে তুলেছিল ছাপ্পান্নটি মাথার খুলি। কলাপাতার ওপর সাজিয়ে রাখা খুলিগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ জনতার তখন আবদুল গণির কথা মনে পড়েছিল। তাদের শোকার্ত ক্রোধ

জ্বলে উঠেছিল এবং তারা তখন খ্রিষ্টানদের কবরস্থান ছেড়ে ভিক্টোরিয়া পার্কের দিকে চতুর্দিক দিয়ে ধাবিত হয়েছিল। তারা যখন ভিক্টোরিয়া পার্কে পৌঁছয়, তারা দেখে যে, আবদুল গণির ছিন্ন মাথা ধুলোয় পড়ে আছে। আবদুল গণিকে কে হত্যা করেছিল লোকেরা তা জানতে পারে না, তবে তারা বুঝতে পারে যে, আবদুল গণি যাদেরকে নিহত বলে শনাক্ত করেছিল, সেই একুশ জনের যেকোনো আত্মীয় হত্যা করে থাকতে পারে; নয়াবাজারের ভস্মীভূত জনপদের যে-কেউ অথবা লক্ষ্মীবাজার, কলতাবাজার, পাটুয়াটুলি, ইংলিশ রোড, নারিন্দায় ন মাস যাবৎ মৃত্যুর মুখোমুখি বসবাসকারী যে কেউ হত্যা করে থাকতে পারে। জনতার মনে আবদুল গণির নিহত হওয়া নিয়ে কোনো বিস্ময় হয় না। তারা দড়ি খুলে আবদুল গণির ধড় বেঞ্চের ওপর থেকে একটি চাটাইয়ের ওপর নামিয়ে রাখে, রক্ত লেগে থাকা ভিটাকোলার বোতল এবং ছিন্ন মস্তক একখানে করে, মাটিতে জমা গাঢ় লাল রক্তের প্রতিটি বিন্দু ঘাস এবং মাটিসহ খুঁড়ে তোলে। তারপর জনতা একটিন ব্লিচিং পাউডার নিয়ে আসে, আবদুল গণির রক্ত লেগে যাওয়া বেঞ্চ এবং মাটিতে পাউডার ছড়িয়ে সবকিছু পরিশুদ্ধ করে। লক্ষ্মীবাজারের মানুষদের তখন বদু মওলানার ছোট ছেলের মৃত কুকুরের কথা মনে পড়ে। তারা মহল্লায় খাজা আহমেদ আলী আর খাজা শফিকের কবরের কাছে ছুটে যায়, অতি সন্তর্পণে কুকুরের প্রোথিত কঙ্কালের সঠিক স্থান নির্ধারণ করে এবং খুব আস্তে ও যত্নের সঙ্গে বদু মওলানার পরিবারের মৃত কুকুরের চাপা দেওয়া দেহাবশেষের ওপর থেকে মাটি সরায়। তারা কুকুরের হাড়গুলো এমনভাবে মাটি থেকে আলাদা করে, যেন মাটি এবং সেই মাটিতে শায়িত খাজা আহমেদ আলী এবং খাজা শফিক টের না পায়, তারা কি করে। কুকুরের হাড়গুলো লক্ষ্মীবাজারের মানুষ একটি চটের ব্যাগে পুরে ভিক্টোরিয়া পার্কে নিয়ে যায়। সেখানে তারা আবদুল গণির দ্বিখণ্ডিত দেহ এবং রক্ত মাখানো মাটি আর ভুলুর কঙ্কাল একত্রিত করে এবং বুড়িগঙ্গা নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলে দেয়। তারপর তারা এ দুটো প্রাণীর কথা ভুলে যায়। এর নবছর পর বদু মওলানার মুখে আবদুল গণির কথা শুনে মানুষের চোখে পুনরায় সব ভেসে ওঠে, তারা ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ পায়। তারা দেখে, পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা আর এক শ পাউন্ড ওজনের আবদুল গণি অন্য পাঁচ জন রাজাকারের সঙ্গে মহল্লার রাস্তায় কুচকাওয়াজ করে। মহল্লার লোকেরা, তাদের ভয় সত্ত্বেও, রাস্তায় এই ছয় কাকতাড়ুয়াকে লেফ্‌টরাইট করতে দেখে যেন আমোদিত হয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল যে, তারা নির্ঘাত কোনো সার্কাস দেখছে; দড়ি দিয়ে বাঁধা প্যান্ট, ক্যানভাসের ঢিলে জুতো আর তোবড়ানো ক্যাপ পরা যেন ছয় জন সঙ্‌। তখন, মার্চের পঁচিশ তারিখের পর মহল্লায় যে নির্জনতা নেমেছিল তাতে চার জোড়া ঘুঘু এসে মহল্লায় বাসা বেঁধেছিল। দুপুরবেলা যখন লোকেরা ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকত তখন বাড়ির কার্নিশের ওপর বসে ঘুঘু ডাকত আর লোকেরা শুনতে পেত তাদের রাস্তা দিয়ে 'লেপ্ট, লেপ্ট' করতে করতে রাজাকারদের চলে যেতে। সেই সময়, প্রাণ যখন

ম্রিয়মাণ ছিল ভয়ে, এদের দেখে মহল্লার নারীদের অর্বাচীনের মতো হাসি পেয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল যেন এক সারি ডায়া হেঁটে যায়। কেমুন লাল পিঁপড়ার লাহান লাগে এককেটারে, তারা বলেছিল। মহল্লার লোকেরা বুঝতে পারে না রাজাকাররা তাদের রমণী এবং শিশুদের এই কৌতুকের কথা শুনেছিল কি না, তবে মনে হয় যেন রাজাকাররা মহল্লায় তাদের জীবন কৌতুক দিয়েই শুরু করে। মহল্লায় তাদের প্রথম দেখা যাওয়ার তিন দিন পর তারা প্যারেড করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আব্বাস আলীর দরজায় এসে টোকা দেয় তেষ্টা নিবারণের জন্য, তারপর দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় দরজায় লাথি মারে তিনবার। তখন দরজা খুলে ছ ফুট লম্বা আব্বাস আলী এগিয়ে এলে তারা তার নাম জিজ্ঞেস করে। মহল্লার লোকেরা পরে শোনে যে, আব্বাস আলী তার নাম বললে ছজন রাজাকার মুখ ভেঙিয়ে বলেছিল যে, তার নাম আব্বাস আলী নয়, গাবগাছ আলী; তারপর দরজা খোলার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে যখন তোৎলায় তখন একজন রাজাকার লাঠি দিয়ে বিশালদেহী আব্বাসের পাঁজরে আঘাত করে এবং বলে, তুই ব্যাটা গাবগাছ আলী, তরে পিটায়া লাশ বানামু। তবে মহল্লার লোকেরা যখন আব্বাস আলীর পাঁজরে আঘাতের কালো হয়ে যাওয়া দাগ দেখে তারা বুঝতে পারে যে, এর ভেতর কোনো কৌতুক ছিল না। এরপর সঙের মতো দেখতে রাজাকারা প্রাইমারি স্কুলে কসাইখানা বসায় এবং এই কসাইখানার কর্মকাণ্ডের বিশদ হিসাব মহল্লার লোকেরা জানতে পারে ভিক্টোরিয়া পার্কে আবদুল গণির পাছার ভেতর বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেয়ার পর। এর নবছর পর বদু মওলানা তাদের বলে যে, আবদুল গণি কুকুরের মতো জনতার ক্রোধের কারণে নিহত হয়েছিল– সে শহীদ হয়েছিল আসলে। মহল্লার লোকদের এ ব্যাপারে যদিও বিভ্রান্তি হয় না, তবু তারা অনুধাবন করতে পারে যে, সময়ের সঙ্গে সত্য বদলে যায়। মহল্লার লোকের মনে হয় যে, প্রকৃতি অথবা ভাগ্য বোধ হয় ছজন রাজাকারের ভেতর কোনো কারণে আবদুল গণিকে বাছাই করে নিয়েছিল। ছজনের ভেতর একমাত্র সে-ই ধরা পড়েছিল যুদ্ধের পর, তার কারণেই এক বর্ষার দিনে সব ভয়ের ভেতরও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল মহল্লার লোক এবং তারপর মহল্লায় দ্বিতীয় দিনের মতো মিলিটারি এসেছিল। শ্রাবণের শেষ দিকে একদিন রাস্তায় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে আবদুল গণি দ্রুত মায়ারাণীদের পরিত্যক্ত বাড়ির ফটকের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। সে ভেবেছিল, বৃষ্টি শিগগিরই থেমে যাবে, কিন্তু অঝোর ধারায় বৃষ্টি দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়তে থাকলে সে বিরক্ত এবং কাঁধে ঝোলানো থ্রি নট থ্রি রাইফেলের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে রাইফেল নামিয়ে রাখে না, তবে দেখে, খোলা ফটকের পাশে একটি তুলসী গাছ বৃষ্টির পানিতে ভিজে ঢলোমলো করে। আবদুল গণি অনেকটা বিরক্তি এড়ানোর জন্য প্রথমে তুলসীর দুএকটি পাতা ছিঁড়ে চিবোয়, তারপর সে গাছের একটি ডাল ভেঙে নেয়। মহল্লার লোকেরা এই কাহিনী পরে জানতে পারে। তারা জানতে পারে যে, মায়ারাণীদের তুলসী গাছের ডাল ভাঙার পর বৃষ্টির দিনের সেই ঘটনার শুরু

হয়েছিল। মায়ারাণীকে মহল্লার লোকেরা এখনো দেখে, বনগ্রামের প্রাইমারি স্কুলে সে এখন শিক্ষকতা করে এবং এখনো অনূঢ়া। মহল্লার লোকেরা বলে যে, মায়ারাণী মোহাম্মদ সেলিমের প্রতীক্ষায় তার জীবন নিয়োজিত করেছে। কিন্তু আবদুল মজিদের মনে হয়েছিল যে, মায়ারাণী মোহাম্মদ সেলিমের প্রতীক্ষায় নাই, তবে সে কেন বিয়ে করে না তা আবদুল মজিদ বুঝতে পারে না। বাহাত্তর সনে যখন অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে মহল্লায় মায়ারাণীরা ফিরে আসে কিন্তু মোহাম্মদ সেলিম ফেরে না এবং তার তোরঙ্গের ভেতর মায়ারাণীর একটি চিরকুট পাওয়া যায়, তখন আবদুল মজিদের তাদের দেয়ালের ফোকরে রাখা একুশটি চিঠির কথা মনে পড়ে। সে ফোকরের মুখের ইট খসিয়ে ধুলো জমা কাগজগুলো বের করে পুনরায় অতীতের সেই বিপদগ্রস্ততায় ফিরে গিয়েছিল, যখন, সে চিঠিগুলো গ্রহণে মায়ারাণীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নাই অথচ সেগুলো মোহাম্মদ সেলিমকে ফিরিয়ে দিতেও পারে নাই। নিখোঁজ মোহাম্মদ সেলিমের চিঠিগুলো পুনরায় দেখে আবদুল মজিদের অপরাধবোধ হয়েছিল এবং একবার ভেবেছিল চিঠিগুলো মোহাম্মদ সেলিমের মার কাছে ফিরিয়ে দেবে, খুলে বলবে মায়ারাণীর চিরকুটের গোপন রহস্যের কথা। কিন্তু তা সে করতে পারে না, তার মনে হয় এই মিথ্যেটি এখন সত্যের চাইতে অধিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে গেছে এবং মোহাম্মদ সেলিমের মৃত্যুর ফলে বিষয়টি ইতিমধ্যেই অর্থহীন হয়ে গেছে; বিষয়টির নতুন করে অবতারণার কোনো মানে হয় না। ফলে মোহাম্মদ সেলিমের একুশটি নিষ্ফল চিঠি আবদুল মজিদদের ঘরের দেয়ালের ফোকরে আরো এক যুগের বেশি বন্দি হয়ে থাকে। তারপর একদিন, যেদিন রায়সা বাজার যাওয়ার পথে খায়ের মওলানার কথা শুনে তার স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায় তার ছমাস পর, এক রবিবারের সকালে ইয়াসমিন একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলে আবদুল মজিদ তার নাম রাখে মোমেনা এবং সেদিন বিকেলে পড়ন্ত রোদের মতো ম্লান-অনূঢ়া মায়ারাণী যখন আবদুল মজিদের নবজাতক মেয়েকে দেখতে আসে, তার পুনরায় মোহাম্মদ সেলিমের কথা মনে পড়ে। সে কালো এবং বিষণ্ন মায়ারাণীর মুখের দিকে তাকায় কিন্তু সে এখনো তাকে বুঝতে পারে না। তারপর মায়ারাণী যখন ইয়াসমিনের শয্যাপাশ ত্যাগ করে বাইরের ঘরে আসে, তখন আবদুল মজিদের মনে হয়, আর একবার সে চেষ্টা করে দেখতে পারে। সে মায়ারাণীকে বাইরের ঘরে বসায়। তারপর সে একটি চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে সেই প্রাচীন ফোকরের ভেতর থেকে মলিন কাগজের টুকরোগুলো বের করে বলে, এগুলি লয়া যান। আবদুল মজিদ বিস্ময়াবিষ্ট হয়, যখন, সে একুশটি চিঠি মায়ারাণীর দিকে এগিয়ে ধরে এবং মায়ারাণী একদণ্ড চুপ করে তাকিয়ে থেকে দুহাতের করতল পেতে চিঠিগুলো নেয়। আঁচলের খুঁটে একথোকা বাসী শেফালি ফুলের মতো মোহাম্মদ সেলিমের একুশটি প্রেমপত্র বেঁধে নিয়ে মায়ারাণী যখন একটিও কথা না বলে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন প্রথমে আবদুল মজিদের মনে হয় যে, এতদিনে সে লাড্ডু বিস্কুট খাওয়ার ঋণ থেকে মুক্তি পেল। তারপর, মোহাম্মদ সেলিমের জন্যও তার

হৃদয় উদ্বেলিত হয়; তার মনে হয় মোহাম্মদ সেলিমের সবকিছুই অবশেষে সফল হলো, সে যুদ্ধে গিয়ে দেশ মুক্ত করল এবং দীর্ঘ অবহেলা শেষে মায়ারাণী গ্রহণ করল তার প্রেম। কিন্তু মোহাম্মদ সেলিমের প্রেমের পুনর্বাসন সম্পর্কে আবদুল মজিদের এই ধারণা একদিন পরেই সংশয়কবলিত হয়। তার ভেতর একধরনের বিভ্রান্তি দেখা দেয়, যখন পরের দিন অপরাহ্নে মায়ারাণী তাকে ডেকে নিয়ে যায় এবং তাকে উঠোনে বসিয়ে রেখে তার চোখের সামনে কতিপয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। আবদুল মজিদকে উঠোনের ধারে বারান্দায় বসিয়ে মায়ারাণী একটি মরচে ধরা দা দিয়ে ফটকের কাছে বেদির ওপর লাগানো বড় তুলসী গাছটি গোড়া থেকে কেটে দূরে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসে, তারপর সে বেদির মাটি খুঁড়ে শিকড়সহ গোড়াটাও তুলে ফেলে দেয়। আবদুল মজিদের মনে পড়ে, তুলসী গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে একাত্তর সনে শ্রাবণের এক বৃষ্টির দিনে মহল্লায় এক বিদ্রোহ ঘটে যায়। রাজাকার আবদুল গণি বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মায়ারাণীদের ফটকের নিচে আশ্রয় নিয়ে তুলসীর ডাল ভেঙে পাতা চিবুচ্ছিল। তারপর বৃষ্টি ধরে এলে সে যখন তুলসীর ডাল হাতে নিয়ে বদু মওলানার বাড়িতে যায় এবং বারান্দায় বদু মওলানার মুখোমুখি হয়, তার দিকে তাকিয়ে বদু মওলানার ভ্রূ কুঁচকে যায়, কি খাও! বদু মওলানার এটা প্রশ্ন ছিল না, তিরস্কার ছিল; কারণ, তুলসী পাতা বদু মওলানার অপরিচিতি ছিল না। কিন্তু আবদুল গণি না বুঝে তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, তুলসী পাতা খাই। এই কথা শুনে বদু মওলানা ক্ষেপে গিয়েছিল, কিন্তু তার পরেও সে নিজেকে ধরে রেখে বলেছিল, তুলসী পাতা খাও কেন! নির্বোধ আবদুল গণি এর পরও তার কথা বুঝতে পারে নাই, সে পুনরায় মনে করে যে, এটা আর একটি প্রশ্ন এবং বলে যে, তুলসীর পাতা চিবোতে ভালো লাগে। তখন বদু মওলানা 'নাদান' বলে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে এবং তুলসীর ডালটি কেড়ে নিয়ে উঠোনে ছুড়ে ফেলে দেয়। সে বলে যে, তুলসী গাছ হিন্দুরা পূজা করে, এই গাছ হিন্দু গাছ। তখন বদু মওলানার একটি কথা মনে পড়ে যে, লক্ষ্মীবাজার এলাকা এই গাছ দিয়ে ভরে গেছে, সে জানে মহল্লার প্রতিটি বাড়িতে তুলসী গাছ আছে। তার মনে হয়, গাছ হিসেবে তুলসী অপ্রয়োজনীয় এবং আত্মার জন্য ক্ষতিকর। সে আধ ঘণ্টার ভেতর তার আঙিনায় ছজন রাজাকারকে সমবেত করে তুলসী গাছ সম্পর্কে তার বক্তব্য শোনায় এবং তারপর তাদেরকে অনতিবিলম্বে মহল্লার সব তুলসী গাছ কেটে ফেলতে বলে। এই নির্দেশের ফলে মহল্লায় প্রথম মিলিটারি আসার পর এবার রাজাকাররা প্রতিটি বাড়ির প্রাঙ্গণ, কুয়োতলা এবং গলি দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করে। তারা হিন্দু এবং মুসলমানদের প্রতিটি বাড়ি থেকে সব তুলসী গাছ টেনে উপড়ে অথবা গোড়া থেকে ভেঙে এনে রাস্তার ওপর এক জায়গায় ফেলে। এভাবে তুলসী গাছ কাটতে গিয়ে ব্যাপারটি জটিল হয়ে ওঠে যখন সকলের শেষে একজন রাজাকার আবদুল মজিদদের বাসায় ঢুকে পেছনের আঙিনায় কুয়োতলার কাছ থেকে একটি বড় আর দুটো ছোট গাছ উপড়ে নিয়ে আসার সময় দেখে, রক্তের মতো লাল

হয়ে জবাফুল ফুটে আছে। এই রাজাকারটির তখন মনে হয় যে, জবাফুল দিয়ে হিন্দুরা পূজা করে এবং তুলসীর মতো জবা ফুল গাছও হিন্দু গাছ এবং অপ্রয়োজনীয়। সে তখন ঝাঁকড়া জবাগাছটি গোড়া থেকে ভাঙার চেষ্টা করে, না পেরে ডাল ভাঙতে থাকে। এই অবস্থায় তাকে আবদুল মজিদের বোন মোমেনা দেখতে পায় এবং সে তার সহ্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মহল্লার লোকেরা পরে জানতে পারে যে, মোমেনা জবা ফুল গাছ ভাঙায় বাধা দিলে রাজাকারটি তার কথায় কর্ণপাত করতে চায় না, তখন এই মেয়েটি রান্নাঘর থেকে কাটারি নিয়ে এসে অনুপ্রেবেশকারীকে তাড়া করে বের করে দেয়। মহল্লার লোকেরা একটু পরেই সব জানতে পারে, কারণ, একটু পরেই তারা বিষয়টির সঙ্গে জড়িত হয়। তাড়া খাওয়া রাজাকারটি ঘটনার সময় নিরস্ত্র থাকায় ভয় পেলেও অন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়া মাত্র তার সাহস ফিরে আসে এবং আহত পৌরুষ জাগ্রত হয়। সে তার সঙ্গীদের সব ফুল গাছ কেটে ফেলার প্ররোচনা দেয় এবং মহল্লার লোকেরা দেখে, রাজাকাররা আবার তাদের বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে উদ্যত হয়। এতে তারা আপত্তি করে এবং এর ফলে প্রথমে রাজাকারদের সঙ্গে তাদের বচসা হয়, তারপর সবলোক জড়ো হয়ে গেলে এবং রাজাকাররা পুনরায় গৃহে প্রবেশের জন্য জোর করলে ধ্বস্তাধ্বস্তির এক পর্যায়ে একজন বিচ্ছিন্ন রাজাকারকে একজন চপেটাঘাত করে। ঘটনাটি খুবই আকস্মিকভাবে ঘটে যায়, যে রাজাকারটি চড় খায় সে হঠাৎ করে বুঝে উঠতে পারে না কে তাকে চড় মেরেছে, কারণ, সে তখন অন্যদিকে তাকিয়েছিল। অন্যদিকে মহল্লার লোকেরা এই লোকটিকে শনাক্ত করতে অস্বীকার করে, তারা বলে যে, তারা চপেটাঘাত করতে দেখেনি। তবে মহল্লার লোকেরা এক মুহূর্তের ভেতর ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়। তারা এক প্রবল ভয়ের অনুভব নিয়ে দ্রুত যার যার বাড়ির ভিতর অপসৃত হয়। রাস্তার ওপর ছজন রাজাকার প্রথমে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আক্রান্ত রাজাকারটির চৈতন্য যেন প্রথম ফিরে আসে। সে শূন্য রাস্তা আর বাড়িগুলোর বন্ধ ফটকের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে ওঠে, মান্দার পোলারা! তারপর তারা সব বন্ধ ফটকের দিকে দৌড়ে যায় এবং দমাদম করে লাথি মারতে থাকে, উন্মত্ততার এই পর্যায়ে চড় খাওয়া রাজাকারটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল বাগিয়ে ধরে এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে; রাইফেলের গুলি লেগে বাড়ির কার্নিশের পলেস্তারা খসে পড়ে, দরজা ফুটো হয়ে যায়। মহল্লার লোকেরা পরে জানতে পারে যে, গুলির শব্দ শুনে বদু মওলানা প্রথমে ভয় পেয়ে যায়, তারপর যখন সে জানতে পারে যে, তার রাজাকাররা ক্ষেপে গেছে, সে এগিয়ে এসে সব দেখে এবং তারা একটু শান্ত হয়ে এলে সব বৃত্তান্ত শোনে। বদু মওলানা যখন শোনে যে, একজন রাজাকারকে চড় মারা হয়েছে, সে খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। এই সময় গুলির শব্দ থেমে গেলে মহল্লার দু-একজন, যারা সাহস করে রাস্তায় উঁকি দেয় তারা দেখে, বদু মওলানার পেছনে রাজাকারদের মার্চ করে যেতে। সেই দিন আর কিছুক্ষণ পরে মহল্লায় দ্বিতীয়বারের মতো মিলিটারি আসে এবং

মহল্লার লোকেরা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হতে দেখে। এই বিষয়টি পরে জানা গিয়েছিল যে, বদু মওলানা রাজাকারদের কাছ থেকে সব শুনে বিচলিত হয়ে পড়ে এই কারণে যে, সে পুরো জিনিসটার ভেতর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া সাহসের এক পুনরুত্থানের ইঙ্গিত যেন দেখতে পায়। তার মনে হয়, মহল্লার লোকদের আর একবার মিলিটারি দেখানো প্রয়োজন। তার দেয়া খবর পেয়ে একটু পরে গুম্‌গুম্‌ শব্দ করে মিলিটারি বোঝাই একটি ট্রাক মহল্লার চাপা রাস্তার ওপর, ফেলে রাখা তুলসী গাছের স্তূপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন মহল্লার লোকদের যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা এই অবস্থায় সব প্রাণীরই হয়, তা হলো ছুটে পালানো। কিন্তু লক্ষ্মীবাজারে লোকদের অতীতের সেই উপলব্ধির কথাটি মনে পড়ে যে, দেশে পালানোর স্থান নেই এবং এবার তারা পলায়নের প্রবল ইচ্ছে অবদমিত করে যার যার বাড়িতে থেকে যায়। পরে এই বিষয়টি জানা গিয়েছিল যে, মিলিটারির আগমন সংবাদ পেয়ে বদু মওলানা মিলিটারির এই দলটির নেতা, এক মাকরানি লেফটেন্যান্টকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসায়। বদু মওলানা তখন তাকে মহল্লায় সংঘটিত অভ্যুত্থানের ঘটনা সম্পর্কে বলে। কালো কুচকুচে অল্প বয়সী লেফটেন্যান্ট প্রশ্ন করে ঘটনার প্রতিটি স্তর উন্মোচিত করে বলে ওঠে, কেয়া আপ আওরাতকা সাথ নেহি সাকতা? বদু মওলানা তার এই কথায় খুবই বিব্রত বোধ করে এবং বলে যে, যদিও এই উত্থানের সূত্রপাত করেছিল একজন স্ত্রীলোক, পরিণতিতে মহল্লার সব পুরুষ এতে অংশ নেয় এবং একজন পুরুষই আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী রাজাকারকে চপেটাঘাত করার দুঃসাহস দেখায়। তখন মাকরানি লেফটেন্যান্ট মহল্লায় একটি অপারেশন করার বিষয়ে বদু মওলানার সঙ্গে একমত হলেও সে তার চাপল্য ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয় এবং বলে, লেটস সি দি হিরোইন ফার্স্ট। বদু মওলানা, হিরোইনটি কে তা বুঝতে সক্ষম হলেও, ইংরেজি এই বাক্যের পুরো অর্থ বুঝতে পারে না; তখন লেফটেন্যান্ট তাকে উর্দুতে তার ইচ্ছের কথা বুঝিয়ে দেয় এবং বদু মওলানা দুজন রাজাকারকে পাঠায় মোমেনাকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু রাজাকাররা মোমেনাকে বাসায় পায় না মহল্লার লোকেরা কেউ তাকে বাড়ি ত্যাগ করে যেতে দেখে নাই, কিন্তু তার মা বলে যে, সে কুমিল্লায় তার খালার বাড়ি বেড়াতে গেছে এই একটু আগে। রাজাকাররা আবদুল মজিদের মার এই কথা শুনে রাগে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে থাকে। তাদের কোনো সন্দেহ-ই থাকে না যে, স্ত্রীলোকটি মিথ্যে বলছে, কিন্তু বাড়ির ভেতরটায় খুঁজে তছনছ করেও তারা মোমেনাকে দেখতে পায় না। এই সময় মহল্লার লোকেরা, যারা জানালা অথবা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়, রাস্তার ওপর সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি উন্মোচিত হতে দেখে। তারা দেখে, ট্রাকের ওপর থেকে কয়েকজন মিলিটারি সিপাই রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামে, তাদের হাতে চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল। তারা প্রথমে রাস্তায় অল্প অল্প পায়চারি করে, তারপর দুজন গিয়ে ওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় এবং পেশাব করে। সেই সময় একজন সিপাই একটি তুলসীর

ডাল তুলে নিয়ে পাতা ছিঁড়ে রাস্তার ওপর ফেলতে থাকে। এটা মহল্লার লোকেরা বুঝতে পারে যে, সময় কাটানোর জন্য সে এই কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু এটা করতে গিয়ে সে তুলসীর প্রভাবের কবলিত হয়। পাতা টেনে ছেঁড়ার সময় সে প্রথমে এর ব্যতিক্রমী ঘ্রাণটি পায় এবং সে তখন একটি সবুজাভ বেগুনি রঙের পাতা প্রথমে একটু সামনের দাঁতে কেটে তারপর মুখের ভেতর স্থাপন করে। তখন, ক্যান্টনমেন্টের রুটি আর কাবাব খাওয়ার একঘেয়ে অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধের উত্তেজনায় অবসাদগ্রস্ত তার জিহ্বাটি এক মুহূর্তে ঝাঁঝালো রসের ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে ওঠে। এ সময় রাজাকাররা কুচকাওয়াজ করে ফিরে আসে, তারা তুলসী পাতা ভক্ষণরত সিপাইদের দিকে না তাকিয়ে ভেতরে গিয়ে তাদের ব্যর্থতার খবর দেয়। রাজাকারদের এই ব্যর্থতায় তরুণ লেফটেন্যান্টের অপারেশন পরিচালনা করার ইচ্ছে সবল হয়। বদু মওলানাকে সঙ্গে করে সে যখন বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায় তখন সে দেখে, তার সিপাইরা গুল্মের একটি স্তূপকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাঁধে রাইফেল হাতে তুলসীর ডাল; প্রত্যেকে পাতা চিবোচ্ছে। সে এবং বদু মওলানা দেখে যে, লোকগুলো তুলসীর সব পাতা প্রায় খেয়ে ফেলেছে, তাদের সামনে পড়ে আছে পাতাহীন গুল্মের কঙ্কালের স্তূপ। এই দৃশ্য দেখে বদু মওলানা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এবং লেফটেন্যান্ট বিচলিত হয়। যখন বদু মওলানা তাদেরকে বলে যে, এ তারা কি করছে, তারা উত্তর দেয়, ইয়ে এলাজ হায়। তখন হতাশ বদু মওলানা লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরে বলে যে, এই লোকগুলোর আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে। তার এই কথা শুনে লেফটেন্যান্টের মনে হয়, সিপাইগুলো যেভাবে ধুলোবালি-মাখা আধমণ পাতা খেয়েছে তাতে খুব শিগগিরই তাদের পেটে বিষক্রিয়া হবে। তার মনে হতে থাকে এ-ও হয়তো মুক্তিযোদ্ধাদের পেতে রাখা একটি ফাঁদ ছিল। এই অবস্থায় মহল্লায় অপারেশন স্থগিত হয় এবং দ্রুত চিকিৎসার জন্য লেফটেন্যান্ট সিপাইদের নিয়ে মহল্লা ত্যাগ করে। এর পনেরো বছর পর নির্জন এক অপরাহ্ণে মায়ারাণী যখন আবদুল মজিদকে সামনে বসিয়ে রেখে ফটকের কাছে বেদির মাটিতে বড় হয়ে ওঠা তাদের তুলসী গাছটি শেকড়সহ খুঁড়ে তুলে ফেলে দেয় সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে থাকে। সে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না, কারণ, মায়ারাণীর সঙ্গে তার কখনোই বেশি কথা বলার সম্পর্ক ছিল না, তা ছাড়া তার মনে হয় যে, মায়ারাণী এইসব অলৌকিক কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততার ভেতর তার সঙ্গে এখন কথা বলবে না। সে দেখে, গাছ কেটে এবং শেকড় উপড়ে ফেলে দেয়ার পর মায়ারাণী একটি কচি তুলসী গাছের চারা, কাঁসার ঘড়ায় করে পানি, গোলাপি কাপড়ে বাঁধা একটি ছোট পুঁটুলি এবং তেলের প্রদীপ এনে উঠোনে রাখে। তারপর মায়ারাণী যখন পায়ের পাতার ওপর বসে পুঁটুলিটি খোলে, আবদুল মজিদ সেই একুশটি পত্র দেখতে পায়। আবদুল মজিদের মনে হয় যেন মায়ারাণী কোনো এক বিস্ময়কর যজ্ঞ সম্পাদন করে চলে; সে দেয়াশলাইয়ের কাঠি ঠুকে প্রদীপের সলতেয় আগুন জ্বালে, তারপর মোহাম্মদ সেলিমের একুশটি বিষণ্ন চিঠি একে একে

পুড়িয়ে ছাই করে সে ছাই বেদির মাটিতে প্রয়োগ করে। এই ঘটনায় আবদুল মজিদের দুঃখবোধ হলেও সে অপেক্ষা করে এবং দেখে যে, বেদির মাটির সঙ্গে কাগজ-পোড়া ছাই মেশানোর পর মায়ারাণী তরুণ তুলসী গাছটি তুলে নিয়ে যত্নের সঙ্গে সেই মাটিতে রোপণ করে। তারপর গোড়ায় একটি কাঠি পুঁতে দিয়ে ঘড়া থেকে জল ঢেলে দেয়। এই পর্যায়ে এসে আবদুল মজিদের হতাশা এবং দুঃখবোধ একধরনের বিভ্রান্তিতে রূপ নেয় এবং তার মনে হয় যে, তার এই বিভ্রান্তির সমাধান কোনো দিনই হবে না; কারণ, মায়ারাণী কোনোদিনই তাকে পরিষ্কার করে বলবে না, সে যা করেছিল তা কেন করেছিল। মায়ারাণী শুধু তার অন্য প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিল, যে প্রশ্নটি তার মনের ভেতরে ছিল কিন্তু সে উচ্চারণ করে নাই, এই বলে যে, তাকে ডেকে এনে এসব দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল এই, যাতে সে জানে চিঠিগুলোর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে। মায়ারাণীর এই কাণ্ড দেখে ঘরে ফিরে আসার পর আবদুল মজিদের মনে দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত এবং বিস্মৃত মোহাম্মদ সেলিমের প্রেমের সাফল্য এবং ব্যর্থতাবিষয়ক তার বিভ্রান্তি জেগে থাকে। এই সময় তার মা একটি কাঁথায় জড়িয়ে তার সদ্যোজাত কন্যাটিকে তার কোলে যখন দেয়, সে দেখে, একটি খয়েরি রঙের নরম কাপড়ের মতো তার মেয়ের ছোট্ট মুখ; তার মনে হয়, তার কন্যাটিও কালো হবে তার মা এবং মোমেনার মত। মোমেনার কথা আবার যখন তার স্মৃতিতে স্পষ্টভাবে এসে পড়ে এবং যখন সদ্যজাত মেয়ে সন্তানটির নামকরণ নিয়ে তার নানি এবং দাদি, মা এবং খালা অচিরেই তৎপরতা শুরু করে তখন আবদুল মজিদ তার কন্যাটিকে দুহাতে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বলে যে, এই কন্যাটির নাম 'মোমেনা' রাখা হোক। তার কথা শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। তার বৃদ্ধা মা নিমজ্জিত হয় তার নিজের প্রথম কন্যার আগমন এবং তিরোধানের ঘটনার আনন্দ এবং বেদনার স্মৃতি উদ্‌ঘাটনে, অন্যরা বুঝতে পারে যে, এই নামটি এই পরিবারের লোকদের আবেগ এবং অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। আবদুল মজিদের মেয়ের নাম 'মোমেনা' রাখা হয়ে যায়। ছোট মোমেনার অস্তিত্বের ভেতর বড় মোমেনার অস্তিত্ব যে ফিরে আসে, এ ব্যাপারে আবদুল মজিদের কোনো সন্দেহ থাকে না– যে বড় মোমেনাকে তারা বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছিল। জবা ফুল গাছ নিয়ে মহল্লায় খণ্ড যুদ্ধের পর যখন রাজাকাররা আবদুল মজিদদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল মোমেনার খোঁজে তখন সে কুয়োতলার পেছনে একটি পরিত্যক্ত এবং ভগ্ন কুঠরির মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল, তার দেহ ছাই এবং মাটি দিয়ে পরিপূর্ণভাবে ঢেকে দেয়া ছিল, কেবলমাত্র পেঁপে পাতার ডাঁটার তিনটে নল তার নাকের সঙ্গে বাইরের আবহাওয়ার সংযোগ সাধন করেছিল, এবং এই আস্তরণের ওপর একটি মুরগি সাতটি ডিমের ওপর বসে তা দিচ্ছিল। রাজাকাররা এসে সারা বাড়ি খুঁজে মোমেনাকে পায় না, তার মা তাদের বলে যে, সে তার খালার বাড়ি বেড়াতে গেছে। সে দিন মোমেনা মাটি এবং ছাইয়ের নিচে চাপা দেয়া অবস্থায় পড়ে ছিল। পরে সে বলেছিল যে, সে এই সময়টা ঘুমিয়ে ছিল, রাত

গভীর হলে আবদুল মজিদ কোদাল দিয়ে কেটে তার ওপর থেকে মাটি সরানোর পর তার ঘুম ভাঙে। এই কবরের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে মোমেনা আশ্রয় নেয় তাদের মধ্যের ঘরের চৌকির তলায়। মহল্লার লোকেরা এরপর আর মোমেনাকে দেখে নাই, তারা জেনেছিল, যে সে কুমিল্লা গেছে এবং ডিসেম্বরের দশ তারিখে, ঢাকার ওপর যখন উড়োজাহাজ বোমা ফেলছিল এবং দেশ যেকোনো মুহূর্তে মুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, তখন তারা জানতে পারে যে, মোমেনা তাদের বাসাতেই ছিল এবং রাজাকাররা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, মোমেনা চৌকির নিচে লুকিয়ে ছিল এবং রাত ছাড়া বের হতো না; তা সত্ত্বেও, রাজাকাররা খবর পেয়ে যায় এবং দশ তারিখে কারফ্যুর ভেতর এসে আবদুল মজিদদের প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়। এবার আবদুল মজিদের মা, তার মেয়ে কুমিল্লায় থাকে বললে তারা হাসে এবং ঘরে ঢুকে চৌকির তল থেকে মোমেনাকে টেনে বের করে। সে সময়, আবদুল মজিদ এসে যখন তার বোনের হাত ধরে, একজন রাজাকার তার পেটের ওপর বন্দুকের নল চেপে ধরে এবং মোমেনা তখন বলে, ডরাইস না, আমারে কিছু করব না। এই কথা বলে একাত্তর সনের ডিসেম্বরের দশ তারিখে দুপুরের পর মোমেনা আবদুল মজিদের হাতের বাঁধন খুলে রাজাকারদের সঙ্গে চলে যায়; সে আর ফেরে নাই। তখন আবদুল মজিদ আর তার মা বদু মওলানার বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল, বদু মওলানার পায়ের ওপর তার মা পড়ে ছিল, লোকে যেমন আল্লাহর উদ্দেশে সেজদায় পড়ে থাকে। আবদুল মজিদ দেখেছিল, আধোচৈতন্যের ভেতর অবস্থানকারী তার মায়ের মুখের ফেনায় বদু মওলানার পাম্প শু ভিজে যাচ্ছিল। বাড়ির ছাদের ওপর এবং ফটকের কাছে বালুর বস্তার পেছনে পাহারারত রাজাকার নিয়ে, এই কোণঠাসা অবস্থাতেও বদু মওলানা আবদুল মজিদের মায়ের কথা শুনে কৌতুক করে ওঠে, আপনের মাইয়া না কুমিল্লা থাকে! এবং তারপর সে তার পা ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়। এরপর বদু মওলানাকে তারা দুবছরের আগে আর মহল্লায় দেখে নাই। মোমেনাকে আবদুল মজিদ চার দিন পর খুঁজে পায় রায়েরবাজারের পশ্চিম প্রান্তে, বুড়িগঙ্গা নদীর কিনারায়, বালুচরের মতো দেখতে এক মাঠের ওপর। আবুদল মজিদ এখন বুঝতে পারে না এই চার দিন তার আদৌ সংজ্ঞা ছিল কি না। তার এখন শুধু মনে পড়ে খুঁজে খুঁজে সে যখন মোমেনাকে পায়, সেই সময়টিকে। রায়েরবাজারের জনমানবহীন কুমোরপাড়ার ভেতর দিয়ে সে যখন গিয়ে একটি উঁচু ডাঙার প্রান্তে দাঁড়ায়, সে দেখে, বালুচরের মতো কিছু শুকনো মাঠ এবং কিছু জলাভূমি ধার ঘেঁষে পড়ে আছে, আর দূরে রোদের আলোয় চিকচিক করে বিশীর্ণ নদীর জল। এই বালুচরের মতো একটি মাঠে সে মোমেনাকে পড়ে থাকতে দেখতে পেয়েছিল। এই দূরত্বটুকু সে পার হয়ে এসেছিল অথবা বলা যায়, সে এখন বলে যে, এই দূরত্বটুকু পার করে এনে ঈশ্বর তাকে তার মৃত বোনের পাশটিতে স্থাপন করে দেয়। সে তখন তার বোনকে দেখে। তার একটি স্তন কেটে ফেলা, পেট থেকে উরু পর্যন্ত

ক্ষতবিক্ষত, ডান উরু কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে তরমুজের মতো হাঁ করে রাখা; সে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, তার পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো দেহের নিচে চাপা পড়ে ছিল, মুখটা ছিল আকাশের দিকে উত্থিত। সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল, তার বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠেছিল, আর সে বিকারগ্রস্তের মতো শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল। সে মোমেনার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে আকাশের দিকে খুলে রাখা অর্ধনিমীলিত চোখের ওপর চোখ রেখে 'আপা' 'আপা' বলে কেঁদেছিল। আবদুল মজিদ পরে যখন তার মেয়ের নাম রাখে মোমেনা, সে তা এই কারণে করে না যে, সে মোমেনার নাম ভুলে যাচ্ছে; বরং এই কারণে যে, এই নামটি ভুলে যাওয়ার নয়। আবদুল মজিদের মেয়ের নাম মোমেনা রাখায় মহল্লার লোকদের কি প্রতিক্রিয়া হয়, আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কি না অথবা তারা আদৌ ব্যাপারটি জানে কি না, তা সে জানতে পারে না। কিন্তু আবদুল মজিদ এ সময় একদিন প্রবল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে যে, একাত্তর সনের স্মৃতি সবচাইতে বেশি মনে রয়ে গেছে বদু মওলানার। বদু মওলানা এই বিষয়টি ভোলে নাই যে, মোমেনাকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল এবং সম্ভবত দেশ মুক্ত হওয়ার পর মহল্লায় ফিরে আলাউদ্দিনের মায়ের তাড়া খাওয়ার পর বুঝতে পারে যে, এই জনগোষ্ঠীও কোনো কিছুই ভুলে যায় নাই। কারণ, যে বদু মওলানা, আবদুল মজিদের সঙ্গে অপ্রয়োজনে কথা বলে না, সে একদিন তাকে রাস্তায় থামিয়ে তার বাচ্চা মেয়ের কুশল জিজ্ঞেস করে এবং তারপর বলে, বইনের নামে নাম রাকছো, বইনেরে ভুলো নাইকা? আবদুল মজিদ যে মোমেনার কথা কোনোদিন ভুলবে না সেটা তো আবদুল মজিদের জানাই আছে। কিন্তু বদু মওলানার কথা শুনে তার যা মনে হয়, তা হলো এই যে, বদু মওলানা জানে আবদুল মজিদরা একাত্তরের নয় মাসের কথা ভোলে নাই। বদু মওলানার কথা শুনে আবদুল মজিদ চিন্তিত হয়ে থাকে। তার মনে পড়ে একদিনের কথা, রায়সা বাজার যাওয়ার পথে স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে গেলে বদু মওলানার ছেলেকে ধন্যবাদ দেওয়া দেখে সে প্রবলভাবে তাড়িতবোধ করেছিল এবং সেদিন আজিজ পাঠান তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাঁধের ওপর হাত রেখে বলেছিল যে, সময়ে মানুষকে অনেক কিছু ভুলে যেতে হয়, বাস্তবতা অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে। আবদুল মজিদ এখন বরং দেখতে পায়, মানুষ কেউই কিছু ভোলে না এবং বদু মওলানারও এই কথাটি জানা আছে। এই অবস্থায় কয়েক দিনের চিন্তাভাবনার শেষে সে সিদ্ধান্ত নেয় মহল্লা ত্যাগ করে যাওয়ার। এ ব্যাপারে অবশ্য সে তার মা, স্ত্রী এবং দুবোনের স্বামীদেরও মতামত নেয়, তবে লক্ষ্মীবাজারের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে বাড্ডায় তার শ্বশুরবাড়ির কাছ গিয়ে নতুন বসত শুরু করার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে তার মনে হয়, এটাই একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। প্রথমত, সে চায় না, তার মেয়েটি তার বোনের মতো বদু মওলানা কিংবা তার ছেলেদের জিঘাংসার শিকার হোক এবং তার মনে হয়, বাস্তবতা এভাবে এগোলে এ রকম যে

ঘটবে না তা কেউ বলতে পারে না। তার মনে হয়, বদু মওলানা একাত্তর সনের সেই একই রাজনীতির চর্চা করে এবং সে এখনো জানে আবদুল মজিদ এবং তার পরিবার মোমেনার মৃত্যুর জন্য এখনো তাকে ঘৃণা করে। তার মনে হয়, এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় বদু মওলানা এবং তার দল সুবিধে করতে পারলে তারা আবদুল মজিদকে ছেড়ে দেবে না এই ঘৃণার জন্য। তবে আবদুল মজিদ এটাও বুঝতে পারে যে, বদু মওলানার সে সুযোগ ঘটলে মহল্লার প্রায় সব লোকই আবার তার সেই পুরনো চেহারাটা দেখতে পাবে; কিন্তু এই ভয়ে একটি মহল্লার সব অধিবাসী বাড়িঘর বিক্রি করে পালাতে পারে না। তা সত্ত্বেও, আবদুল মজিদ ঠিক করে যে, মহল্লার সব লোকের কি হবে তা নিয়ে চিন্তা করে তার লাভ হবে না, সে প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে চায় এবং কোনো সমষ্টিগত প্রচেষ্টার অবর্তমানে সে তা করতে পারে এখনই মহল্লা ত্যাগ করে। তার এই চিন্তা এবং সিদ্ধান্তের পরিণতিতে ছিয়াশি সনের সাতই জানুয়ারির দৈনিক ইত্তেফাকে আবদুল মজিদদের বাড়ি বিক্রির একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এবং ধরে নেয়া যায় যে, তাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকলে লক্ষ্মীবাজারে তাদের নাম অবলুপ্ত হয়েছে। মহল্লার লোকেরা তাদের এই আচরণে প্রথমে হয়তো বিস্মিত হয়; তবে একসময় তারা হয়তো বুঝতে পারে, কেন আবদুল মজিদ মহল্লা ছেড়ে চলে যায়, অথবা এমনও হতে পারে যে, আবদুল মজিদের এই সংকটের বিষয়টি মহল্লায় এবং দেশে হয়তো কেউ-ই আর বুঝতে পারে নাই।

সে রাতে পূর্ণিমা ছিল

গ্রামের লোকদের সে রাতের চাঁদের কথা মনে পড়ে এবং তারা সেই চাঁদের বর্ণনা দেয়। আততায়ীদের হাতে ভাদ্র মাসের এক মেঘহীন পূর্ণিমা রাতে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারে নিহত হওয়ার পরদিন, গ্রামবাসীদের কেউ কেউ মহির সরকারের বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়। অনেকটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও তারা ঘটনার আকস্মিকতার বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারে না; মহির সরকারের বাড়ির বাইরের উঠোনে লম্বা বেঞ্চে গোবর এবং বিচালির গন্ধের ভেতর বাকরহিত হয়ে বসে থাকে এবং খেলো হুঁকোয় তামাক খায়। সেই ভোরের নরম এবং শীতল আলোয় হুঁকো টানার জলজ শব্দে তাদের যে ইন্দ্রিয়াচ্ছন্নতা হয় তার ভেতর পূর্বদিনের রাতের ঘটনা একটি দূরবর্তী দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে থাকে এবং সবকিছুর ভেতর চাঁদের প্রসঙ্গটি যেন তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। তারা স্মরণ করতে পারে যে, এক অতিকায় চাঁদ উঠেছিল আগের দিন সন্ধ্যায়। হয়তোবা চাঁদের এই জাগরণে ব্যতিক্রমি কিছু ছিল না; কিন্তু ভাদ্র মাসের এই পূর্ণিমা রাতে সুহাসিনী গ্রামে যে ঘটনা ঘটে যায়, সে ঘটনায় গ্রামের মানুষ স্তম্ভিত হয়; কিন্তু তারপর তারা যখন এই ঘটনাবলি ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে তারা নির্বাক হয়ে হুঁকো টানে এবং তাদের শুধু পূর্ণিমার সেই চাঁদের কথা মনে পড়তে থাকে। তখন হুঁকোর গুড়গুড় শব্দ এবং খামিরা তামাকের গন্ধের ভেতর ডুবে থেকে তোরাপ আলি কথা বলে, সে বলে যে, আগের দিন সন্ধের সময় সে রাস্তার কিনারায় বেঁধে রাখা গরুর বাছুর ঘরে আনছিল; সে বলে, আমি পরথমে বুইজব্যার পারি নাই, শরীলের মইদ্দে কেমুন যানি ভাব হইবার নিছিল, কেমন যানি ঘোরঘোর নেশার নাহাল, চাইর দিকে কেমন যানি ধুলা ধুলা, কিন্তু ধুলার ভিতরে কেমন যানি ভাব, কেমন যানি রঙের নাহাল ছড়ায়া আছে; আমি তো বুজি না কি, খালি বুজি কিছু একটা; তার বাদে যহন ম্যাবাড়ির সামনে আইছি তহন বুইজব্যার পারি আসলে

কি; দেহি কি ম্যাবাড়ির মাথাভাঙ্গা আম গাছটার ডাইন পাশ দিয়্যা পূন্নিমার চান ভাইসা উইঠছে। গ্রামবাসীদের সকলের এই চাঁদটির কথা মনে পড়ে এবং মহির সরকারের উঠোনে বসে তারা বলে যে, তাদের মনে হয়েছিল যেন এক ছিন্ন মুণ্ডুর মতো রক্তাক্ত চাঁদ গ্রামেব মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। অমাবস্যার অন্ধকারের বদলে আততায়ীরা কেন পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত রাতকে বেছে নেয়, তা গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে না; তারা কেবল এই বিষয়টি ভেবে বিস্মিত হতে থাকে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া কি করে মারা যেতে পারে, এ রকম তো হওয়ার কথা ছিল না, তার তো ১১১ বৎসর বেঁচে থাকার কথা ছিল এবং তার বয়স তো মাত্র ৮১ বৎসর হয়েছিল বলে তারা জেনেছিল। মহির সরকারের উঠোনে কথা বলার সময় তোরাপ আলিও এই প্রসঙ্গটি সম্পর্কে ভয়ানক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সে বলে, আগে যহন আমি ম্যাসাবের চুল কাইটত্যাম তখন ম্যাসাব একদিন আমাক সেই চিন্ন দেহাইছিল। এই কথা শুনে গ্রামের লোকেরা স্মরণ করতে পারে যে, তোরাপ আলি একসময় এই গ্রামে নরসুন্দরের কাজ করত, এ কথাটি সত্য, পরে তার স্ত্রীর ক্রমাগত হুমকির মুখে সে পেশা পরিবর্তন করে গ্রামের ভেতর ছোটো একটি মুদি দোকান খোলে। তোরাপ আলি বলে, মুদি দোকান খোলার অনেক আগে, ম্যাসাবের বাইর বাড়ির গাবগাছ তলায় ভরদুপুরবেলা আমি ম্যাসাবের চুল কাইটত্যাছি, ম্যাসাবের গায়ে সাদা চাদরখান জড়ায়া দিছি, চাদরের নিচের কিনার দিয়্যা কব্জি পর্যন্ত হাত বাইর হয়া রইছে; তোরাপ আলি বলে যে, তখন একসময়, ঝকাঝক করে কাঁচি চালাতে চালাতে সে খেয়াল করে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া তার উরুর ওপর ডান হাতের তালু খুলে চিৎ করে ধরে আছে; সে বলে, চান্দাইকোনা থাইকতে আমি যহন চুল কাটার কাম শিখি, তখন এক ওস্তাদের কাছে আমি মানুষের হাত দেখা শিখছিল্যাম। তোরাপ আলির মুখে এই কথা শুনে সেই ব্যাতিক্রমি সময়ের ভেতরেও গ্রামের লোকেরা কেমন বিভ্রান্ত বোধ করে, গ্রামের প্রাক্তন নাপিত তোরাপ আলি জোতিষবিদ্যা জানে এ কথা তারা কখনো শুনেছিল কি না, তা তারা স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু সময়টা ছিল তর্কের অনুপযুক্ত, তারা তাদের বিভ্রান্তিসহ নীরবে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে। তোরাপ আলি বলে যে, তখন সেই মুহূর্তে তার সামনে সে অসাধারণ একটি করতল প্রসারিত দেখতে পায়; মহির সরকারের উঠোনে জড়ো হওয়া কৃষকদের নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, আমার ওস্তাদ শিখাইছিল যে, মাইনষের জীবনের উপুর ভর কইর‍্যা থাকে চাইরট্যা জিনিস, এ্যার একটা হইলো সূরযো, তার বাদে চান, মঙ্গল আর শনি; মাইনষের হাতে থাকে এই চাইর জনের রাজত্বের হিসাব, যুদি শনির রাজত্ব বাইড়া যায় তাইলে বাণিজ্যের নাও মাইর খায়, ফসলে পোকা হাঁটে, আন্ধারে পেঁচা ডাইক্যা ওঠে, আসে দুর্দিন; তবে সূরযের রাজত্ব যুদি বড় থাকে তাহইলে সাহস থাকে কইলজা জোড়া, আর তাইলে শনি কাবু হয়্যা থাকে; আর মঙ্গল যুদি রাজা হয় তাইলে সব ভালো; কিন্তু চান্দের রাজত্ব যুদি বড় হয় তাইলে কি হয় ওস্তাদ? আমি জিজ্ঞাস করি, আমার ওস্তাদ

কয়, এ্যার কোনো ভালো-মন্দ নাই, কিম্বা এইটা ভালো-মন্দ দুই-ই; চান্দের আলো যহন ফেরেশতারা পিরথিবীতে ঢাইল্যা দেয়, তহন বিরিক্ষ আর পশুপাখির পরান নিঝঝুম হয়্যা আসে, তহন চান্দের রাজত্বে যে যায় সে কইতে পারে না, সে জাইগা না ঘুমায়া আছে, সে য্যান খালি এক নেশার ভিতর দিয়্যা হাঁইট্যা যায়; এই কথা কইছিল আমার সেই ওস্তাদ; আর সেইদিন ম্যাবাড়ির উঠানে গাবগাছের ছায়ায় চিৎ কইর‍্যা রাখা ম্যাসাবের হাতের জমিনে আমি সূরযের রাজত্ব বড় শক্ত দেখি, কিন্তু তার হাতের তালুত তার চাইতে বড় আছিল চান্দের পাহাড়। তোরাপ আলি বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার করতলের রেখা দেখে বহুদিন পূর্বে সেই দুপুরে সে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কারণ সে বলে যে, মানুষের হাতের রেখা আঙুলের দিক থেকে কব্জির দিকে নেমে আসে, কিন্তু মফিজুদ্দিন মিয়ার হাতের রেখাগুলো কব্জির কাছাকাছি স্থানে জটলাবদ্ধ ছিল এবং এই জট থেকে তিনটি পাকানো দড়ির মতো রেখা আঙুলের দিকে প্রবাহিত হয়ে, কনিষ্ঠা ও অনামিকা, অনামিকা ও মধ্যমা এবং মধ্যমা ও তর্জনীর মাঝখানের গর্তে পতিত হয়েছিল। তোরাপ আলি বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার করতলের রেখাগুলোর, হাতের আঙুল বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাওয়ার এই দৃশ্যে তার এক অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছিল, তার কেমন ভয় লেগেছিল যেন; সে বলে, আমি চুল কাটা থামায়া তাকায়া থাকি, জিজ্ঞাস করি, ম্যাসাব আপনের হাতের রেখাগুলান এই রকম ক্যা? ম্যাসাব বিরক্ত হয় নাকি আমার কথা শুইন্যা, তা বুজিবার পারি না, কেমন গম্ভীর হয়্যা কয়, কি রকম? আমি সাহস রাইখ্যা কই, কেমন যানি গড়ায়া পইড়ত্যাছে, কি যানি বায়া পইড়ত্যাছে জমিনের দিকে মনে হয়। আমার এই কথা শুইন্যা ম্যাসাব নিজের হাতখান ঘুরায়া ফিরায়া দেইখলো, যানি নিজের হাত এ্যার আগে নিজেই দেখে নাই, তার বাদে এক পাশে নিচের দিকে ঝুলায়া দিয়া কইলো, যে জিনিস ঝইরা পড়ে তোরাপ, তা হইত্যাছে জেবন, এই হাত থেইক্যা যা ঝইরা পড়ে তা হইলো ত্যাজ; আমার এই বাড়ি আর এই গেরামে আমি কি জেবন আর ত্যাজের আবাদ করি নাই? তোরাপ আলি জালের মতো গল্পের যে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করে, তার ভেতর মহির সরকারের উঠোনে সমবেত সুহাসিনীর লোকেরা ক্রমাগতভাবে জড়িয়ে যেতে থাকে, তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে হুঁকোয় একটা লম্বা টান দিয়ে সে বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার বক্তব্য শোনার পরও তার কেমন যানি ভয় হয়েছিল এবং তার এই ভয় দেখে মফিজুদ্দিন মিয়া তাকে বলেছিল যে, হাতের রেখায় সে বিশ্বাস করে না, সে বলেছিল, আমি এক শ এগারো বচ্ছর বাঁচমু, এইট্যা লেখা হয়্যা আছে। তোরাপ আলি বলে যে, তখন সেই দুপুরবেলা গাবগাছের ঘন ছায়ার ভেতর মফিজুদ্দিন মিয়া তার লুঙ্গির গিঁট খসিয়ে নিতম্বের ডান দিকটা উন্মুক্ত করে তাকে দেখায় এবং তোরাপ আলি বলে যে, সে দেখতে পায় বার্ধ্যক্যে কুঁচকে আসা নিতম্বের চামড়ার ওপর যেন কালো কালি দিয়ে লেখা আছে ১১১; সে বলে, আমার তবু কেমন যানি ভয় যায় নাই, কিন্তু তহন বুইজব্যার পারি নাই, এইট্যা কি; এহন

বুইজত্যাছি, ম্যাসাবের হাতের রেখা বায়া আমার মনে হইছিল যানি রক্ত ঝইরা পড়ে; কাইল বিকালে যহন গরুর বাছুর ঘরে আনি, চান্দের নাল টকটকা চেহারা দেইখ্যা মনের ভিতরে আমার জানা আছিল, তবু কেন যানি বুঝি নাই যে, ম্যাসাবের হাতের ভিতর থেইক্যা খইস্যা ভাইস্যা উঠছিল ওই চান, ওই চান চুবান আছিল রক্তের ভিতর। তোরাপ আলির কথা যখন থামে, গ্রামের লোকদের সেই চাঁদটির কথা বিশদ মনে পড়তে থাকে; তারা যদিও জ্যোতিষবিদ্যায় তোরাপের পারঙ্গমতায় আশ্বস্ত হতে পারে না, তবু তাদের কারো কারো, যারা এখন বৃদ্ধ, যারা তাদের শৈশব এবং কৈশোরে মফিজুদ্দিনকে দেখেছে অথবা গল্প শুনেছে তার সম্পর্কে, তাদের মনে এ রকম একটি সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার সম্ভবত চাঁদের সঙ্গে কোনো এক ধরনের সম্পর্ক ছিল।

সুহাসিনীর লোকদের মনে পড়ে যে, মফিজুদ্দিনের মা ছিল বোবা, এতটুকু শব্দও সে করতে সক্ষম ছিল না এবং এই বোবা নারী, খালের পাড়ে একটি পোড়োভিটেয় তাদের জীর্ণ কুঁড়েঘরে, যে দিন রাতে তাকে প্রসব করার প্রক্রিয়ায় খড়ের গাদার ওপর, রক্তের ভেতর নিঃশব্দ যন্ত্রণায় দাপাদাপি করছিল, তখন তার পিতা আকালু ঘরের দরজায় বসে তামাক সেবন করছিল। সুহাসিনীর লোকেরা পরে জানতে পারে যে, আকালুর বোবা স্ত্রী খুব কষ্টের পর একটি ছেলেসন্তানের জন্ম দেয় এবং ছেলেটির জন্মের সেই একটি মুহূর্তে কুঁড়েঘরের দুয়ারে বসে প্রতীক্ষারত আকালু ঘরের ভেতর থেকে নবজাতকের চিৎকার শোনে এবং তখন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে একচিলতে জ্যোৎস্না তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে। আকালু পরে গ্রামের লোকদের বলে যে, শিশুটি চিৎকার করে ওঠামাত্র যেন জমে ওঠা অন্ধকার কেটে গিয়ে চাঁদের এই আলো এসে পড়ে এবং তখন সে বুঝতে পারে যে, সে রাতে পূর্ণিমা ছিল এবং এতক্ষণ এই পূর্ণিমার চাঁদে গ্রহণ লেগেছিল; গ্রহণ কেটে যাওয়ার শুরুর মুহূর্তে শিশুটি জন্মায় অথবা শিশুটির জন্মের মুহূর্তে গ্রহণ কেটে যেতে থাকে। আকালু বলে, ঘরের মইদ্দে ছাওয়ালের চিক্‌খুর হুইন্যা চইমক্যা উইঠছি, দেখি কি, আমার ডাইন পায়ের পাতার উপুর চান্দের আলো আইস্যা পইড়ছে; সে বলে যে, একমুহূর্তে তার অন্তর আনন্দে ভরে যায় এবং তখন সে ঘরে ঢুকে ক্লান্ত স্ত্রীর দুপায়ের মাঝখানে ভেজা খড়ের ওপর শিশুটিকে কুড়িয়ে পায়, যেমন সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, একদা সে তার এই নীরব স্ত্রীটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। কিন্তু সেদিন রাতে ঘরের ভেতর ঢুকে তার স্ত্রীর ক্লান্তিজনিত তন্দ্রার কারণে মানুষের এই শিশুটিকে কুড়িয়ে তুলে আনতে পারে না, সে দেখে যে, নবজাতক শিশু এবং তার মার মধ্যকার সম্বন্ধ সূত্রটি তখনো অটুট রয়ে গেছে। তখন শিশুটির এই অবস্থা দেখে তার এবার হাসি পায়, কারণ তার মনে হয় যে. শিশুটি খুঁটোয় বাঁধা ছাগলের বাচ্চার মতো আটকা পড়ে গেছে; কিন্তু কোনো কিছু না ভেবেই অথবা অজানা একধরনের ভয়ে সে হাত গুটিয়ে নেয়. জরায়ুর ভেতর থেকে নাড়ি টেনে বের করে শিশুটিকে মুক্ত করার চেষ্টা

না করে অপেক্ষা করে। তারপর জরায়ুর ভেতর থেকে ফুল বেরিয়ে এলে শিশুটি যখন বিচ্ছিন্ন হয়, সে শিশুটিকে অন্ধকারে খড়ের ওপর নগ্ন জননীর বুকের কাছে রেখে বের হয়ে যায় এবং আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে দেখে যে, চাঁদ ক্রমে রাহুর গ্রাস থেকে বের হয়ে আসে, এবং গাছের পাতায় এবং প্রান্তর জুড়ে জ্যোৎস্না ঝরে পড়তে থাকে এবং আকালুর মনে হয় যেন, রাতের নিস্তব্ধ চরাচরে এই জ্যোৎস্না পতনের ঝমঝম শব্দ সে শুনতে পায়। সে তার কুঁড়েঘরের দরজার কাছে দাওয়ায় বসে তুষের আগুনে কলকিতে তামাক সেজে ধূমপান করে, তারপর পূর্ণিমার চাঁদটি যখন পরিপূর্ণরূপে অনাবৃত হয়ে ঠিক মাথার ওপর ফুটে ওঠে তখন পুনরায় তার কুঁড়েঘরের ভেতর যায় এবং সে স্তন চোষার চুকচুক শব্দ শোনে। এরপর সুহাসিনীর ভূমিহীন কৃষক এবং একটি পোড়োভিটায় বোবা স্ত্রীকে নিয়ে একা একা বসবাসকারী আকালু ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সে ভিটার পিছন দিকের বাঁশের ঝোপ থেকে বাঁশের চটা কেটে আনে এবং শিশুটিকে মায়ের কোলের ভেতর থেকে তুলে বাইরে চাঁদের আলোয় নিয়ে আসে। তারপর সে বাঁশের চটা দিয়ে শিশুটির নাড়ি কেটে সুতো দিয়ে বেঁধে দেয় এবং গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ভিটার ওপর অঝোরধারায় নেমে আসা জ্যোৎস্নার আলোয় কলসিতে রাখা পানি দিয়ে তাকে গোসল করায়।

পরে, ভাদ্র মাসের এক পূর্ণিমা রাতে সুহাসিনীতে যে ঘটনা ঘটে যায় তার পরদিন সকালে মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে তামাক সেবনরত গ্রামবাসী মফিজুদ্দিন মিয়ার জন্মের ঘটনা নিয়ে কথা বলার সময় যখন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার কথায় ফিরে আসে, তাদের পুনরায় কেমন দিশেহারা ভাব হয়। তোরাপ আলি পুনরায় চাঁদের পূর্বের বর্ণনায় ফিরে যায়, সে বলে যে, তার কেমন যেন শারীরিক অনুভূতি হয়েছিল, যখন সে মিয়াবাড়ির মাথাভাঙা আমগাছের ঠিক ওপরে মফিজুদ্দিন মিয়ার করতলের ভেতর থেকে ফসকে বেরিয়ে যাওয়া চাঁদটিকে দেখতে পায়; সে বলে, তহুনো আন্ধার হয় নাই, চাইর দিকে ভালোই দেখা যায়, এই সময় দেহি আসমানে এক বিদঘুইট্যা চান, আর নিচে, ম্যাবাড়ির সামনের পালানে ফজলের মা লাল শাক তোলে। গ্রামবাসীদের স্মৃতি তখন চমকিত হয়, ফজলের মার নাম তাদেরকে চমকিত করে তোলে, তাদের মনে পড়ে, মিয়াবাড়িতে লাশের সারির ভেতর তারা ফজলের মাকে দেখে নাই। তখন তাদের আবার এরকম মনে হতে থাকে যে, তারা হয়তোবা ফজলের মার মৃতদেহও দেখেছিল; এবং এই বিভ্রান্তির ভেতর তাদের মনে হয় যে, তাদের স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেছে; মিয়াবাড়িতে সেদিন সকালে কতগুলো লাশ দেখেছিল তার সংখ্যা তারা নির্ণয় করতে পারে না, কজন মারা গেছে? দশ জন, বিশ জন, পঁয়ত্রিশ জন? তাদের মনে পড়ে, সেদিন সকালে মিয়াবাড়ির বাইরের উঠোনে সার দিয়ে সাজিয়ে রাখা লাশগুলো তারা গুনে দেখেছিল, কিংবা, তারা কি তা দেখেনি? মহির সরকারের বাড়ির প্রাঙ্গণে কাঠের

বেঞ্চ এবং বিচালির ওপর বসে হুঁকো টানতে টানতে তারা বিভ্রান্তবোধ করে, তারা কিছু বুঝতে পারে না এবং তাদের মনে হয় যে, তারা কেমন ক্লান্ত হয়ে আছে। এই সময় তাদের প্রথম চাঁদটির কথা মনে পড়ে এবং তারপর মনে পড়ে আগের দিন মধ্যরাতের পর মিয়াবাড়ির ভিটার দিক থেকে আসা বিস্ফোরণের শব্দ এবং মানুষের চিৎকারে তাদের ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা। তারা বলে যে, বিস্ফোরণের শব্দে জেগে ওঠায় তাদের শরীরে কাঁপুনি দেখা দেয়, একাত্তর সনের মুক্তিযুদ্ধের পর তারা গ্রামে এমন শব্দ এবং বন্দুকের গুলির ফট ফট আওয়াজ আর শোনে নাই, কতক্ষণ ধরে তারা মানুষের চিৎকার শুনতে পেয়েছিল, তা তারা বলতে পারে না, তারা শুধু বলে, অনেকক্ষণ ধইর‍্যা; তারপর মিয়াবাড়ির ভিটার গাছপালার ঘেরের ভেতর থেকে তারা আগুনের শিখা জ্বলে উঠতে দেখে। মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে বসে, এই ব্যাপারটি সম্পর্কে গ্রামের লোকেরা নিশ্চিত হয় যে, গুলি এবং বিস্ফোরণের শব্দ, মানুষের চিৎকার এবং আগুনের শিখার ভেতর মিয়াবাড়ির ভিটার দিকে তাকিয়ে আগের দিন রাতে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মিয়াবাড়ির লোকেরা শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারে নাই, তারা কি করবে; তাদের মনে হয় যে, তখন তাদের কেমন অবসাদ লেগেছিল এবং বন্দুকের গুলি খাওয়ার ভয়ও হয়েছিল তাদের। তবে মিয়াবাড়ির দিক থেকে যখন আর কোনো শব্দ বা চিৎকার শোনা যায় না তখন গ্রামের লোকদের পুনরায় মনে হতে থাকে, তারা এই অবস্থায় কি করবে এবং এভাবে তারা যখন সেই ব্যাখ্যাতীত অবসাদ ত্যাগ করে বাড়ির বার হয়ে মিয়াবাড়ির দিকে রওনা হয় তখন সকালের প্রথম অস্পষ্ট আলো দেখা যায় এবং তারা যখন এই ফিকে অন্ধকারের ভেতর মিয়াবাড়ির ভিটায় উঠে আসে, তারা ধ্বংসযজ্ঞের সেই দৃশ্য দেখতে পায় এবং তাদের কেয়ামতের কথা মনে হয়; বিধ্বস্ত এবং প্রজ্বলিত বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেকেই বুঝতে পারে না যে, তাদের সব অবসাদের ভেতরও তারা কাঁদে। কতক্ষণ তারা হতবিহ্বল হয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে ছিল তা তারা বলতে পারে না, তবে একসময় তারা তৎপর হয়, তারা গ্রামের ভেতর থেকে দ্রুত বালতি সংগ্রহ করে এবং পুকুর থেকে পানি এনে আগুন নেভায়; তারপর পুড়ে যাওয়া বসতবাড়ি, ধানের গোলা, খড়ের গাদা, ঝোপঝাড় খুঁজে দেখে, কেবলমাত্র কাচারিঘরে বাইরে থেকে শিকল তুলে আটকে রাখা চারজন কামলা ছাড়া আর একটিও জীবিত মানুষ তারা দেখতে পায় না, তাবা তখন লাশ খুঁজে বার করে এবং বয়ে এনে বাড়ির বাইরের উঠোনে ছাই এবং কাদার ওপর রাখে। এখানে তারা কটি লাশ রেখেছিল তার হিসেব তারা অল্প সময়ের ভেতর ভুলে যায়, মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে বসে তারা যখন আঙুলে গুনে হিসেব করার চেষ্টা করে, সমগ্র হিসেব তারা দাঁড় করাতে পারে না; তাদের শুধু মনে হয়, অনেক লাশ ছিল, সকলের লাশ ছিল সেখানে। তাদের মনে পড়ে মফিজুদ্দিন মিয়ার গলার নিচ থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গুলির ক্ষত ছিল, লাশের সারিতে তার আট ছেলের প্রত্যেকে ছিল,

ছিল ছেলেদের স্ত্রী এবং সন্তানেরা; মহির সরকারের উঠোনে বসে থাকা কৃষকেরা লাশের হিসেব করতে গিয়ে বিপর্যস্ত বোধ করে, কতজন ছিল মোট? তারা মনে করতে পারে না তখন মহির সরকারের উঠোন ছেড়ে তারা বের হয়, লুঙ্গি উঁচু করে ধরে খাল পার হয়ে তারা পুনরায় মিয়াবাড়ির ভিটায় এসে ওঠে, কিন্তু তাদের আর লাশ দেখার সুযোগ হয় না, এবার তারা বাড়ি ভরতি পুলিশ দেখতে পায়; পুলিশেরা মিয়াবাড়ির ভিটার চারদিকে পাহারা বসায়, বেশি মানুষজনকে কাছে ভিড়তে দেয় না। এই সময় গ্রামের মুদি দোকানদার তোরাপ আলি একজন পুলিশের সামনে গিয়ে সালাম দিয়ে দাঁড়ায় এবং চেহারায় একধরনের সতর্ক নির্লিপ্ততা ধরে রেখে, কতজন মরেছে তার সংখ্যা জানতে চায় এবং এভাবে সে জড়িয়ে পড়ে; কারণ, পুলিশটি লাশের সংখ্যা বলতে না পারলেও তোরাপ আলিকে ছেড়ে দেয় না, সে কোনো কিছু জানে কি না জানতে চায়। পুলিশটির কথা শুনে তোরাপ আলির প্রথমেই খুব স্বাভাবিকভাবে মনে হয়, সে কিছুই জানে না, সে বলে, না, কি জানমু? কিন্তু তখন, কিছুক্ষণ আগে মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে যে চাঁদটির কথা সে বলেছিল, তার সেই অসাধারণ চাঁদটির কথা পুনরায় মনে পড়ে এবং সে আগের দিন সন্ধেয় জেগে ওঠা অস্বাভাবিক ধরনের এই চাঁদের কথা পুলিশটিকে বলে, এ রহম চান আমি জিন্দেগিতে দেহি নাই, মনে হইছিল যানি রক্তের ভিতর চুবান খায়া উইঠছিল চানটা, এবং তার এই কথা শুনে পুলিশ তাকে আটকায়। তোরাপ আলির আটক হওয়ার খবর শোনার পর সুহাসিনীর লোকেরা ভয় পেয়ে যায়, তারা দিনের বেলাটা কোনোরকমে পার করার পর রাতের অন্ধকার নামামাত্র বৌ-ছেলেমেয়ের হাত ধরে বিছানা-বালিশের পুঁটলি মাথায় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে পাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে ওঠে। ভয় পেয়ে গ্রামের কৃষকদের ব্যাপক হারে ভিটে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় পুলিশের বেকায়দা হয়, তারা একদিন পরেই তোরাপ আলিকে ছেড়ে দেয় এবং বেশি তৎপরতা না দেখিয়ে দু-একদিন চুপ করে থেকে মাইক দিয়ে আশপাশের গ্রামে অভয় বাণী প্রচার করলে সুহাসিনীর লোকেরা পুনরায় তাদের পরিত্যক্ত ভিটায় ফিরে আসতে থাকে। তখন পুলিশ নীরবে আবার তৎপর হয়ে ওঠে, তারা সুহাসিনীতে একটি অস্থায়ী ফাঁড়ি বসায় এবং একজন একজন করে লোক ধরতে থাকে।

পুলিশের ভয়ে ভিটা ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসার পর, এই সময় গ্রামের লোকেরা একটি পুরনো প্রসঙ্গ পরিবর্তিত আকারে নূতন করে শোনে এবং তারা বুঝতে পারে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার উপজেলা চেয়ারম্যান হওয়া হলো না। সুহাসিনীর লোকেরা এই কথাটি জেনেছিল যে, রায়গঞ্জকে এখন আর থানা নয়, উপজেলা বলা হবে এবং এই উপজেলার একজন চেয়ারম্যান থাকবে, রায়গঞ্জের মানুষের ভোটে সে নির্বাচিত হবে এবং তাদের মনে পড়ে যে, উপজেলায় একজন চেয়ারম্যান থাকবে এ কথা শুনে মফিজুদ্দিন মিয়া বলেছিল যে, সে-ই চেয়ারম্যান হবে। সুহাসিনীর লোকদের সে বলে, চেয়ারম্যান আমি-ই হমু, বরমোগাছা ইউনিয়নে আমি আজীবন চেয়ারম্যান

আছি, তোমরা আমাক সব সময় চেয়ারম্যান বানাইছ, আমি উপজেলার চেয়ারম্যানও হমু, আর তা তোমাগোরে ভালর নেইগাই। তারপর সে সুহাসিনীতে দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদিত তার কাজের কথা গ্রামের লোকদের স্মরণ করিয়ে দেয় এবং বলে, এইখানে যহন কেউ পারে নাই তহন এই জেলা বোর্ডের রাস্তার উপুর এই গেরামের মাইনষের সুবিধার নেইগা কি আমি নয়নতারার হাট বসাই নাই? আমি কি তোমাগোরে নেইগা অনেক কিছু করি নাই? দশগেরামের মানুষ যহন খরায় কষ্ট পাইত্যাছিল, মাঠে ফসল আর ঘরে সুখ আছিল না, তহন এই যে গেরামের ভিতর জালের নাহাল পানি ভরা খাল, এইগুলান কি আমি খোঁড়ার ব্যবস্থা করি নাই? আমি কি তোমাগোরে দুঃখ-দুর্দশায় সক্কলের আগে খাড়া হই নাই, আর, আমি কি এই রায়গঞ্জে, এই বরমোগাছা আর তোমাগোরের সুহাসিনীর নেইগ্যা অত্যাচার সইহ্য করি নাই? গ্রামের ভিতরে কুত্তা মারার মাঠের উপুর দিয়্যা যুদি তাকাও, যুদি ম্যাটি শুঁইক্যা দেখ তাইলে আমার শরীলের ঘামের গন্ধ কি পাওয়া যায় না?

সুহাসিনীর লোকদের তখন কুকুর মারার মাঠের কথা মনে পড়ে এবং গ্রামের যারা প্রবীণ, তারা দেখতে পায় যে, তাদের জীবনের সমুদয় গল্পের সঙ্গে ঘাস এবং লতার মতো জড়িয়ে আছে মফিজুদ্দিন মিয়ার অস্তিত্ব। তারা বলে যে, বহুদিন আগে মফিজুদ্দিন যখন মফিজুদ্দিন মিয়া হয়ে ওঠে নাই, মফিজুদ্দি ছিল— তখন তাদের শৈশবের কাল ছিল আর মফিজুদ্দিনের ছিল কৈশোর— তখন চৌদ্দ কিংবা পনেরো বছর বয়স ছিল তার। তখন একদিন গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে আকালুর ছেলে মফিজুদ্দিন পাগল হয়ে গেছে এবং লাঠি হাতে গ্রামের ভেতর সে একটি কুকুরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সেদিন সারা দিন সে ঘরে ফেরে না, তার বোবা মা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং তার পিতা আকালু যখন তাকে খুঁজে বের করে ঘরে নিয়ে যেতে চায়, সে ফিরে যেতে অস্বীকার করে; সে বলে যে, কাজিদের কুকুর তাকে কামড় দেয়ার জন্য তাড়া করেছিল, সেই খ্যাপা কুকুর দেখে সে ছুটে পালাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কুকুরটা তার পিছু ছাড়ে নাই। কুকুরটি তাকে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে রৌহার বিল পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং এখানে এই বিলের পাশে মফিজুদ্দিন একটি পুঁতে রাখা বাঁশের লাঠি পায়, সে লাঠিটা টেনে তুলে নেয় এবং তারপর মফিজুদ্দিন এবং কুকুরটি উল্টো ছোটা শুরু হয়। গ্রামের লোকেরা এ বিষয়ে একমত হয়েছিল যে, কাজিদের এই কুকুরটি পাগল হয়ে গেছে, তাদের অনেককে এর আগে প্রাণীটি তাড়া করেছিল; এবং সেদিন উল্টো দৌড় শুরু হওয়ার পর তারা দেখতে পায় যে, সুহাসিনীর মাঠ এবং ভিটাবাড়ির ওপর দিয়ে মফিজুদ্দিন লাঠি হাতে প্রাণীটিকে তাড়া করে ফেরে। সারা দিনের এই দৌড়ের পর মফিজুদ্দিন অথবা কাজিদের কুকুর কোনটি বা কে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে তা গ্রামের লোকেরা জানতে পারে না, তবে সেদিন রাতে তারা এই ঘটনার শেষাংটা জানতে পারে; তারা শোনে যে, সারা দিন ছুটে বেড়ানোর পরও মফিজুদ্দিন যখন পিছু ছাড়ে না, কুকুরটি তখন পুনরায় রৌহার

বিলের দিকে ছুটে গিয়ে বিলের পাড়ে নল খাগড়ার জঙ্গলের ভেতর লুকায় এবং মফিজুদ্দিন সেই জঙ্গলের মুখের কাছে লাঠি হাতে বসে থাকে। সেদিন আকালু যখন অন্ধকারের ভেতর রৌহার পাড়ের কাছে তার ছেলেকে খুঁজে বের করে, তখন মফিজুদ্দিন ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় বুকের ভেতর বাঁশের লাঠি জড়িয়ে ধরে নিদ্রামগ্ন ছিল। সেদিন রাতে গ্রামের লোকেরা যখন এই কথা শোনে, তারা হাসে এবং পরদিন আকালুর সঙ্গে নিড়ানির কাজ করার জন্য সে যখন মাঠে আসে তখন মাঠের কৃষকেরা তাকে বলে, ক্যাবা মফিজদ্দি, কাইল হারাদিন কয়ডো কুত্তা মাইরল্যা? মফিজুদ্দিন গ্রামের লোকদের এই পরিহাসের উত্তর দেয় না, কিন্তু সেদিন বিকেলে কুকুর হত্যার ঘটনাটি ঘটে; গ্রামের কয়েকটি বাড়ির কিছু যুবক এবং কিশোর কাজিদের সেই কুকুরটিকে তাড়া করে নিয়ে আসে এবং এই দলের ভেতর সকলের আগে মফিজুদ্দিনকে দেখা যায়। গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে যে, কাজিদের এই কুকুরের পিছনে মফিজুদ্দিনের লাঠি হাতে ছোটা, আগের দিন শেষ হয়ে যায় নাই; পরদিন তা আবার শুরু হয় এবং এদিন সে একটি দল নিয়ে আসে এবং এদিন কুকুরটি ভুল করে খোলা ফসলের মাঠের উপর দিয়ে দৌড় দেয় এবং স্বভাবতই সেখানে লুকানোর জায়গা না থাকায় ছ/সাত জন তরুণ কুকুরটিকে ধাওয়া করে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। খুব শীঘ্রই এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে, কুকুরটি আর পেরে ওঠে না, মাটির উপর পড়ে যায়; তখন সেই তরুণেরা মাটি খুঁড়ে মৃত কুকুরটিকে ফসলের মাঠের ভেতর পুঁতে ফেলে। তারপর থেকে ফসলের এই বিস্তৃত মাঠকে গ্রামের লোকেরা কখনো কুত্তা মারার মাঠ বলে উল্লেখ করতে থাকে এবং গ্রামের লোকেরা এখন যারা প্রবীণ, তাদের মনে পড়ে, অথবা তারা পরে হয়তো পুনরায় এইসব গল্প শুনেছিল যে, কাজিদের মালিকানাধীন পাগলা কুকুরটিকে মেরে ফেলায় কাজিদের ভয়ানক অপমান ও রাগ হয়। তারা এ বিষয়ে রায়গঞ্জ থানায় গিয়ে নালিশ করে এবং ফলে সুহাসিনীতে মফিজুদ্দিন বিখ্যাত হয়ে ওঠে, গ্রামের লোকেরা যখন এই সব গল্প শোনে, তারা বলে, আকালুর ছাওয়ালডোর ত্যাজ আছে বাপু। গ্রামের কাজিবাড়ির লোকেরা থানায় গিয়ে নালিশ করার পর একদিন বিকেলে দুজন সিপাইকে সঙ্গে নিয়ে একজন এএসআই সুহাসিনীতে এসে হাজির হয়। কাজিরা কি ধরনের অভিযোগ করেছিল গ্রামের লোকদের তা নির্দিষ্টভাবে জানা ছিল না, তবে খাকি রঙের শার্ট হাফ প্যান্ট পরা পুলিশের ছোট দারোগাটি যখন হিন্দুস্তানি ভাষায় জিজ্ঞেস করে, তারা মফিজুদ্দিনকে চেনে কি না, তখন গ্রামের লোকেরা নিশ্চিতরূপেই বুঝতে পারে যে, এটা পাগলা কুকুর মেরে ফেলার জের, তারা প্রথমে একটু ইতস্তত করে তারপর বলে যে, হ্যাঁ তারা আকালুর ছেলে মফিজুদ্দিনকে চেনে এবং পুলিশকে আকালুর ভিটা দেখিয়ে দেয়; তারপর পুলিশ যখন জানতে চায় যে, মফিজুদ্দিন কি খুব ডাকাতের মতো লোক, সে কি কোনো দল গড়েছে, সে কি গ্রামের ভেতর তছনছ করে বেড়ায়? তখন সুহাসিনীর লোকেরা বিভ্রান্ত বোধ করে, ভালো করে বিষয়টা বুঝতে পারে না; তারা বলে, আপনেরা কি কন! লোক না তো,

ছ্যামড়া! গ্রামের এইসব লোকের কথা শুনে থানার ছোট দারোগার খুবই সন্দেহ হয়, কারণ তার মনে হয় যে, এই নিরীহ চাষিরা ভয়ানক প্রতারক হয়, এরাই টেররিস্টদের ভাত-কাপড় যোগায়; কিন্তু যখন দল এবং নাশকতার কোনো হদিস করতে পারে না তখন তারা কাজিদের বাড়ি কোনটা জানতে চায় এবং গ্রামবাসী কাজিদের ভিটা চিনিয়ে দিলে সন্ধে হয়ে আসার একটু আগ দিয়ে পুলিশ কাজিবাড়ির ভিটায় গিয়ে ওঠে। পুলিশ যখন ভয়ানক গালাগাল করতে থাকে মিথ্যে নালিশ করে তাদেরকে হয়রানি করার জন্য, তখন আলতাফ কাজি বলে যে, আকালুর ছেলে মফিজুদ্দিন একটা গুণ্ডা, সে তার পোষা কুকুরটিকে একদিন ধরে তাড়া করে বেড়ায়, তার পরদিন দল বেঁধে সেটাকে পিটিয়ে মারে; সে বলে, ওই ধানের ক্ষ্যাতের ভিতর তাড়ায়া নিয়া যায়া আমার কুত্তাটাক মাইর‍্যা ফালায়া। পুলিশ ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং দ্রুত থানায় ফিরে যায় এবং পুলিশ ফিরে গেলে গ্রামের ছেলেরা আকালুর বাড়ির দিকে ছোটে, তারা আকালুর ঘর এবং উঠোন খালি পড়ে থাকতে দেখে এবং তখন তারা দেখে যে, বাড়ির পিছনে ডোবার ধারে বাঁশঝাড়ের ভেতর মফিজুদ্দিনকে জড়িয়ে ধরে আকালু এবং তার বোবা স্ত্রী বসে আছে।

মফিজুদ্দিন মিয়ার বোবা মায়ের কথা গ্রামের বয়স্ক লোকদের স্মরণ হলে তাদের একধরনের ভালোলাগার অনুভূতি হয়; তারা যদিও কখনোই এই উপমাটি দাঁড় করাতে পারে নাই, তবু আকালুর বোবা স্ত্রীর কথা তারা যখন শোনে, তাদের সেই অনুভূতি হয়, যে রকম অনুভূতি তাদের হয় একটি শ্যামলা রঙের গাভীর শান্ত নির্বাক মুখ এবং ভিজা চোখের দিকে তাকালে। গ্রামের এই সব প্রবীণ লোক আকালুর স্ত্রীর গল্প তাদের শৈশবে তাদের মায়েদের কাছ থেকে শুনেছিল এবং পরে তা তাদের কাছ থেকে তাদের সন্তানেরা জানতে পারে; সুহাসিনীর প্রবীণ লোকেরা বলে যে, তারা অনেক কিছু শুনেছিল, আবার অনেক কিছু তারা শোনে নাই, অথবা অনেক কিছু হয়তো তারা শুনলেও ভুলে গিয়েছিল। তারা বলে যে, এই স্ত্রী লোকটিকে আকালু কোথায় পায় তা নির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারে না, তবে বহুদিন পূর্বে আকালুর জীর্ণ খড়ের কুটিরে যখন গ্রামের লোকেরা প্রথম একে দেখে সে মোটেও স্ত্রীলোক ছিল না, ছিল একেবারে শিশু, বয়স ছিল তিন কিংবা চার। সে সময় ক্ষেতমজুর আকালু গ্রামের মিয়াদের একটি পতিত ভিটায় তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে বাস করত এবং তখন তার বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর; তখন একদিন গ্রামের লোকদের সে বলে যে গ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আলি আসগর মিয়ার ধানক্ষেতের ভেতর, যার পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের রাস্তা চান্দাইকোনা থেকে এসে সিরাজগঞ্জের দিকে চলে গেছে, সে একটি বাচ্চা মেয়ে কুড়িয়ে পায়। আকালুর এই কথা গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু ঘটনার সত্যতা যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাদের এক ধরনের ঘৃণা হয়; কারণ তাদের মনে হয় যে, কোনো অবৈধ গর্ভের সন্তান হয়তো ফেলে দেয়া হয়েছিল এবং আকালু তা ধানক্ষেতের ভেতর থেকে কুড়িয়ে বাড়িতে

নিয়ে আসে, তারা মাটির ওপর থুতু ফেলে হাত দিয়ে নাক চেপে ধরে এবং বলে, নাউযুবিল্লাহ; এবং তারপর এই শিশু মেয়েটিকে দেখার জন্য আকালুর বাড়ির অপরিচ্ছন্ন উঠোন গ্রামের মানুষে ভরে ওঠে। আকালুর মায়ের কোলের ভেতর বসে থাকা, পরিষ্কার কাপড় পরা ফর্সা মেয়েটিকে দেখে তারা বিস্মিত হয়ে পড়ে এবং একটি বিষয়ে তারা নিশ্চিত হয় যে, এই মেয়েটিকে গ্রামের ভেতর কেউ গোপন পাপের লজ্জায় ফেলে দিতে পারে না। তখন তারা এ বিষয়ে আকালুর বলা গল্প শোনে, সে বলে যে, সেদিন দুপুরে রোদের ভেতর আলি আসগর মিয়ার এই ক্ষেতটিকে সে ধান কাটার কাজ করছিল, উবু হয়ে দ্রুত কাঁচি চালানোর সময় সে হঠাৎ দেখে যে, একটু দূরে ধান গাছের ভেতর কি যেন নড়াচড়া করে। সে বলে যে, পাকা ধান গাছের ভেতর মৃদু আন্দোলন এবং শব্দে তার প্রথমে খুব ভয় হয়, আমার ক্যামন যানি তরাইসা নাগে, সে বলে। তারপর সে বলে যে, তার মনে হয় আধশোয়া হয়ে থাকা ধানের ভেতর হয়তো একটা খরগোশ লুকিয়ে আছে এবং তখন সে দৌড়ে বাড়ি গিয়ে মাছ মারার কোঁচটা নিয়ে আসার কথা ভাবে, কিন্তু একই সঙ্গে সে বুঝতে পারে যে, কোঁচ নিয়ে ফিরে আসতে আসতে খরগোশটি হয়তো সরে পড়বে, তখন সে ধান কাটার কাঁচি দিয়েই জন্তুটিকে ঘায়েল করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে উবু হয়ে থেকেই খুব সন্তর্পণে এগিয়ে যায় এবং দেখতে পায় ধানক্ষেতের ভেতর কোনো খরগোশ লুকিয়ে নেই, পড়ে আছে একটি শিশু; সে বলে, এক্কেবারে কাছে যায়্যা আমি যহন ভাইবত্যাছি যে, এইবার কাঁচির আগাটা দিমু বসায়া, দেহি কি, হায় আমার আল্লাহ, ধান গাছের ফাঁক দিয়া দুইট্যা জ্বলজ্বইল্যা চোখ দেহা যায়, তহন আমার হুঁশ আসে, আমি বুইজব্যার পারি যে, এইট্যা তো কোনো খরগোশ না, এইট্যা একটা কচি ম্যায়ার মুখ, আর শরীলে তো সাদা সাদা লোম না, জামা। আকালু বলে যে, পাকা ধানের ক্ষেতে খরগোশের বদলে এ রকম একটি বাচ্চা মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখে প্রথমে বিচলিত বোধ করে এবং বুঝতে পারে না সে কি করবে, তারপর সে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতের ভেতর মেয়েটিকে তুলে নেয় এবং এক দৌড়ে বাড়িতে এসে তার মায়ের কাছে দেয়। তখন সে এবং তার বুড়ো মা বুঝতে পারে, মেয়েটি কথা বলতে পারে না এবং কানেও শোনে না, এবং তখন সে বলে যে, এই নির্বাক এবং শান্ত শিশু মুখটার দিকে তাকিয়ে তার মনে বড় মায়া হয় এবং সে ঠিক করে যে, এই নির্বাক মেয়েটিকে সে রেখে দেবে। সুহাসিনী গ্রামের লোকদের মফিজুদ্দিন মিয়ার বোবা মায়ের সুহাসিনীতে আগমন-সম্পর্কিত এই বিভ্রান্তির কোনো দিনই আর সুরাহা হয় না। ধানক্ষেতের ভেতর একটি মেয়ে কুড়িয়ে পাওয়ার খবর যখন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তখন এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা খুঁজে দেখা জরুরি হয়ে পড়ে এবং গ্রামের লোকেরা যখন এ নিয়ে মাথা খাটাতে থাকে তখন আকালু বলে যে, মেয়েটি আসলে মাটির ভেতর থেকেই উঠেছে, মাটি ফুঁড়ে প্রথমে তার মাথাটি বের হয়ে আসে, এই সময় সে মেয়েটিকে দেখে এবং তাকে মাটি খুঁড়ে বের করে আনে; সে বলে, ক্যা মাটির ভিতর থেইক্যা গাছ যুদি

উইঠপার পারে, তাইলে মানুষ উইঠলেও উঠপার পারে। কিন্তু আকালুর এই কথা গ্রহণ করা গ্রামের লোকদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়, তারা বলে যে, মাটির ভেতর থেকে এমন সুন্দর জামা কাপড়সহ একটি মেয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। তখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে আকালু কয়েক দিন চুপ করে থেকে ভাবে এবং তারপর একদিন বলে যে, সে মেয়েটাকে ন্যাংটোই পেয়েছিল; সে যখন ধান কাটছিল তখন সে তার নিকটেই ধান গাছের আলোড়নের শব্দ শুনতে পায় এবং দেখে যে, সেখানকার মাটি ফেটে গেছে এবং সেখানে একটি ছোট্ট নগ্ন মেয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আকালুর এই সংশোধিত গল্প শোনার পর গ্রামের লোকেরা যখন বলে যে, সে তাহলে এই মেয়ের জামা-কাপড় কোথায় পেল, তখন সে পুনরায় চুপ করে যায় এবং সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়ার মায়ের আগমনের ঘটনা সম্পর্কে গ্রামের মানুষদের ভেতর তিনটি সম্ভাব্য তত্ত্ব প্রচারিত হয়। কিছু লোক বলে যে, আকালুর ভিটার উঁচু জামগাছের ডালে, যেখানে আকালু বড় বড় দুটো মাটির হাঁড়ি বেঁধে রেখেছে শীতের দিনের পথিক বালিহাঁসের ডিম পেড়ে যাওয়ার জন্য, সেখানে একদিন ডিমের খোঁজে আকালু উঠে দেখে যে হাঁড়ির ভেতর একটি ফুটফুটে মেয়ে বসে আছে। তারা বলে যে, এই কাণ্ডটি হয়তো কোনো দুষ্ট জিন করেছে; এই মেয়েটির দেশ হয়তোবা অনেক দূরে, হয়তোবা পারস্যে, হয়তোবা তুরস্কে, কারণ ওর গায়ের রঙ দেখো, চোখের তারা দেখো, নাক আর চিবুকের ডৌল দেখো! কিন্তু সংশয়বাদী কিছু লোক এই কাহিনী গ্রহণ করতে পারে না, তাদের কাছে ব্যাপারটা উদ্ভট বলে মনে হয়, তারা বলে যে, গাছের ডালের মাটির হাঁড়িতে এত বড় একটি মেয়ে বসে থাকতে পারে না এবং তাদের কেউ কেউ বলে যে, এই মেয়েটি সম্ভবত কোনো সদ্বংশীয় মেয়ে, হয়তোবা জমিদারবাড়ির, হয়তোবা ধনকুন্তির জমিদারবাড়িরই হবে। সিরাজগঞ্জ শহরে ধনকুন্তির জমিদারদের অনেক আত্মীয় আছে, হয়তো এই শিশুটি মায়ের সঙ্গে পালকিতে চড়ে সিরাজগঞ্জ যাচ্ছিল, হয়তোবা পালকির ভেতর তরুণী মা'টির তন্দ্রা লেগেছিল এবং হয়তোবা সেই সময় পালকির দরজার ফাঁক দিয়ে শিশুটি নিচে পড়ে যায়; আর পালকির বেহায়ারা এমনই গুলিখোর হয় যে তারা হনহনিয়ে চলে যায় শিশুটির পতন লক্ষ না করে, এবং পালকিটি এমন দ্রুত এগিয়ে যায় যে, শিশুটি বোবা হওয়ায় সে কোনো শব্দ করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় না। রাস্তার ওপর থেকে শিশুটি নিকটের ধানক্ষেতের ভেতর চলে আসে, এই সময় আকালু তাকে দেখতে পায় এবং বাড়িতে এনে তার বুড়ো মায়ের কোলে তুলে দেয়– এটা না করে সে যদি মেয়েটিকে নিয়ে মাঠেই অপেক্ষা করত, তাহলে সে হয়তো হারানো এই মেয়ের সন্ধানে ফিরে আসা লোকজন দেখতে পেত। কিন্তু সুহাসিনীতে এই গল্পও টেকে না, কারণ, শীঘ্রই একদিন ধনকুন্তিতে লোক পাঠানো হয় এবং তারা ফিরে আসে এই খবর নিয়ে যে, তাদের কোনো বাচ্চা মেয়ে হারানো যায় নাই। তখন অন্য এক দল লোক বলে যে, এই কাণ্ডটা আসলে ডাকাতরা ঘটিয়েছে, সেদিনের আগের রাতে কোথাও ডাকাতি করে

ফেরার সময় তারা এই মেয়েটিকেও অপহরণ করে, কিন্তু পরে এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় ধানক্ষেতের ভেতর ফেলে যায়। কিন্তু রায়গঞ্জ থানার পুলিশরা সুহাসিনী গ্রামের এক ভূমিহীন কৃষকের ক্ষেতের ভেতর বাচ্চা মেয়ে কুড়িয়ে পাওয়ার কথা শুনে চুপ করে থাকে, কারণ মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তাদের কাছে কেউ করে নাই এবং তারা জানায় যে, আশপাশে সম্প্রতি কোনো ডাকাতি এবং ডাকাতির সময় শিশুকন্যা অপহরণের খবর তারা জানে না। তখন অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, গ্রামের লোকদের মনে হয় যেন আকালুর কথাই সত্যি, ধানক্ষেতের মাটির ভেতর থেকেই যেন এই কন্যাটির আবির্ভাব হয়েছিল এবং পরে গ্রামের লোকেরা এই কথাটিও জানতে পারে যে, মাটির মতোই, মৃণ্ময়ী মেয়েটিও বোবা। এই মেয়েটির কি নাম ছিল তা সে নিজে বলতে পারে নাই এবং আকালুও এর নাম রাখার বিষয়টি খেয়াল করে না; পরবর্তী সময়ে গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার বোবা মায়ের কোনো নির্দিষ্ট নামের কথা তারা স্মরণ করতে পারে না, যদিও পরে একবার একদিন ভুল করে তাদের মনে হয়েছিল যে, তার মায়ের নাম বোধ হয়, নয়নতারা।

গ্রামের লোকেরা স্মরণ করতে পারে যে, বহুদিন পূর্বে এক বৃহস্পতিবার বিকেলে, সিরাজগঞ্জ-বগুড়া জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে সদ্য মাটিকাটা এক মাঠের ওপর গ্রামের লোকেরা যখন বাজার বসায় তখন মফিজুদ্দিনের যুবক বয়স; সে হাফ শার্ট আর লুঙ্গি পরে গ্রামের অনেকগুলো যুবকের সঙ্গে হাটের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে এক প্রান্তে দাঁড়ায়, তাদের মাথার ওপর জেলা বোর্ডের রাস্তার কিনারার বড় কড়ই গাছের ছড়ানো শাখা বিস্তৃত ফণার মতো ঝুলে থাকে এবং গাছের এই সবুজ শাখার নিচে দাঁড়িয়ে, হাটের লোকেরা যখন তার চারদিকে ঘিরে আসে, সে তাদেরকে বলে যে, কোনো মাতবর কিংবা জমিদার তার কিছু করতে পারবে না, এবং গ্রামের লোকেরা সেদিন প্রথম মফিজুদ্দিনের জীবনের আয়ু-সম্পর্কিত তথ্যটি শোনে, সে তাদের দিকে হাত প্রসারিত করে দিয়ে বলে যে, সে এক শ এগারো বছর বাঁচবে, এতে কোনো ভুল নাই; তারপর সে এই নূতন লাগানো হাটের নামকরণ করে এবং বলে, আমি এই হাটের নাম দিলাম নয়নতারার হাট। এই নামটি শুনে গ্রামের লোকদের একধরনের বিস্ময় হয় এবং তাদের মফিজুদ্দিনের বোবা মৃত মায়ের কথা মনে পড়ে, তাদের মনে হয় যে, এই নামটি বোধ হয় তার সেই মায়ের, যার কোনো নাম এতকাল তারা শোনে নাই; কারণ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা স্মরণ করতে পারে যে, এ দেশে মানুষ তাদের জননীদের নামে তাদের সুকৃতির স্মারকচিহ্নগুলোর নামকরণ করে; তাই তখন সেই কড়ই গাছ তলায় তাকে ঘিরে থাকা মানুষেরা বলে ওঠে, এইটা ক্যাডা বাপু, এইটা কার নাম? তোমার মায়ের? এবং তখন গ্রামের লোকেরা জানতে পারে, নয়নতারা তার মায়ের নাম নয়, মফিজুদ্দিন তাকে ঘিরে থাকা লোকদের দিকে তাকিয়ে বলে যে, এটা তার মায়ের নাম

নয়, নয়নতারা একটি বাজারের মেয়েমানুষের নাম। মফিজুদ্দিনের বলা বাক্যাবলি গ্রামের লোকেরা পরবর্তী সময়ে বহুদিন স্মরণ করতে পারে, সে বলে, নয়নতারা আমার মায়ের নাম না, নয়নতারা একটা ম্যায়া মানুষের নাম, নয়নতারা কি রহম ম্যায়া মানুষ আছিল আমি কইবার পারমু না, সে আছিল বাজাইর‍্যা ম্যায়া মানুষ, কিন্তু সে আছিল মায়ের নাহাল, বুইনের নাহাল, আরো অনেক কিছুর নাহাল; ম্যায়া মানুষ যা-ই হইক, ম্যায়া মানুষেক মাথায় কইরা রাইখপেন বাপু, ম্যায়া মানুষগোরে ছাড়া আমাগোরের বাঁচা নাই। সুহাসিনীতে নূতন লাগানো হাটের নাম যখন মফিজুদ্দিন নয়নতারার হাট রাখে এবং গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে যে, এটা তার মায়ের নাম নয়, তখন নয়নতারা সম্পর্কে তাদের ঔৎসুক্য হয়, কিন্তু মফিজুদ্দিনের মায়ের নাম তাদের আর জানা হয় না এবং তারা বুঝতে পারে যে, ধানক্ষেতের ভেতর কুড়িয়ে পাওয়া এই মেয়েটির নামকরণের বিষয়ে আকালু হয়তো সচেতন ছিল না, হয়তো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই, মানুষ যেমন নীরব গাছদের নামকরণ করে না। তবে গল্পের সময় কথা বলার সুবিধের জন্য গ্রামের লোকেরা সে সময় তাকে আকালুর মেয়ে বলত; আসলে শুধু এভাবে ডাকাই নয়, তাদের একসময় এ রকম মনে হয়েছিল যে, আকালু বস্তুত পিতার মমতা এবং যত্নে মেয়েটিকে লালন করেছিল, তার বুড়ো মা মরে যাওয়ার পর বালিকাটির দেখাশোনা করার পুরো ভার পড়েছিল তার একার ওপর। গ্রামের লোকেরা, পরে যখন ঘটনাটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়, এই উপমা দিয়েছিল যে, আকালু যেন নিজের হাতে কুমারী মাটিকে প্রস্তুত করেছিল প্রথম বর্ষায় নিজেই বীজ বপন করার জন্য। কারণ গ্রামের লোকেরা একসময় দেখে যে, আকালুর কুড়িয়ে পাওয়া বোবা মেয়েটির শরীরে গর্ভাবস্থার চিহ্ন ফুটে উঠতে থাকে এবং এ কথা যখন গ্রামে প্রচারিত হয় তখন গ্রামের লোকেরা আতঙ্কিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুঝতে পারে না এ রকম কি করে হয় এবং তারা বলে যে, এ পাপ, এ অন্যায়, এ ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ। তখন একদিন শুক্রবারে জুম্মা নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গেলে মুসল্লিরা আকালুকে ঘিরে ধরে এবং আকালু তাদের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত ঢোক গিলে, দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলে যে, বোবা মেয়েটিকে সে পাঙ্গাসি হাটের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। সে বলে যে, মেয়েটি তার চাইতে অনেক ছোট হলেও এ কাজ না করে তার উপায় ছিল না, কারণ এই বোবা এবং কালা মেয়েকে সে কোথায় এবং কার কাছে বিয়ে দিত, কোথায় খুঁজে পেত সেই ছেলে, কে নিত এই মেয়েকে, যে একটি ছায়ার মতো নীরব এবং মুখাপেক্ষী; হয়তো কেউ তাকে নিত না, হয়তো নিলেও পুনরায় তাকে ফেলে যেত, যেমন একদিন হয়তো তাকে ফেলে গিয়েছিল কেউ। গ্রামের মানুষের আর কিছু বলার থাকে না এবং পরবর্তী সময়ে একদিন তারা আকালুর বোবা স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান প্রসবের খবর শোনে।

আকালুর বোবা স্ত্রী যেদিন সন্তান প্রসব করে, চাঁদের সেই পূর্ণিমা এবং গ্রহণের রাতে আকালু মাটিতে খড়ের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে নগ্ন বোবা মায়ের স্তনের সঙ্গে লেগে থাকা ন্যাংটো সদ্যজাত ছেলেটির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিচু মৃদু স্বরে আজান দেয়, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর...। সে ঘরের মেঝের খড় পরিবর্তন করে বালিকা প্রসূতি এবং নবজাতক শিশুর শরীর শাড়ি এবং লুঙ্গি দিয়ে আবৃত করে, তারার এবং মাটির মালসায় তুষ ও কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে ঘরের দরজায় রেখে সে কিসের সন্ধানে তার বাড়ির ভিটা ছেড়ে পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্নার ভেতর বের হয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, সে রাতে একটি গুল্মজাতীয় গাছের সন্ধানে আকালু গ্রামের ভেতর প্রতিটি মাঠ এবং বাড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যায় এবং গ্রামের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত খুঁজে চন্দ্রালোকিত সে-রাতে দণ্ডকলসের চারটি গাছ পায়; কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলে যে, চন্দ্রালোকের ব্যাখ্যাতীত ছলনার হাত থেকে আকালুও রেহাই পায় না, যে চারটি গাছ সে দণ্ডকলস মনে করে তুলে আনে তার ভেতর একটি অন্তত দণ্ডকলস ছিল না। আকালু যে চারটি গাছ খুঁজে পায় তাতে ছোট নাকফুলের আকারের এগারোটি ফুল ছিল এবং এই ফুলের ভেতর কয়েকটির রঙ সাদা হলেও অন্য কয়েকটির রঙ নিশ্চিতরূপেই ছিল হালকা বেগুনি; কিন্তু চাঁদের আলোয় আকালু তা বুঝতে পারে নাই, সে মনে করেছিল যে সবগুলোই ছোট্ট কলকির মতো দেখতে দণ্ডকলসের চমৎকার সাদা রঙের ফুল। গ্রামের লোকেরা বলে যে, আকালু দুটো গাছ পায় রৌহার বিলের ধারে, একটি পায় গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বে একটি পোড়ো ভিটার ওপর এবং চতুর্থ গাছটি সে পায় গ্রামের মাঝখানে, যে মাঠের নাম পরে কুকুর মারার মাঠ হয়, সেই ফসলের মাঠের আলোর ওপর। চারটি গাছ শেকড়সহ টেনে উপড়ে তুলে নিয়ে আকালু শেষরাতের দিকে নিজের ভিটায় ফিরে দেখে যে, তার স্ত্রী এবং ছেলে অন্ধকার ঘরে খড়ের ভেতর ঘুমে ডুবে আছে। আকালু তখন ঘরের দরজায় রাখা মালসার স্তিমিত হয়ে আসা আগুন একটি কাঠি দিয়ে উসকে দিয়ে এই আগুনের তাপে তার হাত-পা সেকে নিয়ে ঘরে ঢোকে, তার সঙ্গে তখন ছিল দণ্ডকলসের চারটি বুনোগাছ। কুঁড়েঘরের ভেতরের অন্ধকারে সে দণ্ডকলসের গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে কলকির মতো ফুলের গোড়া টিপে তার নবজাত ছেলের মুখে মধুর স্বাদ তুলে দেয় এবং পরদিন সকালে তার প্রতিবেশী যারা তার বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, তারা আকালুকে তার কুঁড়েঘরের দরজার সামনে মুক্ত আকাশের তলে খড়ের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে নিদ্রামগ্ন দেখে। এদের কেউ একজন যখন তাকে ডেকে ওঠায়, সে আড়মোড়া ভেঙে রাত জাগা চোখে তার দিকে তাকায় এবং একগাল হেসে বলে, ম্যাবাই কাইল আইতে আমার একখান ছাওয়াল অইছে। আকালু তখন তার সেই প্রতিবেশীটিকে পেতে রাখা খড়ের ওপর বসায় এবং সন্তানের জন্মকাহিনী বর্ণনা করে, সে বলে যে, সে তার ছেলের কানে আজানের ধ্বনি এবং মুখে মধু দিয়ে তার নাম রেখেছে, মফিজদ্দি, এবং আকালু যখন বলে যে, সে দণ্ডকলসের ফুলের নলের মতো

গোড়া টিপে এই মধু বার করে, তখন সেই প্রতিবেশীটি আকালু যেখানে শুয়ে ছিল তার খুব নিকটে দণ্ডকলসের গুল্মজাতীয় গাছগুলো পড়ে থাকতে দেখে এবং সে শনাক্ত করতে পারে যে, শেকড় উপড়ে তুলে আনা এই গাছগুলোর সব ক'টি দণ্ডকলস নয়, এর একটি ভাং গাছ, কারণ সে দেখতে পায় যে, এই গাছটায় একটি ছোট্ট ফুল রয়ে গেছে এবং এই ফুলটির রঙ বেগুনি, দণ্ডকলসের ফুলের মতো সাদা নয়। তখন সুহাসিনী গ্রামের লোকেরা এইসব কথা জানতে পারে, তারা জানতে পারে যে, ভূমিহীন কৃষক অথবা ক্ষেতমজুর আকালুর গাছের মতো নীরব বোবা স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে এবং এই ছেলের পিতা, পুত্রের মুখে একই সঙ্গে মধু এবং ভাংয়ের নির্যাস তুলে দিয়ে তার নাম রাখে মফিজদ্দি; এবং গ্রামের এইসব মানুষ পরবর্তী সময়ে দেখতে পায় আকালুর ছেলে মফিজদ্দি কেমন করে মফিজুদ্দিন হয়ে ওঠে। বহু বছর পর, ভাদ্র মাসের ভয়াবহ পূর্ণিমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরদিন মহির সরকারের উঠোনে বসে যখন তোরাপ আলি চাঁদের বর্ণনা দেয়, সে বলে, ম্যাসাব তার উরাতের উপুর তার হাতের তালুখান চিৎ কইর‍্যা রাইখছে, সেই দিকে তাকায়া আমি দেখি যে, তার হাতের জমিনে সবকিছু ছাড়ায়া উইঠছে চান্দের পাহাড়; তখন মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে বসে থাকা গ্রামের প্রবীণ লোকদের মনে হয় যে, ক্ষেতমজুর আকালুর ছেলের, মফিজদ্দি থেকে মফিজুদ্দিন মিয়া হয়ে ওঠা সম্ভবত একেবারে অবধারিত হয়ে যায় যখন, কোনো কিছু না বুঝেই মিয়াবাড়ির আলি আসগর মিয়া তার কন্যা এবং একমাত্র সন্তানের নাম রাখে চন্দ্রভান আকতার। মহির সরকারের উঠোনে তোরাপ আলির কথা শুনে তাদের মনে হয় যেন তারাও তোরাপ আলির মতো একটি পাহাড় দেখতে পায়, সেই পাহাড় যেন একটি জীবন, মফিজুদ্দিনের জীবন; এবং সেই পাহাড়ের ওপর একটি চাঁদ হেসে ওঠে, সেই চাঁদ ছিল চন্দ্রভান।

মফিজুদ্দিনের বয়স যখন সতেরো এবং চন্দ্রভানের চৌদ্দ তখন এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় অথবা মফিজুদ্দিন সৃষ্টি করে কিংবা তোরাপ আলির বর্ণনানুযায়ী চাঁদের প্রভাবের কারণে তৈরি হয় যে, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক আকালুর ছেলে মফিজুদ্দিনের সঙ্গে আলি আসগর মিয়া একমাত্র আদরের মেয়ে চন্দ্রভানের বিয়ে দেয় এবং মফিজুদ্দিনের সচেতন কোনো প্রয়াস না থাকলেও সুহাসিনীর লোকেরা তাকে মফিজুদ্দিন মিয়া বলে ডাকতে থাকে। পরবর্তী সময়ে নয়নতারার হাট যখন ক্রমে ক্রমে জমে ওঠে এবং তারও পরে মফিজুদ্দিন যখন খরাপীড়িত গ্রামের মানুষদের ডাক দিয়ে মাঠে নামিয়ে আনে এবং সুহাসিনীর ভেতর দিয়ে একটি হাতের বিস্তৃত আঙুলের মতো খাল কাটা হয় এবং মফিজুদ্দিন যখন গ্রামের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের উত্তর দক্ষিণ পূর্বপশ্চিম সীমানায় তালগাছের চারা রোপণ করে, যাতে করে এই গাছগুলোর মতো সুহাসিনীও বেড়ে ওঠে এবং দূর থেকে দেখে মানুষ এই গ্রামকে শনাক্ত করতে পারে; তখন, সেই সময়,

মফিজুদ্দিন বহুদিন বহুবার তার গ্রামের লোকদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে যা ছিল তাই আছে; সে বলে, আরে বাপু, আমি আকালুর ছাওয়াল মফিজদ্দি এক মুরুক্ষু মানুষ; কিন্তু মিয়াবাড়ির মেয়ে চন্দ্রভানকে বিয়ে করায় পরিস্থিতি এমনভাবে বদলে যায় যে, সুহাসিনীর লোকেরা সব জেনেও তাকে ম্যাসাব বলে ডেকে চলে এবং নয়নতারার হাট লেগে ওঠা এবং চন্দ্রভানের সঙ্গে তার পরিণয়ের পর তাকে পঞ্চায়েতের প্রধান বানায়। তারপর থেকে সুহাসিনী গ্রামে এবং ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নে আর নির্বাচন হয় নাই, নির্বাচন এলে গ্রামের লোকদের এই কথাটি জানা থাকে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া নির্বাচনে দাঁড়াবে এবং সে প্রার্থী হলে আর কেউ প্রার্থী হবে না; এভাবে, গ্রামের লোকেরা দেখতে পায় যে, মফিজুদ্দিন একনাগাড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। সুহাসিনীর মানুষের এই কথাটি জানা ছিল যে, মফিজুদ্দিন এক শ এগারো বছর জীবিত থাকবে, এবং যেকোনো কারণেই হোক, এ কথায় তাদের যেহেতু আস্থা জন্মে গিয়েছিল, তারা একসময় ধরে নিয়েছিল যে, এই এক শ এগারো বছর তাদের আর ভোট দেয়ার কোনো ব্যাপার নাই। তাদের এই জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের যথার্থতার ধারণা নিয়ে তারা ব্রিটিশ আমলের শেষাংশ পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট এবং আইউব খানের বিডি চেয়ারম্যানের কাল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ন মাস এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের সময়কালের ভেতর দিয়ে পার হয়ে আসে এবং এই সুদীর্ঘকাল মফিজুদ্দিনের পরাজয়ের প্রশ্ন কখনো ওঠে নাই, কারণ, প্রথম দিকে গ্রামের লোকেরা নিজেদের আগ্রহের কারণেই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচিত করতে চাইত, পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনে মফিজুদ্দিন এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, গ্রামের মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভের ধারণা তার কাছে অপমানকর বলে মনে হয়; এই সময় কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেলে পরিণতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিকে সরে পড়তে হতো। সুহাসিনীর লোকদের মনে পড়ে যে, জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর, তারা তাদের চোখের সামনে মফিজুদ্দিন মিয়ার শরীর সঙ্কুচিত হয়ে আসতে দেখেছিল; তার পেশি শিথিল হয়ে ওঠে, চামড়া ঝুলে যায়। এই পর্যায়ে গ্রামের লোকদের হয়তো এ রকম মনে হয় যে, তারা মফিজুদ্দিন মিয়াকে আজীবন এ রকমই দেখছে, বৃদ্ধ এবং জীর্ণ; কিন্তু এই জীর্ণতার এখানেই শেষ, এরপর তা আর অগ্রসর হয় না, মনে হয় যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় মফিজুদ্দিনের জীবন, এবং এই জীবন অনড় ও স্থায়ী হয়ে ওঠে সুহাসিনীতে; সুহাসিনীর লোকেরা জানে, এক শ এগারো বছর বাঁচবে এই বৃদ্ধ। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর সত্তরের দশকের কোনো এক নির্বাচনের সময় সুরধ্বনি গ্রামের মেম্বার আফজাল খাঁ ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হওয়ার চেষ্টা করে এবং তখন এই এলাকার লোকেরা জীর্ণতার ভেতর থেকে পুরনো মফিজুদ্দিনকে আবিষ্কার করে। এই নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের নির্ধারিত তারিখের আগের দিন বিকেলে সুহাসিনীর লোকেরা মফিজুদ্দিন মিয়াকে সাদা পাঞ্জাবি পরে

মিয়াবাড়ির ভিটা থেকে একা বের হয়ে আসতে দেখে, প্রথমে ভালোমতো বুঝতে না পারলেও তারা যখন দেখে যে, মফিজুদ্দিন ভিটা থেকে নেমে তার বাড়ির সামনের মেটে সড়ক ধরে এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে মোড় নেয় তখন তাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, সেই বিকেলে মফিজুদ্দিন মিয়া কোথায় যায়। সুহাসিনীর লোকেরা এই কথা শুনতে পেয়েছিল যে, আফজাল খাঁর ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হওয়ার ইচ্ছার কথা শুনে মফিজুদ্দিন মিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং তারা যখন একদিন বিকেলে বৃদ্ধ মফিজুদ্দিনকে মাথা বাঁকানো লাঠি হাতে একধরনের একরোখামির সঙ্গে সুরধ্বনি গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে, তারা রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকে। তারা সেদিন বিকেলে মফিজুদ্দিন মিয়ার পেছনে, একটু দূরে, তার নাতি ফৈজুদ্দিনকেও এগোতে দেখে, তারা দুজন মাটির ধুলোময় রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় এবং সুহাসিনীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে শুকনো খালের কাছে পৌঁছে মফিজুদ্দিন অনুসরণকারীর উপস্থিতি টের পায়। খালের শুকনো খাদের ভেতর নেমে মফিজুদ্দিন একটু দাঁড়ায় এবং অনুসরণকারীকে অসতর্ক হয়ে ওঠার জন্য একটু সময় দিয়ে ত্বরিত ঘুরে হাতের লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে; ফৈজুদ্দিন একটু ইতস্তত করে পেছন ফিরে দৌড় দেয় এবং সুহাসিনীর লোকেরা দেখে যে, ফৈজুদ্দিন দৌড় দেয়ার পরেও মফিজুদ্দিন মিয়া তার পিছু ছাড়ে না; সে তাকে লাঠি উঁচিয়ে গালাগাল করতে করতে ধাওয়া করে, হারামযাদা, বাইঞ্চোত, কইছি যে আমার সঙ্গে কারুর আসা লাইগব না; শালা খাঁয়ের বাচ্চার নেইগা আমিই যথেষ্ট, তবু পিছনে আইছে। সেদিন বৃদ্ধ মফিজুদ্দিনকে দেখে সুহাসিনীর মানুষের মনে হয় যে, মফিজুদ্দিনের কোনো বদল হয় নাই, এবং গ্রামবাসীদের ভেতর যারা প্রবীণ, তাদের তখন কুকুর মারার সেই ঘটনার কথা পুনরায় স্মরণে আসে এবং তারা দেখতে পায়, বহুদিন পূর্বের কিশোর মফিজুদ্দিন গ্রামের ওপর দিয়ে কাজিদের পাগলা কুকুরের পেছনে ধাওয়া করে বেড়ায়। সেদিন কাজিদের কুকুর তাড়া করে মারার পর গাঁয়ে যখন পুলিশ আসে এবং তারা উল্টো অভিযোগকারী আলতাফ কাজির ওপর ক্ষেপে যায়, তখন সুহাসিনীর প্রথমে ভয় পেয়ে যাওয়া লোকেরা হেসে ওঠে, শালার আলতাব কাজি একটো বেকুব, তারা বলে; এবং এই কাহিনী যখন গ্রামে প্রচারিত হয় এবং আলি আসগর মিয়া তা শোনে, বিষয়টি সম্পর্কে সে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠে এই কারণে যে, এই ঘটনায় আলতাব কাজির এক ধরনের অপদস্থতা হয়। আলি আসগর মিয়া তার জমির বর্গাচাষি আকালুকে ডেকে পাঠায় এবং আকালু এলে পরে মফিজুদ্দিনের কাজিদের পাগলা কুকুর হত্যার কথা উল্লেখ করে বলে, তর ছাওয়ালডো একটা ভাল কাম হইরছে, একদিন অক আনিস আমার কাছে। আকালু তার ছেলের প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়ে পড়ে এবং দৌড়ে গিয়ে তখনই মফিজুদ্দিনকে খুঁজে পেতে নিয়ে আসে এবং মফিজুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে আলি আসগর মিয়ার মনে হয়েছিল যে, এই কিশোর অথবা নবীন যুবকটিকে বহুদিন দেখেও যেন সে দেখে নাই; তখন, বস্তুত হাটে বিক্রির জন্য ওঠানো গবাদি পশুর মতো সে

মফিজুদ্দিনের শরীর বিশদ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে, সে দেখে যে, আকালুর মতো ঢ্যাঙা লম্বাচওড়া দেহকাঠামোর ওপর তার বোবা স্ত্রীর হালকা বর্ণের চামড়া জড়িয়ে এই কিশোর সৃজিত হয়ে উঠেছে। সে মফিজুদ্দিনের ক্ষীণ দড়ির মতো হাতের পেশি এবং কব্জির চওড়া হাড় লক্ষ করে এবং বুঝতে পারে যে, এই ছেলেটি যদি লাঙলের হাতল চেপে ধরে তাহলে পৃথিবীর মৃত্তিকার কোনো উপায় থাকবে না গভীরভাবে উন্মুক্ত না হয়ে। আলি আসগর মিয়া তখন মনস্থির করে ফেলে, সে একটু এগিয়ে গিয়ে মফিজুদ্দিনের পিঠের দিকে বাহুমূলের কাছে আলতো চাপড় দেয়, যেন মনে হয়, সে একটি চমৎকার দেখতে প্রাণীর দৃঢ়তা, তেজ এবং একই সঙ্গে আনুগত্যের পরিমাণ পরখ করে দেখতে চায়, এবং আকালুকে বলে তর ছাওয়ালডো যুয়ান মর্দা হয়্যা গেছে আকালু, অক আমার কাছে এহন বান্দা কামে লাগায় দে, অক আমি রাখমু। আলি আসগর মিয়ার এই প্রস্তাবে আকালু প্রথমে রাজি হয় না, কিন্তু আলি আসগর মিয়া যখন বেতন হিসেবে বছরে আট মণ ধান, দুই জোড়া লুঙ্গি এবং এক জোড়া গামছা দেয়ার প্রস্তাব করে তখন আকালু বিষয়টি ভেবে দেখে এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তারপর সে রাজি হয়; কিন্তু মফিজুদ্দিনকে সে রাজি করাতে পারে না। আকালু ছেলেকে বুঝিয়ে এবং একই সঙ্গে জোরাজুরি করে যখন আশা করতে থাকে যে, মফিজুদ্দিন এই কাজে যোগ দেবে, তখন একদিন ধানঘড়ায় যাত্রাদল এসে করতোয়া নদীর পশ্চিম পাড়ে মাঠের ওপর তাঁবু টানায়; সে সময়টা ছিল ফসল কাটার পরে শীতের কাল, তখন কৃষকের ঘরে ছিল ধান এবং হাতে অবসর, ফলে চতুর্দিকের লোকদের দল বেঁধে রাত্রিবেলা ধানঘড়ায় যাত্রা দেখতে যেতে এবং দিনের বেলা রোদে বসে হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে সে সম্পর্কে আলোচনায় মশগুল দেখা যায়। এই যাত্রা দলটি দু মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন যাত্রাভিনয় করে পুনরায় তাঁবু গুটিয়ে ধানঘড়া ত্যাগ করে যায় এবং ধানঘড়াতে যাত্রাদলের বিদেয় হয়ে যাওয়ার দিন থেকে সুহাসিনীতে মফিজুদ্দিনকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্তর্ধানের তিন বছর পর এক শ্রাবণের দিনে, সে যেভাবে হঠাৎ করে উধাও হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করে গ্রামে ফিরে আসে এবং আকালুর ভিটায় গিয়ে ওঠে এবং গ্রামের মানুষ, যাকে ভেবেছিল মরে গেছে কোথাও কোনোভাবে, তার মুখ থেকে তখন জানতে পারে যে, ভোলানাথ অপেরা কম্পানিতে সখী সেজে সে তার নিরুদ্দেশের তিনটি বছর কাটায়; যে সময়ের ভেতর তার বোবা গাছের মতো মা মরে যায় এবং বাপ আকালু বুড়ো হয়ে ওঠে। মফিজুদ্দিনের কাছ থেকে তখন সুহাসিনীর লোকেরা এমন সব জায়গার নাম শোনে, যে জায়গার নাম তারা এর আগে কখনো শোনে নাই; বর্ষার দিনে অবসরপীড়িত গ্রামের কৃষকদের বাদামি মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, কি যে ভালো নাইগতো পাট কইতে, সখা সখা বীর তুমি, তোমাক কি সাজে এই করন্দন; কত যে বই যাত্রার, রাই বিরহিনী, অসুর বধ, নন্দলালের ফাঁসি, পল্লী মেয়ে, আরো কত কি। তার কাছ থেকে সুহাসিনীর লোকেরা জানতে পারে যে, এই যাত্রাদলের সঙ্গে গিয়ে সে

রেলগাড়িতে চড়ে, যমুনা নদী পার হয়ে পূর্ব দিকে চলে যায়, কত রকমের লোক যে সে দেখতে পায়; সে বলে, এইখান থেইক্যা পরথম আমরা গেলাম সলপ, তারপর বেড়া, তারপর বেড়া থেইক্যা নদী পার হয়া গেলাম মানিকগঞ্জ, সেইখান থেইক্যা গেলাম গোয়ালনন্দ, তারপর কত জায়গায় যে গেলাম, ঝিনাইদহ, কুইষ্টে, কত জায়গা। তারপর আবার ঘুইর‍্যা আইসল্যাম ধূনট, অধিকারীক কইল্যাম, আমার ভালো নাইগত্যাছে না, আমি বাড়িত যামু; অধিকারী শালার ব্যাটা কয়, অক্ষণে মাত্র আইলাম, পালা শুরু হইব, আর তুমি কও বাড়িত যাইবা, তা কি হয়, অখন থাকো, পড়ে যায়ো; কিন্তু আমি কই, না, আমি আর থাকপ না, আমি চইলল্যাম; আর শালার আইসা দেখি যে, মাডো গ্যাছে মইর‍্যা। সুহাসিনীর মানুষদের তখন মফিজুদ্দিনের নীরব মায়ের কথা মনে পড়ে, যে নিজের আবির্ভাবের রহস্যের কোনো কিনারা না করে, ছেলে মফিজুদ্দিনের অনুপস্থিতিকালে একদিন মরে যায় এবং তিন বছর পর মফিজুদ্দিন যেদিন পুনরায় ফিরে আসে এবং আকালুর মুখে মায়ের মৃত্যুর খবর শোনে, পিতা-পুত্র একে অপরকে, বাজান, বলে ডেকে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদে। তবে সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিনের নিঃসঙ্গতা দ্রুত দূর হয়, কারণ, তার জীবনের আঙিনায় পুনরায় এসে দাঁড়ায় আলি আসগর মিয়া এবং এবার প্রায় একই সঙ্গে প্রবেশ করে চন্দ্রভান আকতার। সুহাসিনীর লোকেরা এই বিষয়ে অবহিত ছিল যে গ্রামের মাঝ বরাবর একটি হাট বসানোর ইচ্ছে আলি আসগর মিয়ার বহুদিন থেকে ছিল, কিন্তু হাট বসানোর অনুমতি সংগ্রহ করতে গিয়ে সে হয়রান হয়ে পড়ে, সে রায়গঞ্জ থানায় গিয়ে প্রার্থনা করে, মহকুমা শহর সিরাজগঞ্জে গিয়ে খোঁজ করে, অনুমতি দেয়ার আসল লোকটি কে বা কোথায় তার হদিস করতে পারে না; এবং এই সময়, দীর্ঘদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকার পর গ্রামে ফিরে আসা আকালুর ছেলে মফিজুদ্দিনের সঙ্গে তার পুনরায় যোগাযোগ ঘটে। মফিজুদ্দিন যাত্রাদল থেকে ফিরে আসার পর গ্রামের অন্য সকলের মতো জানতে পারে যে, আলি আসগর মিয়া সুহাসিনীতে একটি হাট লাগানোর জন্য চেষ্টা করছে; তখন একদিন রৌহার বিল থেকে মাছ মেরে ফিরে আসার পথে মফিজুদ্দিনকে আলি আসগর মিয়া পুনরায় দেখতে পায়, যার পরিণতিতে মফিজদ্দি হয়ে ওঠে মফিজুদ্দিন মিয়া এবং সুহাসিনীতে পরবর্তী প্রায় সত্তর বৎসর তার জীবন এমনভাবে বিকশিত এবং আবির্তত হয়, যার গল্প, এই জীবনের অংশ এবং দর্শক হিসেবে সুহাসিনীর লোকদের দিন যাপনে ক্রমাগতভাবে ফিরে আসে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, সেদিন রৌহার বিলের কাছে আলি আসগর মিয়া কেন গিয়েছিল তা তারা জানে না, তবে তখন মাঠের ওপর মফিজুদ্দিনকে দেখে সে চিনতে পারে; সে বলে, তুই আকালুর ছাওয়াল মফিজুদ্দি না? এবং তখন, মফিজুদ্দিনকে বাঁধা কামলা হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছে আলি আসগর মিয়ার মনে পুনরায় জাগে এবং তার স্মরণে আসে যে, মফিজুদ্দিন একদিন তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যাত্রাদলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আলি আসগর মিয়া পুনরায়

আকালুকে ডেকে পাঠায় এবং আকালু এলে বাইরের বৈঠকখানায় পেতলের হুঁকোয় তামাক সেবন করতে করতে মফিজুদ্দিনকে স্থায়ী মজুর হিসেবে পাওয়ার পূর্ব-ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করে। আলি আসগর মিয়ার এই প্রস্তাবে আকালুর আপত্তি ছিল না, কিন্তু মফিজুদ্দিনকে নিয়ে তার ভয় ছিল, বিষয়টি নিয়ে জোরাজুরি করলে মফিজুদ্দিন যদি আবার পালায়— এই ভয়ে আকালু আলি আসগর মিয়ার কথা শুনে তোতলায় এবং বলে, আমার ছাওয়ালডো কেমন যানি পাগলাইট্যা, ম্যাসাব, ও ভাল কামলা হবি না। কিন্তু আকালুর এই যুক্তি আলি আসগর মিয়া মানতে চায় না, তার মনে পড়ে মফিজুদ্দিনের মেদহীন তরুণ পেশি এবং হাতের কব্জির হাড়ের কথা; সে বলে, তুমি বাপু অক বুজায়া কও, কাম কইর‍্যাই যহন খাওয়া নাইগবো আমার এই হানেই করুক, বচ্ছরে আট মণ ধান আর দুই জোড়া লুঙ্গি আর দুই জোড়া গামছা, অক বুজাও। আকালু তার ছেলেকে এ সম্পর্কে কি বলে তা গ্রামের লোকেরা জানতে পারে না, তবে তারা জানতে পারে যে, আলি আসগর মিয়া মফিজুদ্দিনকে পাওয়ার এই অভিলাষ ব্যক্ত করার কিছুদিন পর, এক শুক্রবার নামাজের পর দুপুরবেলায়, জুম্মা ঘর থেকে সোজা আলি আসগর মিয়ার বাড়ির বাইরের উঠোনে সে গিয়ে দাঁড়ায় এবং আলি আসগর মিয়া নামাজ শেষে ফেরার পথে দেখে যে, তার বাড়ির উঠোনের গোলাপজাম গাছের ছায়া ঘেঁষে মফিজুদ্দিন অপেক্ষা করে আছে। মফিজুদ্দিনকে নিজের প্রাঙ্গণে খাড়া দেখে আলি আসগর মিয়া মাথার গোল কাপড়ের টুপি খুলে হাতে নিয়ে হেসে ওঠে, এবং বলে, কি রে আইছিস? আয় বৈঠকখানায় আয়, কথা কই; তারপর প্রথমে আলি আসগর মিয়া এবং তার পেছনে মফিজুদ্দিন টিনের চৌচালা বৈঠকখানায় প্রবেশ করে। আলি আসগর মিয়ার টিনের চৌচালা কাচারিঘরে তাদের কিসব আলাপ হয় এবং সেই আলাপ কিভাবে অগ্রসর হয়, গ্রামের লোকেরা তা বিস্তারিত জানতে পারে না, তবে তারা দুটো বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়; তারা বলে যে, এটা ছিল এক সেয়ানে সেয়ানে সাক্ষাৎকার, মফিজুদ্দিন ঘরের ভেতর চেয়ারে বসা আলি আসগর মিয়ার সামনে পুরোটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলে, মেঝেতে পায়ের ওপর বসে না। মফিজুদ্দিন প্রথমত বলে যে, গ্রামে হাট বসানোর জন্য এত চিন্তাভাবনা না করে জেলা বোর্ডের সড়কের ধারে পতিত খাস জমির ওপর হাট বসিয়ে দিলেই বসে যায়, পরে কেউ কিছু বললে গ্রামের লোকেরা একসঙ্গে তার সুরাহা করতে পারবে, এবং দ্বিতীয় ও সাংঘাতিক যে কথাটি মফিজুদ্দিন বলে তা হচ্ছে এই যে, আলি আসগর মিয়ার বাড়িতে সে চলে আসতে সম্মত আছে, তবে মিয়াবাড়ির বাঁধা কামলা হিসেবে নয়, মিয়াবাড়ির জামাই হিসেবে।

যে রাতে মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারে নিহত হয় তার পরদিন গ্রামের লোকেরা বিধ্বস্ত এবং পুড়ে যাওয়া ঘরের ভেতর থেকে সব লাশ বের করে আনে, গ্রামের লোকেরা সেদিন কতগুলো লাশ গুনেছিল তার হিসেব তারা পুনরায় ভুলে যায়, তাদের

মনে পড়ে, অনেক নারী পুরুষ আর শিশুর লাশ ছিল; তখন তারা চন্দ্রভানের লাশটি পায় দক্ষিণদুয়ারি ঘরের একেবারে ডানদিকের কোঠার দরজার কাছে, উপুড় হয়ে থাকা অবস্থায়। গ্রামের লোকেরা তাকে চিৎ করে দেখে যে, তার পা থেকে বুক পর্যন্ত আগুনে পুড়ে কালো কয়লার মতো হয়ে গেছে, তার বয়স্ক মুখটি শুধু অক্ষত আছে এবং গ্রামের লোকেরা দেখে যে, এই নারীর কুঁচকে আসা মুখের চামড়ার ওপর, উপরের ঠোঁটের বাম পাশে একটি কালো তিল সেই বিপর্যয়ের পরেও কেমন জ্বলজ্বল করে। সেদিন গ্রামের লোকেরা মিয়াবাড়ির বাইরের প্রশস্ত উঠোনে অন্যান্য লাশের সারির ভেতর চন্দ্রভানের দগ্ধ লাশটি এনে স্থাপন করে এবং পুলিশি ঝামেলা মেটার পর যখন পরদিন একটি বড় এবং লম্বা গর্ত করে লাশগুলোকে একত্রে সমাহিত করা হয়, তখন, গ্রামের অনেক লোক ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরও যারা উপস্থিত ছিল, তারা মৃত চন্দ্রভানকে মৃত মফিজুদ্দিনের নিকট স্থাপন করার বিষয়ে যেন অবচেতনভাবেই খেয়াল রাখে; যেমন তারা খেয়াল রাখে কবরের সেই গর্তের ভেতর সিদ্দিক মাষ্টারের পাশে আলেকজানকে স্থাপন করার বিষয়, যে আলেকজানের জন্য আবুবকর সিদ্দিক তার নিজের জীবনের গতিপথ একদা বদলে ফেলে এবং সিদ্দিক মাষ্টার হয়ে ওঠে। সেদিন মিয়াবাড়ির উঠোনে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তরমুজের মতো কেটে ফাঁক করা গর্তে লাশ দাফন করা হয়ে গেলে সুহাসিনীর লোকেরা মিয়াবাড়ির ভিটা ত্যাগ করে নিজেদের বাড়ির দিকে যায়, তখন তাদের সঙ্গে সুরধ্বনি গ্রামের বৃদ্ধ আফজাল খাঁ এবং তার যুবক ছেলে ইদ্রিস খাঁ নিচে রাস্তায় নেমে আসে; এবং তখন, সুহাসিনীর লোক যারা সেখানে ছিল, তারা দেখে যে, আফজাল খাঁর গাল এবং দাড়ি বেয়ে নেমে আসা অশ্রু চিকচিক করে, সে বলে, ম্যাসাব, আমার বাপের দোস্তো আছিল।

সুহাসিনীর লোকদের তখন তাদের গ্রামে হাট বসানো এবং মফিজুদ্দিন ও করিম খাঁর বন্ধুত্বের কথা স্মরণ হয়। গ্রামের প্রবীণ লোকেরা, যারা এই সব ঘটনা তাদের শিশুকালে ঘটতে দেখেছিল এবং পরে এর গল্প শুনেছিল, বলে যে, বহুদিন পূর্বের এক শুক্রবার দুপুরে মফিজুদ্দিন আলি আসগর মিয়ার কাছে চন্দ্রভানকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে মিয়াবাড়ির চৌচালা বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে নিজের ভিটায় ফিরে যায় এবং সেদিন বিকেলে হাডুডু খেলার মাঠে সকলকে সে বলে যে, চাইলেই তারা গ্রামে একটা হাট বসিয়ে দিতে পারে, এবং তারপর সুহাসিনী এবং সুরধ্বনি গ্রামের লোকেরা দেখে যে, মফিজুদ্দিন এবং করিম খাঁর সঙ্গে দল বেঁধে তাদের কিশোর এবং যুবক ছেলেরা একদিন কোদাল হাতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়, সুহাসিনীর উত্তর প্রান্তে, জেলা বোর্ডের সড়কের পাশের খাসজমির টুকরোটিতে দূর থেকে কেটে আনা মাটি ফেলে ভরাট এবং উঁচু করে তুলতে থাকে; এবং অল্প অল্প করে এভাবে, গ্রামের ছেলেরা আঠারো দিন ধরে মাটি কেটে ভূমিখণ্ডটিকে উঁচু রাস্তার প্রায় সমতলে নিয়ে আসে। হাট বসানোর মাঠ তৈরি হয়ে

গেলে তারা কতগুলো ক্যানেস্তারা টিন নিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায় এবং টিন পিটিয়ে সুহাসিনী এবং এর আশপাশের, সুরধ্বনি, ব্যাঙনাই, বৈকুণ্ঠপুর, রৌহা, চকনূর ইত্যাদি গ্রামে এই ঘোষণা দেয় যে, পরবর্তী ফাল্গুন মাসের এক তারিখ, বৃহস্পতিবার সুহানিসীতে হাট বসবে। কিন্তু এই ঘোষণা দেয়ার কয়েক দিন পর ফাল্গুনের এক তারিখে হাট বসে না; কারণ, এক তারিখ আসার আগেই মফিজুদ্দিন হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায় এবং গ্রামের লোকেরা সন্দেহ করে যে, মফিজুদ্দিন হয়তো এইসব কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং সে পুনরায় যাত্রাদলে ফিরে গেছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের এই সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হয়, কয়েক দিন পর সে পুনরায় সুহাসিনীতে ফিরে আসে। এই দ্বিতীয় অন্তর্ধান থেকে ফিরে আসার পর মফিজুদ্দিনকে যাত্রাদল থেকে ফিরে আসার পরের মতো মুখর মনে হয় না, সে কেমন চুপ করে থাকে এবং তাকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখায়; তারপর মনে হয় যেন সে সম্বিৎ ফিরে পেতে শুরু করে এবং একদিন তার পিতার পর্ণকুটিরের বাইরে এসে উঠোনে অপেক্ষমাণ গ্রামের যুবকদের সামনে দাঁড়ায় এবং সেই কথাটি বলে, যা পরবর্তীকালে এক পূর্ণিমা রাতের বিপর্যয়ের আগের দিন পর্যন্ত সুহাসিনীর লোকদের নিকট এক অলঙ্ঘনীয় বিশ্বাসের মতো টিকে থাকে। সেদিন কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে বাইরে বের হয়ে মফিজুদ্দিন তার সম্মুখের কিশোর এবং যুবকদের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে যে, সে এক শ এগারো বছর বাঁচবে, এবং তার কথা শুনে গ্রামের ছেলেরা বুঝে উঠতে পারে না, সে এরকম একটি কথা কেন এবং কি প্রসঙ্গে বলে; তবে তখন, নিজের জীবনের সীমা সম্পর্কে এই ঘোষণা দেয়ার পর, মফিজুদ্দিনের চেহরায় অতিদ্রুত এক ধরনের সুস্থিরতা ফিরে আসে এবং তারপর ঠিক হয় যে, ফাল্গুন মাসের ২৯ তারিখ, শেষ বৃহস্পতিবারে সুহাসিনীতে হাট বসবে। গ্রামের ছেলেরা তখন আকালুর ভিটা থেকে ক্যানেস্তারা টিন হাতে পুনরায় চতুর্দিকের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, তখন মফিজুদ্দিন করিম খাঁকে একা তাদের উঠোনে দেখতে পায়, সে করিম খাঁর কাঁধের ওপর ডান হাত রেখে তার গলা বেষ্টন করে কাছে টানে এবং চন্দ্রভানকে বিয়ে করার ইচ্ছের কথা বলে, আলি আসগর মিয়া সাবের ম্যায়া চন্দ্রভানেক বিয়া করমুই, কোনো শালা আমার কিছু কইরবার পাইরব না, আমি এক শ এগারো বচ্ছর বাঁচমু, এই কইল্যাম তক দোস্তো। তারপর ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার যখন সুহাসিনীতে প্রথম হাট বসে, সেদিন মফিজুদ্দিন বন্ধুদের সঙ্গে হাটের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জেলা বোর্ডের রাস্তার কিনারায় বন্ধুদের রচনা করা বৃত্তের ভেতর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে যে, এই হাটের নাম হবে নয়নতারার হাট; তারপর সে সকলকে পিছনে রেখে আলি আসগর মিয়ার বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় এবং সেদিন রাতে মফিজুদ্দিনের সঙ্গে চন্দ্রভানের বিয়ে হয়ে যায়, আকালুর ছেলেকে আলি আসগর মিয়া ঘরে তুলে নেয়।

গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, চন্দ্রভানকে বিয়ে করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা মফিজুদ্দিনের হয় যখন সে তার যাত্রাদল ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসে এবং একদিন চন্দ্রভানকে দেখে। চন্দ্রভানকে নিশ্চয়ই মফিজুদ্দিন আগেও অনেকবার দেখেছিল, কিন্তু এই দিনের দেখায় কি বিশেষত্ব ছিল, গ্রামের লোকেরা প্রথমে তা বুঝতে পারে না। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন পরবর্তী সময়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বলেছিল, আমি তাকায়া দেহি, আমার সামনে ম্যাসাবের ম্যায়া চন্দ্রভান, আর অক দেইখ্যা আমার মনে হইলো যে, আমি অক বিয়্যা হরমু। গ্রামের মানুষেরা বলে যে, এই ঘটনার বিষয়ে মফিজুদ্দিন এর বেশি কিছু বলে না এবং তারা, গ্রামের লোকেরা, এ সম্পর্কে দীর্ঘদিন খুব অল্পই জানতে পারে, যদিও মফিজুদ্দিনের মনে সেই সব ঘটনার বিশদ স্মৃতি আজীবন থেকে যায়। তারা বলে যে, সেই দিন রাতের বেলা আকাশে কোনো ধরনের পূর্ণ অথবা বাঁকা চাঁদ ছিল কি না তা মফিজুদ্দিন পরে ভুলে যায়, এক নির্জন শূন্যতার ভেতর রাতের গভীর প্রহরে সে রৌহার পানিতে বড়শি ফেলে বোয়াল মাছ ধরার জন্য বসেছিল, তার পায়ের কাছে পানির ধার ঘেঁষে ছিল একটি ছোট হারিকেনের আলো; এই আলো পানিতে গিয়ে পড়েছিল এবং মফিজুদ্দিন পাড়ের ওপর অপেক্ষা করে ছিল। তখন নিদ্রামগ্ন চরাচরে কোনো শব্দ ছিল না, কেবলমাত্র তার বড়শিতে টোপ হিসেবে গেঁথে দেয়া জ্যান্ত ব্যাঙটি থেকে থেকে লাফালাফি করে পানিতে শব্দ এবং ছোট ছোট তরঙ্গে সৃষ্টি করছিল। মফিজুদ্দিনের মনে নাই, তখন রাতের কয় প্রহর হয়েছিল; সে সময় তার চোখ ছিল পানিতে ভেসে থাকা ফাৎনার ওপর এবং মন ছিল বোবা মায়ের স্মৃতির শরীর ছুঁয়ে, তখন হঠাৎ তার মনে হয়, অন্ধকারের ভেতর আলতো পায়ে কেউ তার দিকে হেঁটে আসে। প্রথমে এ বিষয়ে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার মনে হয় যে, এই নিশুতি রাতে রৌহার ঘন জঙ্গলের ভেতর কোনো মানুষের এভাবে আসার কথা নয়, এবং তখন তার মনে ভয় দানা বেঁধে ওঠে। তার মনে হয় যে, এটা হয়তোবা মেছোভূত হবে, কাছে এসে নেকো স্বরে মাছ চাইবে, এঁকটো মাঁছ দেঁ, এবং তারপর পিছন ফিরে তাকানো মাত্র ঘাড় মটকে দেবে; ভয়ে মফিজুদ্দিনের দেহে কাঁপুনি ধরে যায়, কিন্তু সে ফাৎনার ওপর থেকে চোখ সরায় না। তখন সেই আবছা শব্দটা তার পিছন দিয়ে তাকে পার হয়ে একটু দূরে গিয়ে থামে, তারপর কেউ যখন তার কাছে কোনো মাছ চায় না, সে তার মাথা একটুও না ঘুরিয়ে, চোখের কোনায় দেখতে পায় যে, বিলের পানির কিনারায় একজন মানুষের মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। মফিজুদ্দিন শরীরের কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করে, বিড়বিড় করে আল্লাহ্‌কে ডাকে এবং তখন, সেই বিভ্রান্তি এবং আতঙ্কের ভেতর তার মনে হয় যে, অশরীরী অস্তিত্বটির আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীর আছে, তার পাগুলোও মনে হয় সামনের দিকে ফেরানো এবং তারপর, তখন, সে বুঝতে পারে, সেটা একটা নারীর শরীর। মফিজুদ্দিন তখন সেই নারীর দিকে তাকায়, কেন এবং কিভাবে সে এই সাহস করে উঠতে পারে, তা সে

মনে করতে পারে না, তবে রৌহার পাড়ের ওপর দাঁড়ানো সেই নারীর দিকে তাকিয়ে সে তাকে চিনতে পারে, দুপুর রাতে বিলের কালো রঙের পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল চন্দ্রভান। মফিজুদ্দিন প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নাই, এটা তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, চন্দ্রভান এভাবে এখানে এসে দাঁড়াতে পারে; সে বড়শির ফাৎনার কথা ভুলে চন্দ্রভানের দিকে এই বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে যে, এত রাতে রৌহার এই জঙ্গলের ভেতর অমলিন কিশোরী চন্দ্রভান কেন! তারপর তার সামনে এমন সব ক্রিয়াকর্ম সংঘটিত হয় যে, সে বুঝতে পারে, চন্দ্রভান রৌহার বিলের এই জায়গায় কোনো এক স্বপ্নের সওদা করে যায়। মফিজুদ্দিন তখন সেই অন্ধকারে, অথবা আধো-অন্ধকারে অথবা জ্যোৎস্নায় দেখে যে, চন্দ্রভান তার পরনের শাড়ি খুলে ফেলে, ব্লাউস খোলে এবং তারপর পেটিকোটের ফিতে খুলে পায়ের কাছে ছেড়ে দেয়। মফিজুদ্দিনের বহুদিন, সম্ভবত আজীবন, সেই দৃশ্য মনে থাকে, তার সম্মুখে উন্মুক্ত আকাশের প্রেক্ষাপটে রৌহার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন চন্দ্রভান; তার নবীন এবং ক্ষুদ্র স্তনের বঙ্কিমতা পদ্মকলির মতো দিগন্ত রেখার ওপর ঠোঁট রেখে স্থির হয়ে আছে, তার নাভির নিচের ঢালু জমি রৌহার বুকের অল্প পানিতে জন্মানো পদ্ম ও হোগলার বনের মতো কালো হয়ে আছে; সেদিকে তাকিয়ে মফিজুদ্দিনের তখন গোক্ষুরের ফণার মতো মনে হয় এবং সেদিন তার অস্তিত্বে চন্দ্রভানের ফণার ছোবলের বিষ ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন রাতে মফিজুদ্দিনের চোখের সামনে পেটিকোট খুলে ফেলে নগ্ন চন্দ্রভান কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে থেকে ধীর এবং সতর্ক পায়ে নিচে কালো পানিতে নেমে যায় এবং বুকসমান পানিতে গিয়ে ডুব দেয়, একবার, দুবার, তিনবার, তারপর সে পানি থেকে পুনরায় পাড়ের ওপর ফিরে আসে এবং ভেজা শরীরে কাপড় পরে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়। তাজ্জব হয়ে বসে থাকা মফিজুদ্দিনের সম্বিৎ ফিরে আসতে কয়েক মুহূর্ত লাগে, সে তার বড়শির ছিপ পানির কিনারায় মাটিতে পুঁতে রেখে চন্দ্রভানের পেছন পেছন আসে। চন্দ্রভান রৌহার পাড় ধরে দ্রুত এগিয়ে যায়, তারপর মিয়াবাড়ির পিছন দিয়ে গাছপালায় ভরা ভিটার গভীরে প্রবেশ করে; মফিজুদ্দিন এখানে থামে, তারপর সে বিলের কিনারায় মাটিতে পোঁতা তার ছিপটির কাছে পুনরায় ফিরে আসে এবং সেখানেই মাটির ওপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। পরদিন ভোরের আলোয় সে যখন চোখ মেলে তাকায় এবং দেখে যে, সে বিলের কিনারায় শুয়ে আছে তখন তার আগের দিন রাতের সব ঘটনা মনে পড়ে এবং সে নিশ্চিত হয় যে, সেসব স্বপ্ন ছিল; সে তখন রৌহার যে জায়গায় চন্দ্রভান পানিতে নেমেছিল সে জায়গাটা পরীক্ষা করে, কাদামাটির ওপর সে ছোট ছোট পায়ের ছাপ দেখে; কিন্তু তবুও তার এ রকম মনে হয় যে, এ হতে পারে না, সে যা কিছু দেখেছে তা সত্য নয়। কিন্তু তার পরও মফিজুদ্দিনের মনে রৌহার পানির কিনারায় কাদার ওপর অঙ্কিত পায়ের ছাপের কথা জেগে থাকে এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, সে দীর্ঘ পাঁচ মাস এই স্বপ্ন পুনর্নির্মাণে ব্যয় করে। তার বুড়ো বাপ, আকালুর মনে বড়

দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তার ছেলেটি তিন বছর নিখোঁজ থাকার পর গাঁয়ে ফিরে এসে নিশির ডাকের কবলে পড়েছে, সে এর প্রতিবিধানের জন্য একটি তাবিজ সংগ্রহ করে কালো সুতো দিয়ে মফিজুদ্দিনের গলায় ঝুলিয়ে দেয়; কিন্তু অবস্থার তাতে কোনো উন্নতি হয় না। প্রতিদিন রাত গভীর হতে থাকলে মফিজুদ্দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং সারা রাত রৌহার বিলের কাছে নিদ্রাহীন কাটানোর পর রাত শেষে মোরগ ডেকে উঠলে বাড়ি ফিরে প্রাঙ্গণের খড়ের গাদার ওপর সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমায়; ক্রমান্বয়ে তার চেহারা মলিন এবং শরীর রুগ্‌ণ হয়ে ওঠে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, পরবর্তী সময়ে মফিজুদ্দিন মনে করতে পারে না মিয়াবাড়ির ভিটার পেছন দিকে রৌহার ধারে কতগুলো রাত সে অপেক্ষা করেছিল; এই অপেক্ষা করার সময় তার মনের ভেতর হয়তো জানা ছিল যে, চন্দ্রভান আর আসবে না, কারণ, রৌহার পানিতে চন্দ্রভানের গোসল করার যে দৃশ্য সে দেখেছিল তা বাস্তব ছিল না; কিংবা, এই জানা থাকার ভেতরেও হয়তোবা তার জানা ছিল যে, সে আসবে, এবং সে আসে। দীর্ঘদিন পর রৌহার কিনারায় চন্দ্রভানের দ্বিতীয় আগমন ঘটে; সেদিন মিয়াবাড়ির ভিটার পেছন দিয়ে বের হয়ে ছায়ামূর্তিটিকে হালকা অথচ দ্রুত পায়ে বিলের পাড় দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে মফিজুদ্দিন বুঝতে পারে যে, এটা চন্দ্রভান এবং তখন তার মনে হয় যে, যদি আশা থাকে, আর যদি লেগে থাকা যায়, তাহলে স্বপ্নও কেমন বাস্তব হয়ে ওঠে। এদিন চন্দ্রভান, এক পাশে চুপ করে বসে থাকা মফিজুদ্দিনকে অতিক্রম করে পূর্বের দিনের মতো নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং মফিজুদ্দিন এই দিন বুঝতে পারে যে, চন্দ্রভান জেগে নেই; তার চোখের পাতা মুদিত, নিজের নগ্নতার অনুপমতা সে নিজের চোখে দেখে না। পরবর্তী তিন মাসে মফিজুদ্দিন মোট সাত দিন চন্দ্রভানকে রৌহার বিলের ধারে দেখে এবং তখন একদিন তার মনে হয় যে, এই নারীকে ছাড়া জীবনে বাঁচা যায় না। এবং তখন একদিন সে আলি আসগর মিয়ার সামনে পড়লে তাকে বাঁধা কামলা করার জন্য আলি আসগর মিয়ার পুরনো ইচ্ছে পুনরায় জেগে ওঠে এবং তখন মফিজুদ্দিন বিষয়টি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে আসে; এক শুক্রবারে জুম্মা নামাজের পর সে মিয়াবাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে যে, সে চন্দ্রভানকে বিয়ে করতে চায়। এই সব ঘটনা গ্রামের লোকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে জানতে পারে এবং তাদের সামনে এই কাহিনীর একটি পরিপূর্ণরূপ ফুটে ওঠে। সেদিন চৌচালা টিনের বৈঠকখানা ঘরের ভেতর আলি আসগর মিয়া এবং মফিজুদ্দিনের যেসব কথা হয় গ্রামের লোকেরা ক্রমান্বয়ে তা জানতে পারে; মফিজুদ্দিনের কথা শুনে আলি আসগর মিয়ার মুখ অপমান ও ক্রোধে লাল হয়ে যায়, সে বলে, নিমক হারাম, বজ্জাত, তর সাহস তো কম না; কিন্তু মফিজুদ্দিন এই রাগ দেখে বিচলিত হয় না, সে চেয়ারে উপবিষ্ট আলি আসগর মিয়ার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং চন্দ্রভানকে তার বিয়ে করতে চাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে। সে, স্তম্ভিত আলি আসগর মিয়াকে বলে যে, তার চাঁদের মতো সুন্দরী মেয়ে চন্দ্রভানের ওপর জিনের আসর আছে

এবং সেই জিনটাকে সে চেনে, সে সেই জিনটাকে বশে এনেছে; তাই সে বলে যে, চন্দ্রভানকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলে মেয়েটা ভালো থাকবে, আর না দিলে মেয়েটার দুঃখ, কষ্ট এবং যন্ত্রণার শেষ থাকবে না। সেদিন আলি আসগর মিয়া তার এই কথা শুনে আরো ক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু মেয়ের এবং মিয়াবাড়ির সম্মানের কথা ভেবে গলার স্বর নিচু রেখে বলে যে, মফিজুদ্দিন একটা ঠক এবং জোচ্চোর, সে কামলা বেচে খাওয়া আকালু এবং তার বেয়াদপ ছেলেকে উচিত শিক্ষা দেবে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলে যে, তখন সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আলি আসগর মিয়ার হাতের বাইরে ছিল, সে কেবলমাত্র সে বিষয়ে জানত না; সেদিন তার গালাগালির মুখে মফিজুদ্দিন নির্বিকারভাবে তাকিয়ে থাকে তারপর একসময় আর কথা না বলে নীরবে মিয়াবাড়ির টিনের বৈঠকখানা ত্যাগ করে আসে; এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিনের তখনই জানা ছিল, এরপর সে কি করবে। মিয়াবাড়ির ভিটা ছেড়ে আসার পরের দিন অতিক্রান্ত হয়ে যখন রাত আসে এবং রাত গভীর হয় তখন সে রৌহার ধারে গিয়ে বসে এবং মনে হয় যেন তার ভাগ্য তার প্রতি আরো প্রসন্ন হয়ে ওঠে, কারণ, এবার রৌহার পানির কিনারায় তাকে মাত্র চার দিন অপেক্ষা করতে হয়; পঞ্চম দিন রাতে সবকিছু নূতন করে পুনরায় ঘটে, নিদ্রাচ্ছন্ন চন্দ্রভান এসে রৌহার পানিতে নামে এবং তখন পাড়ের ওপর নিশ্চল কালো ঝোপের মতো বসে থাকা মফিজুদ্দিন তৎপর হয়, তার পরিকল্পনা গুছিয়ে আনে। চন্দ্রভান নগ্ন হয়ে পানিতে নেমে যাওয়ার পর মফিজুদ্দিন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পাড়ের ওপর ফেলে রাখা চন্দ্রভানের পরিত্যাক্ত কাপড়গুলো সংগ্রহ করে আনে এবং তার জায়গায় রেখে দেয় কদিন আগে সিরাজগঞ্জ শহর থেকে তার কিনে আনা লাল রঙের শাড়ি, ব্লাউজ এবং পেটিকোট। চন্দ্রভান গুনে গুনে তিন ডুব দিয়ে উঠে আসে এবং মফিজুদ্দিনের রেখে দেয়া নূতন শাড়ি, ব্লাউজ ও পেটিকোট পরে নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। তখন মফিজুদ্দিন চন্দ্রভানের ফেলে যাওয়া শাড়ি, ব্লাউজ এবং সায়া প্রতিযোগিতায় জয় করা পুরস্কারের মতো মাথার ওপর তুলে ধরে এবং তারপর সেগুলো বুকের ভেতর জড়িয়ে রৌহার পানি এবং পদ্মবনের পাশে উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপর শুয়ে থাকে, তার নাকে ঘ্রাণ আসে, নারী এবং মাটির, তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে হালকা অন্ধকার থাকতেই সে ঘুম থেকে ওঠে এবং চন্দ্রভানের কাপড়চোপড় নিয়ে পেছন দিক দিয়ে মিয়াবাড়ির ভিটায় প্রবেশ করে এই ভিটার উত্তর-পশ্চিম কোনায় লম্বা গাব গাছে উঠে চন্দ্রভানের কাপড় সে একটি মগডালে ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে আসে, এবং পাশ দিয়ে ঘুরে ভিটার সম্মুখ দিকে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়ায়; রাতের অন্ধকার কেটে দিনের আলো তখনো তেমন স্পষ্ট হয় নাই, সে এই অস্পষ্ট আলোয় অথবা অন্ধকারে ভিটার মাঝখানের ঘুমন্ত টিনের ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে, সকালের প্রথম মোরগ ডেকে ওঠার আগে হাঁক দেয়, ম্যাসাব বাড়িত আছেন নাহি? তাকে সেদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় মিয়াবাড়ির বাইরের উঠোনে, একাধিকবার হাঁক দেয়ার পর ভিটার প্রবেশমুখের কাছে টিনের চৌচালা

বৈঠকখানার ভেতর প্রথম মানুষের জেগে ওঠার শব্দ পাওয়া যায়, তারপর দরজা খুলে একজন মুনিষ চোখ কচলাতে কচলাতে বের হয়ে আসে এবং সাড়া দিয়ে ওঠে, কেডা বা? মফিজুদ্দিন এই কামলার দিকে তাকায় না, সে ভিটার মাঝখানের ঘরগুলোর কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে এবং আলি আসগর মিয়ার ভিতরবাড়ির দিকে মুখ করে পুনরায় হাঁক দিয়ে ওঠে, ম্যাসাব একটু বাইরে আসেন, আমি মফিজুদ্দি। কিন্তু তার পরও অনেকক্ষণ বাড়ির ভেতর থেকে কেউ সাড়া দেয় না কিংবা বাইরে বের হয়ে আসে না, দিনের আলো দ্রুত পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠতে থাকে এবং তার ভেতর চেক লুঙ্গির ওপর হাতাওয়ালা ময়লা গেঞ্জি পরা মফিজুদ্দিনকে দাঁড়ানো দেখতে পাওয়া যায়। তখন একজন চাকরানি এসে ভেতরের এবং বাইরের উঠোন বিচ্ছিন্নকারী টিনের বেড়ার মাঝখানের দরজা খুলে বের হয় এবং বলে, এই বিয়ানবেলা কেডা ডাকাডাকি করে? কিন্তু মফিজুদ্দিন এই চাকরানির সঙ্গেও কথা বলে না, যেন তার কথা সে শোনেই নাই এমন নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আর একবার হাঁক দিয়ে ওঠে, এবং এইবার হাঁক দেয়ার পর সে ভেতরের উঠোনে খড়মের আওয়াজ পায় এবং তখন আলি আসগর মিয়া গম্ভীর মুখে গেঞ্জি পরা অবস্থায় মাঝখানের বেড়ার দরজা পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং চাপা ও ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, কি চাইস তুই? গ্রামের লোকেরা বলে যে, তখন মফিজুদ্দিন একধরনের নির্মম মৃদু হাসি তার মুখে বিকশিত করে দিয়ে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়া আলি আসগর মিয়াকে বলে যে, তার মেয়ে চন্দ্রভান সম্পর্কে সে কথা বলতে চায়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিনের হাঁক শুনে চিনতে পারার পরেই আলি আসগর মিয়ার জানা হয়ে গিয়েছিল সেই সকালে মফিজুদ্দিন পুনরায় কেন এসে হাজির হয়েছে। বাড়ির ভিতর থেকে খড়মের ফট ফট শব্দ করে বের হয়ে আসার পর উত্তেজনার বশে বিনা কারণেই সে প্রশ্নটা করে এবং সে যখন মফিজুদ্দিনের উত্তর শোনে তখন সে লক্ষ করে যে, তার বাইরের উঠোন জুড়ে কামলা এবং চাকরানিদের চলাফেরা এবং কাজের তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে; এই অবস্থায় আলি আসগর মিয়া দ্বিতীয় বারের মতো তার ক্রোধ সংবরণ করে ভিটার এক পাশে পুকুরের পাড়ের কাছে মফিজুদ্দিনকে নিয়ে যায় এবং সেখানে মফিজুদ্দিনের আর কোনো কথা শোনার আগেই গাল দিয়ে ওঠে, হারামযাদা, তক আমি ডাল কুত্তা দিয়্যা খাওয়ামু। সুহাসিনীর লোকেরা বহুদিন এই গল্প করে এবং তারা আলি আসগর মিয়ার দুর্দশার ভেতরকার পরিহাসের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে, তারা বলে যে, আলি আসগর মিয়া আকালুর এই ছেলেটিকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাকে পাওয়ার কোনো উপায় করতে পারছিল না; তারপর সে যখন একদিন শুক্রবার দুপুরে সত্যি সত্যি মিয়াবাড়িতে এসে দাঁড়ায় তাকে তাড়ানোর জন্য আলি আসগর মিয়া অস্থির হয়ে পড়ে, কিন্তু তাকে তাড়ানোর কোনো উপায়ও সে খুঁজে পায় না। সেদিন পুকুরপাড়ে আলি আসগর মিয়ার ধমক খেয়ে মফিজুদ্দিন একটুও ভয় পায় না, কারণ, সে জানত যে, আলি আসগর মিয়া এ রকমই ব্যবহার করবে এবং তুরুপের তাসটি আছে তারই

হাতে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন বড় পাকা খেলোয়াড়ের মতো তার হাতের তাসটি খেলে, সে সেই সকালে আলি আসগর মিয়ার ক্রোধ এবং অপমানে লাল হয়ে আসা মুখের দিকে শান্তভাবে তাকায়, তার মুখের পাতলা হাসির জায়গায় এক ধরনের গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে এবং নিম্নস্বরে সে চন্দ্রভানের জিনের অপকীর্তির কথা বলে; সে বলে যে, সেই জিন, যে জিনের কথা আলি আসগর মিয়া বিশ্বাস করতে চায় না, আগের দিন রাতে চন্দ্রভানকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। গলার স্বর আরো একটু নরম এবং নিচু করে এনে, মাটির দিকে চোখ নত করে রেখে সে বিড়বিড় করে বলে যে, এই জিন চন্দ্রভানের সঙ্গে কি কাজ করেছে তা সে বলতে পারবে না, তবে অপহরণের খবরটা সে একসময় জেনে যায় এবং বদমাশ জিনটাকে বাধ্য করে চন্দ্রভানকে ঘরে এনে রেখে যেতে। জিনটা চন্দ্রভানকে যথাস্থানে রেখে যায়, কিন্তু মফিজুদ্দিনের ধমক খেয়ে সব উল্টোপাল্টা হয়ে যায় তার, ভয়ের চোটে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে চন্দ্রভানকে রেখে যাওয়ার সময় তার পরন থেকে নিজের দেয়া কাপড়চোপড় খুলে নিতে ভুলে যায় সে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, চরম ক্রোধের সেই মুহূর্তেও মফিজুদ্দিনের গম্ভীর এবং মাটির দিকে নত করে রাখা মুখের দিকে তাকিয়ে আলি আসগর মিয়া বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সে কোনো কথা বলতে পারে না, তার ভ্রু এবং চোখের কোণ সঙ্কুচিত হয়ে আসে; এই সময় মফিজুদ্দিন আনত চোখ উঠিয়ে তার বিভ্রান্ত দৃষ্টির ওপর স্থাপন করে বলে, আপনের বিশ্বাস না হয় ঘরে যায়া দেখেন, আপনের ম্যায়া চন্দ্রভানের বড় বিপদ; এবং তারপর সে আসল কথাটি বলে, সে বলে যে, এই বিপদ থেকে চন্দ্রভানকে সে-ই বাঁচাতে পারে, কারণ, এই দুষ্ট জিনটাকে কেমন করে কাবু করতে হয় তা সে জানে। তখন সেই সকালবেলা, মিয়াবাড়ির পুকুরপাড়ে তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আর একটি শব্দও বিনিময় না করে তারা বিচ্ছিন্ন হয়; আলি আসগর মিয়া সেই অতি সকালে, তখনো নিদ্রিতা তার মেয়ের ঘরে গিয়ে ঢোকে এবং মফিজুদ্দিন নীরবে মিয়াবাড়ির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে আসে।

পরে ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা রাতের রক্তপাতের পরদিন গ্রামের লোকেরা যখন মিয়াবাড়ির বিধ্বস্ত এবং পোড়া বাড়িঘরের ভেতর থেকে লাশ খুঁজে বের করে, তখন তাদের শুধু লাশগুলোর নাম নয়, এক দীর্ঘ ইতিহাস মনের ভেতর জানা থাকে। তারা তখন সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর মৃতদেহের সঙ্গে তাদের স্মৃতির সম্ভাব্য সাক্ষীগুলোও খুঁজে ফেরে; এর অনেক কিছুই তারা খুঁজে পায় না, কারণ, তারা যা কিছু শুনেছিল তার অনেক কিছুই হয়তো সত্য ছিল না, আবার সত্য ছিল এমন অনেক কিছুর স্মৃতি চিহ্নই হয়তো আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। সেদিন গ্রামের লোকেরা গুলিবিদ্ধ অথবা গুলিবিদ্ধ নয় এমন, দগ্ধ এবং অর্ধদগ্ধ, লাশগুলো একে একে বের করে বয়ে নিয়ে প্রাঙ্গণে রাখে, তারপর উঠোনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা কবর খোঁড়ে, লাশ পাশাপাশি

রেখে মাটিচাপা দেয়। সে সময় হয়তোবা তারা খুব বিহ্বল এবং অন্যমনস্ক ছিল, অথবা, হয়তোবা অন্য কোনো কারণে, তারা মফিজুদ্দিন মিয়ার একাদশতম পুত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কথা ভুলে যায়। পরবর্তী সময়ে মোবারক আলির পোড়ো ভিটার ওপরকার ছ'টি কবর গুঁড়িয়ে দিয়ে রায়গঞ্জ থেকে আসা রাস্তা যখন মাটি কেটে সুরধ্বনি গ্রামের দিকে এগিয়ে নেয়া হয়, সেদিন গ্রামের লোকেরা কবরের ওলট-পালট করা মাটির ভেতর থেকে দুলালির কঙ্কালের হাড় বের করে আনে এবং তখন তাদের মনে হয় যে, পূর্ণিমার রাতে নিহত হওয়ার পরদিন পরিবারের অন্য সকলকে এক কবরে দাফন করার সময় মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কথা কারো মনে না পড়ার পেছনে একটি সহজ কারণ ছিল। তারা বলে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কথা প্রথমে ভুলে না গেলে তার কবরের সঙ্গে পরবর্তীকালে দুলালির কবর রচনা করা সম্ভব হতো না। সেদিন মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দাফন করার বিষয়টি গ্রামের লোকেরা প্রথমে খেয়াল করে না, কারণ, তার লাশ অন্যদের সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পোড়া বাড়িঘরের ভেতর পাওয়া যায় নাই; কিন্তু গ্রামের লোকদের সেটা মনে পড়ে নাই, তারা ভাবে যে, সকলকে পাওয়া গেছে এবং কবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরে যখন আততায়ীদের আগমন নির্গমনের পথের বিষয়ে সন্ধান করা হয় তখন বোঝা যায় যে, আততায়ীরা পায়ে হেঁটে আসে নাই, তারা নৌকোয় করে খাল বেয়ে এসে মিয়াবাড়ির ভিটার পেছন দিকে উত্তর-পশ্চিম কোনায় নামে, তারপর তারা ভিটার কিনার দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঘেরাও করে ধরে। ভিটার উত্তর-পশ্চিম কোনায় যেখানে বহুদিন পূর্বে একটি গাবগাছ ছিল, তার নিকটে একটি বাতাবিলেবু গাছতলায়, ভেন্না, ধুতুরা এবং কাঁটা শাকের ঝোপের ভেতর গ্রামের লোকেরা মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে। মোল্লা নাসিরউদ্দিন সেদিন মাঝরাতে ঘর ছেড়ে কেন বাতাবিলেবু গাছতলায় গিয়েছিল তা কেউ বুঝতে পারে না, তবে গ্রামের লোকেরা এই বিষয়টি বুঝতে পারে যে, সে রাতে মিয়াবাড়িতে সকলের আগে নিহত হয়েছিল মোল্লা নাসিরউদ্দিন। গ্রামের লোকেরা যখন তার লাশ কাঁটা শাকের ভেতর থেকে তুলে আনে তারা দেখতে পায় যে, মাথার ওপর কঠিন কোনো বস্তুর প্রবল আঘাতে তার খুলি চূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে গেছে। গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে যে, আততায়ীরা যখন আসে তখন মোল্লা নাসিরউদ্দিন খালের কিনারায় লেবু গাছের তলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, সে তাদেরকে নৌকো থেকে নামতে দেখেছিল, হয়তো জিজ্ঞেস করেছিল, কেডা বা? এবং তখন কিছু বুঝে ওঠার আগেই অন্ধকারে তাকে ঘিরে ধরা আততায়ীদের নৌকোর বৈঠার প্রচণ্ড আঘাতে সে প্রাণ হারায়। গ্রামের লোকেরা যখন চূর্ণ হয়ে যাওয়া খুলি তার পরনের শার্ট দিয়ে পেঁচিয়ে লাশ কবর দেয়ার জন্য নিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে, অন্যদের পাশে তার জন্য আর জায়গা নাই; লম্বা কবরটা মিয়াবাড়ির বাইরের উঠোনটিকে পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়িভাবে প্রায় প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত ইতোমধ্যে

দ্বিখণ্ডিত করেছে। এই কবর লম্বা করার জায়গা না থাকায় গ্রামের লোকেরা এই কবরের পেছনে, পূর্ব কিনারায় একটি পৃথক কবর খুঁড়ে মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দাফন করে এবং তখন গ্রামের এইসব লোকের এই কথাটি জানা থাকে না যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিনের বিষণ্ন বিচ্ছিন্ন কবরটির পাশে অন্য একটি কবর রচনা করার জন্য তারা কিছুদিন পর দুলালিকে বাঁশের খাটিয়ায় কাঁধে নিয়ে মিয়াবাড়ির এই পোড়ো ভিটার দিকে রওনা হবে; তবে পূর্ণিমা রাতের পরদিন মফিজুদ্দিন মিয়ার দগ্ধ ভিটায় ছাই আর ধ্বংসস্তূপের ভেতর গ্রামের লোকেরা যখন লাশ এবং স্মৃতিচিহ্ন খুঁজছিল, তখন সকলের শেষে লেবু গাছতলায় মোল্লা নাসিরউদ্দিনের লাশ পাওয়া গেলে সেখানে উপস্থিত গ্রামের লোকদের অনেকেরই দুলালির কথা মনে পড়েছিল। সেদিন তারা যখন চন্দ্রভানের আগুনে পোড়া লাশ পায়, তাদের মনে পড়ে, তাকে বহুদিন পূর্বে জিনের দেয়া লাল রঙের শাড়ি-ব্লাউজের কথা, এবং চন্দ্রভান দীর্ঘ যাট বছর সেই বস্ত্রগুলো সংরক্ষণ করেছিল কি না তা জানা না থাকলেও গ্রামের লোকদের মনের ভেতর এমন ধারণা জেগে থাকে যে, এই খোঁজাখুজির ভেতর হয়তো কোনো এক কোণায়, ছাই এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া এবং কোনো অজ্ঞাত কারণে রক্ষা পেয়ে যাওয়া, চন্দ্রভানের জিনের কাপড়টি দেখা যাবে। কিন্তু সেদিন ছাইয়ের ভেতর এই রক্তবর্ণ বস্ত্রের কোনো অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় না, বরং গ্রামের লোকেরা একটি ঘরের ভেতর থেকে আলেকজানের অর্ধেক পোড়া এবং কালিতে মলিন, হাতে আঁকা ছবিটা পায়; অন্য আর একটি ঘরের ভেতর থেকে তারা অনেকগুলো আধপোড়া লাল মলাটের বই বের করে এবং তাদের ভেতর যারা পড়তে পারে তারা কয়েকটি মলাটের ওপর বইয়ের অক্ষত নাম পড়ে, পাঁচটি প্রবন্ধ, মাও সে তুঙ; সামরিক বিষয়ে ছয়টি প্রবন্ধ, মাও সে তুঙ; রাষ্ট্র ও বিপ্লব, ভ ই লেনিন।

গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে যে, ছাই এবং ধ্বংসস্তূপের ভেতর পাওয়া এই বইগুলো ধানঘড়া হাইস্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র, মফিজুদ্দিন মিয়ার কনিষ্ঠ সন্তান রফিকুল ইসলামের এবং এই বইগুলোর ব্যাপারে তাদের তেমন আগ্রহ না দেখা গেলেও গ্রামের লোকদের পরবর্তী সময়ে বহুবার বহু কারণে কিশোর রফিকুল ইসলামের কথা মনে পড়ে, যে তাদেরকে একসময় একটি স্বপ্নের কথা বলেছিল, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে নাই অথবা বুঝতে পারলেও সেটা তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নাই। গ্রামের লোকদের অনেকের মনে পড়ে যে, কখনো কোনো অবসরে গল্পের সময় রফিকুল ইসলাম তাদেরকে সমাজ এবং রাষ্ট্র বদলে ফেলার কথা বলেছিল, সে বলেছিল যে, গরিব মানুষের এবং গরিব কৃষকের সমস্যার সমাধান সাধারণ নিয়মে হয় না, এজন্য প্রয়োজন হয় বিপ্লবের। গ্রামের লোকেরা স্মরণ করতে পারে, কিশোর রফিকুল ইসলাম তাদেরকে বলেছিল যে, বিপ্লব মানে হচ্ছে একটি পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের পর গরিব এবং বড়লোকের ভেতর কোনো পার্থক্য থাকবে না, সব সম্পত্তির মালিক হবে

সকলে একসঙ্গে, কারো একার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি থাকবে না; এবং তার এইসব কথা শুনে গ্রামের কৃষকদের অনেকে হেসেছিল, তারা রফিকুল ইসলামের কথা হয়তো বুঝেছিল অথবা হয়তো বুঝতে পারে নাই; তারা হেসে ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কও কি বাপু! সুহাসিনীর লোকেরা পরে বলে যে, রফিকুল ইসলাম এই একই কথা বেশ কিছুদিন যাবৎ বোঝানোর চেষ্টা করেছিল জান্নাত আরাকে। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার পরদিন সুহাসিনী গ্রামের এই বিপর্যয়ের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে রফিকুল ইসলামের নিহত হওয়ার খবর তার স্কুলের শিক্ষক এবং সহপাঠীরা জানতে পারে; এবং তখন, তারপর, জান্নাত আরার বহুদিন এই ভাবনা হয় যে, রফিকুল ইসলাম তার কাছে কি চেয়েছিল আসলে! তার চাকুরে পিতার সঙ্গে রায়গঞ্জ ছেড়ে আসার কয়েক বছর পর সে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বান্ধবীর নিকট তার জীবনের এই রহস্যময় অধ্যায়টিকে উন্মোচিত করে বলেছিল, আমি জানি না কি চেয়েছিল সে। হোস্টেলের জানালার কাছে বসে পিঠের ওপর উপচে পড়া চুল ছেড়ে দিয়ে সে বলে যে, রায়গঞ্জে তার যেতে ইচ্ছে করেনি, তার পিতা যখন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থেকে বদলি হয়ে রায়গঞ্জ যায়, তখন, আবার নূতন এক অজ পাড়াগাঁয়ে যেতে তার খারাপ লেগেছিল; তারপর সে যখন শোনে যে তাকে ছেলেদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়তে হবে, সে ভয় পেয়ে যায়; কিন্তু তার চাকুরে পিতা তার জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারে না, ফলে তাকে যেতে হয় এবং ধানঘড়া স্কুলে বিজ্ঞানে ভর্তি হয়ে সে ক্লাস শুরু করে। এইখানে ইয়াকুব আলি, গিয়াসউদ্দিন, বছির এই সব নামের ভেতর সে একদিন দেখে যে, রফিকুল ইসলাম নামেও একজন আছে। জানালার আলোয় তার ফর্সা মুখে একধরনের হাসি ধরে রেখে সে তার বান্ধবীকে বলে, সে যে ক্লাসে আছে তা বুঝতেই পারি নাই, তারপর একদিন ক্লাসে যাওয়ার সময় কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে রাস্তায় দেখি, রফিকুল ইসলাম, এবং তখন ওর নাম আমার মনে পড়ে এবং বুঝতে পারি যে, ও গিয়াসউদ্দিন, ইয়াকুব আলিদের একজন; সেদিন তার সঙ্গে আমিই প্রথম কথা বলি এবং তখন সে আমাকে জানায় যে, সে সুহাসিনী নামে এক গ্রামে থাকে। জান্নাত আরা বলে যে, রফিকুল ইসলাম যেন তৈরি হয়েই ছিল, প্রথম দিন কথা বলার পর সে তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে এবং এটা বুঝতে পেরে তার ঘৃণা এবং ভয় দুটোই হয়; তার ঘৃণা হয়, কারণ, সে গ্রামের এই ছেলেটির ভেতর এক ধরনের সরল সাহস দেখতে পায়, তার মনে হয় যে, চাষার ছেলেটার স্পর্ধা আছে, থানার সবচাইতে বড় কর্মকর্তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চায়; অন্যদিকে তার একই সঙ্গে ভয় করতে থাকে, কারণ, সে রফিকুল ইসলামকে তার এই ঘৃণার অনুভূতির কথাটি কোনোভাবেই বলতে পারে না; এবং কেন তা সে পারে না, সেই সত্যটি জান্নাত আরার তখনই জানা ছিল, বহুদিন পর সে সেই সত্যটি তার বান্ধবীকে পুনরায় বলে, পুরুষ মানুষের এত রূপ আমি কোনোদিন দেখি নাই শিমুল। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে,

জান্নাত আরা জুলেখা ছিল কি না তা তারা বলতে পারে না, তবে রফিকুল ইসলামের সৌন্দর্যের কথা মনে হলে তাদের পুনরায় পূর্ণিমার চাঁদের উপমার কথাই মনে আসে; তারা বলে যে, এই ছেলে বড় হলে তার সৌন্দর্য হতো ইউসুফ নবীর মতোই এবং ইউএনও সাহেবের ঝকঝকে মেয়ে জান্নাত আরা এই রূপের জালে ধরা পড়ে, রফিকুল ইসলাম যদিও হয়তোবা তাকে ধরতে চায় নাই। গ্রামের লোকেরা বলে যে, জান্নাত আরা যখন খবর পায় যে, সুহাসিনী গ্রামের মফিজুদ্দিন এবং তার পরিবারের সকলে নিহত হয়েছে তখন তার বুকের ভেতর এমন এক শোক হয়, যার কোনো নাম নাই, এবং এই শোকের ভেতরও একটি ক্ষীণ আশা তার জেগে থাকে; সে কাউকে নির্দিষ্ট করে রফিকুল ইসলামের নাম জিজ্ঞেস করতে পারে না, পরদিন স্কুলের সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করে; কিন্তু পরদিন স্কুলে গিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেও সে বুঝতে পারে যে, আশা করার কিছু ছিল না, রফিকুল ইসলাম বেঁচে নেই; কারণ, সেদিন স্কুল শুরু সময় অ্যাসেম্বলিতে ছাত্র এবং শিক্ষকেরা রফিকুল ইসলামের স্মৃতি তর্পণ করে। সাধারণত সকালের অ্যাসেম্বলিতে মেয়েরা না এলেও এদিন তারা আসে এবং তখন সেখানে সমবেত গ্রামের স্কুলের ছাত্র এবং মাষ্টারদের কাছে অন্যান্য মেয়েদের ভেতর জান্নাত আরা কোনো বিদেশি ফুলের মতো ফুটে ওঠে এবং তার উপস্থিতির কারণে জাতীয় পতাকার দুপাশে মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাত্র এবং শিক্ষকদের এই শোকসভার চাপা দেয়া ভাবটি সহনীয় হয়ে আসে। এই সময় রফিকুল ইসলামের আত্মার জন্য দোয়া করা শেষ হলে, তার ক্লাসের সহপাঠী বন্ধুদের ভেতর থেকে কিছু বলার জন্য যখন কাউকে খোঁজা হয়, তখন সকলের চোখ আবার বালিকাদের ভেতর দাঁড়ানো জান্নাত আরার ওপর গিয়ে পড়ে এবং সে যখন প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে এগিয়ে এসে লাইন করে দাঁড়ানো ছাত্রদের মুখোমুখি হয়ে জাতীয় পতাকার কাছে দাঁড়ায়, সকলে এই প্রথমবারের মতো সচেতনভাবে খেয়াল করে যে, একটি রহস্যময় কালো শিফনের ওড়না তার বিষণ্ন মুখটি গোল করে ঘিরে আছে। ওড়না দিয়ে শোকের এ রকম মস্তকাবরণ রচনা করায় জান্নাত আরার বক্ষ অরক্ষিত হয়ে পড়ে এবং তখন, রফিকুল ইসলামের মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত শোকসভার দিনে ধানঘড়া স্কুলের বালক ছাত্রেরা জান্নাত আরার অদ্ভুত আঁধার জড়ানো মুখের রহস্যময় শোক এবং শৈত্য, এবং ফ্রকের উপরের অংশে নরম বাঁকানো চাঁদের মতো প্রকাশিত কাপড়ের ক্ষীণ একটি ভাঁজের উত্তাপের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে। জান্নাত আরার উপস্থিতির ফলে শোকের ভেতরেও যে চাঞ্চল্য হয়, একটু পরেই তা অপসৃত হয় এবং অ্যাসেম্বলিতে সমবেত ছাত্র এবং শিক্ষকেরা, মনে হয় যেন, এক নিবিড় বিষাদের ভেতর অবশেষে নিমজ্জিত হতে পারে। মৃদু বাতাসে অল্প কাঁপতে থাকা জাতীয় পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে জান্নাত আরা খুব স্বাভাবিক স্বরে কথা শুরু করে, সে বলে যে, রফিকুল ইসলাম ভালো ছেলে ছিল, সে মানুষের ভালো এবং মঙ্গলের জন্য ভাবত, এর পর জান্নাত আরা থামে, তার অস্তিত্বের ভেতর দ্রুত টান পড়ে যেন এবং

সে উচ্চ নিনাদ করে গ্রাম্য মেয়ের মতো কাঁদতে থাকে এবং তখন এই বালিকার রোদন ধ্বনির ভেতর রফিকুল ইসলামের কতিপয় সহপাঠীর চোখ পানিতে ভরে যায়। এভাবে ভেঙে পড়ার কারণ সম্পর্কে জান্নাত আরা পরে তার বান্ধবী শিমুলকে বলেও, সেদিন ধানঘড়া স্কুলের মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্র এবং শিক্ষকেরা কিছুক্ষণ পর তার জন্য বিচলিত হয়ে পড়ে, এবং তখন সে হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরে মাটির ওপর বসে পড়লে, শোকার্ত বালকদের চোখের সম্মুখ থেকে অলৌকিক দৃশ্যাবলি অপসারিত হয়ে যায় এবং রফিকুল ইসলামের মৃত্যুজনিত প্রবল শোকাচ্ছন্নতার ভেতরও তাদের মনে হয় যে, রোদের ভেতর তাদের খুব গরম লাগছে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, তখন কেউ গিয়ে জান্নাত আরার পিতাকে বিষয়টি সম্পর্কে জানালে সে তার দপ্তরের কাজ ফেলে গাড়ি নিয়ে চলে আসে। জান্নাত আরা যখন মাটির ওপর বসে হাতের ভেতর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদে তখন অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়ানো বালকেরা দেখে যে, তাদের মাঠের ওপর দিয়ে ইউএনও সাহেবের জিপগাড়ি ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে এসে নির্বাক সমাবেশটির সম্মুখে দাঁড়ায় এবং জান্নাত আরা কোনো কথা না বলে জিপে উঠে চলে যায়। কয়েক বছর পর ঢাকায় রোকেয়া হলে বসে জান্নাত আরা তার বান্ধবী শিমুলকে রফিকুল ইসলামের কথা বলে। শিমুল যদিও বুঝতে পারে না যে, জান্নাত আরা হঠাৎ করে ধানঘড়া নামক এক গ্রাম্য স্কুলের ছাত্র রফিকুল ইসলামের কথা কেন বলে, তবে তার মনে হয় যে, জান্নাত আরা হয়তো কথা খুঁজে না পেয়ে এমনি রফিকুল ইসলামের গল্প করে, অথবা এমনও হতে পারে যে, সে হয়তো এই গল্প বলতে চায় বলেই বলে, সে হয়তো শিমুলকে বিশ্বাস করে তার স্মৃতির গোপন দুয়ার খুলে দেয়। জানালা দিয়ে আসা আলোয় জান্নাত আরার চেহারায় কি রঙ খেলা করে, তার উচ্চারিত বাক্যে কি ধ্বনি বেজে ওঠে, শিমুল তা বুঝতে পারে না; জান্নাত আরা বলে যে, রফিকুল ইসলামকে তার পিতার সরকারি বাসভবনের সামনে যেদিন প্রথম দেখে তারপরে তার ক্রমান্বয়ে মনে হতে থাকে যে, রফিকুল ইসলাম এক অসাধারণ রূপবান বালক এবং একই সঙ্গে অসাধারণ বোকা। শিমুলকে সে বলে যে, ব্যাপারটা প্রেম ভালোবাসা জাতীয় কিছু ছিল না, তবে এটা কি ছিল তা সে বলতে পারে না; সে বলে যে, প্রথম দিন কথা বলার পরই রফিকুল ইসলামের সঙ্কোচ দূর হয়ে যায় এবং সে বুঝতে পারে না রফিকুল ইসলাম কি চায় এবং সে-ইবা কেন তার সঙ্গে সংযোগ ছেদ করতে পারে না, রফিকুল ইসলামের সৌন্দর্য, নাকি তার বোকামির অসাধারণ প্রকৃতি তাকে আগুন প্রদক্ষিণরত পতঙ্গের মতো আটকে রাখে। রফিকুল ইসলামের বোকামির বিশেষত্ব সম্পর্কে জান্নাত আরা সচেতন হয় সেদিন, যেদিন বিকেলে সে তাদের বাসায় এসে হাজির হয় এবং তারা নিচের তলায় ড্রয়িং রুমে বসে গল্প করে। সেদিন অল্প কিছুক্ষণ কথা বলার পর কি এক প্রসঙ্গে তাদের আলোচনার বিষয় মোড় নিয়ে ভারি হয়ে ওঠে এবং রফিকুল ইসলাম তাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলতত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে চলে, কিন্তু জান্নাত আরা তার কথা কিছুই

বুঝতে পারে না। সেদিন দুঘণ্টা পর রফিকুল ইসলাম যখন উঠে যায়, জান্নাত আরা সোফার ওপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, এবং তখন যেকোনো কারণেই হোক জান্নাত আরার কথা তার মা এবং অন্য ভাইবোনদের খেয়াল থাকে না, তাদের যখন তার কথা মনে পড়ে, তারা অন্ধকার ড্রয়িং রুমে এসে জান্নাত আরাকে অঘোর নিদ্রায় নিমজ্জিত দেখে। তখন জান্নাত আরার মায়ের রফিকুল ইসলামের কথা মনে পড়ে এবং জান্নাত আরাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলে তারও রফিকুল ইসলামের কথাই প্রথমে মনে আসে, তারপর সে তার মাকে বলে যে, রফিকুল ইসলাম তাকে পড়ায় সাহায্য করছিল, খুব কঠিন একটা বিষয় ছিল, পড়া বুঝতে বুঝতে তার ভীষণ ঘুম পেয়ে যায়। জান্নাত আরা শিমুলকে বলে যে, এর পরদিন অন্য একটি কাণ্ড ঘটে; এ দিন ক্লাসে রফিকুল ইসলামকে ইংরেজির শিক্ষক যখন দাঁড়া করায়, গালিভারকে যে কাঠের গাড়িতে করে লিলিপুটদের দেশের রাজধানীতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেই গাড়ির কটি চাকা ছিল, তা সে বলতে পারে না, তারপর সে ব্লেফাসকুদের ঝগড়ার কারণ কি ছিল তাও বলতে পারে না, ফলে তালেব আলি মাষ্টার তখন তার শাস্তি পাওয়ার ন্যায্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হয় এবং তাকে উঁচু বেঞ্চের ওপর উপুড় করে ঠেসে ধরে, বেরিয়ে আসা, লুঙ্গি ঢাকা নিতম্ব বাঁশের কঞ্চির আঘাতে, জান্নাত আরা এবং অন্য দুটো মেয়ের উপস্থিতিতে, জর্জরিত করে দেয়। রফিকুল ইসলাম এর আগে কখনো বেত খেয়ে কেঁদেছিল কি না জান্নাত আরার তা জানা ছিল না, তবে গালিভারের কাহিনী সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বেত খাওয়ার পর তালেব আলি মাষ্টার তখন তাকে ছেড়ে দেয়, সে উবু অবস্থা থেকে সিধে হয় এবং জান্নাত আরা তার মুখের দিকে তাকায়। সেই মুখের কথা জান্নাত আরার বহুদিন মনে থাকে, সে মুখে সেদিন শারীরিক বেদনার একটি স্থির নির্লিপ্ত রঙ মাখানো ছিল; তারপর রফিকুল ইসলাম যখন পুনরায় নিজের জায়গায় বসে তখন জান্নাত আরা তার চোখ থেকে নির্লিপ্ত মুখের ওপর দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে নেমে আসতে দেখে এবং ধানঘড়া হাইস্কুলের আধো-অন্ধকার ক্লাসরুমের ভেতর বসে জান্নাত আরার হৃদয় সেদিন প্রথমবার দ্বিখণ্ডিত হয়। তার পরদিন জান্নাত আরা ক্লাসে আসে না, তার পিতার পিওন এসে রফিকুল ইসলামকে শুধু এই খবরটা বলে যায় যে, জান্নাত আরা ক্লাসে আসবে না, তার জ্বর হয়েছে। রফিকুল ইসলাম কথাটা শুনে তার অন্য সহপাঠীদের খবরটা দেয়, তারপর সে বিষয়টা ভুলে যায়; অন্যদিকে তখন জান্নাত আরা স্কুল ছুটির সময় তার পিতার দোতলা কোয়ার্টারের উপরতলায় ব্যালকোনিতে বের হয়ে আসে এবং সেখানে সে নিজেকে এক প্রতীক্ষার ভেতর দাঁড়ানো দেখতে পায়। কয়েক বছর পর সে তার বান্ধবীকে বিষয়টি এই বলে ব্যাখ্যা করে যে, এটা তবুও হয়তো প্রেম কিংবা ভালোবাসা ছিল না, এটা হয়তো কিছুই ছিল না আসলে; এবং তখন হোস্টেলের আলোকিত জানালার সামনে বসে তার মনে পড়ে ধানঘড়ায় তার পিতার কোয়ার্টারের দোতলার বারান্দায় জ্বরতপ্ত দেহে তার সেই কাতর প্রতীক্ষার কথা এবং রফিকুল ইসলামের মৃত্যুর

পর স্কুলের অ্যাসেম্বলিতে কথা বলার সময় ভেঙে পড়ার কথা। সুহাসিনীর লোকেরা জান্নাত আরার গল্প এভাবে করে যে, জান্নাত আরা যেন ছিল এক ভিনদেশী পথহারা পাখি, সুহাসিনীর রফিকুল ইসলামের জন্য আকুল হয়ে কাঁদার জন্যই সে তার পিতার সঙ্গে রায়গঞ্জে এসেছিল। ধানঘড়া স্কুলের মাঠের ওপর তার ভেঙে পড়ার পর অন্য সকলে বুঝতে পেরেছিল যে, স্কুলের একটি বালক মরে যাওয়ায় তারা শোকার্ত; তারপর তার পিতা সরকারি জিপগাড়িতে করে এসে যখন ক্রন্দনরত এই বালিকা কিশোরীকে তুলে নিয়ে যায়, সেদিনের শোকসভা সাঙ্গ হয় এবং বিমূঢ় বিষণ্ন বালক-বালিকারা তাদের ক্লাসরুমে ফেরে। রফিকুল ইসলামের স্মৃতি এই বালকদের কাছে দ্রুত ম্লান হয়ে আসে এবং জান্নাত আরাও শীঘ্রই তার পিতার সঙ্গে রায়গঞ্জ ত্যাগ করে, তবে জান্নাত আরার পিতার সবুজ রঙের জিপটার কথা সকলের কেন যেন মনে থেকে যায় এবং এই জিপটি দেখলে তাদের প্রথমে ধানঘড়া স্কুলের মাঠের ওপর রোরুদ্যমান জান্নাত আরার কথ মনে পড়ে এবং জান্নাত আরার সেই কান্নার কথা মনে পড়লে তাদের সুহাসিনী গ্রামের মৃত রফিকুল ইসলামের কথা মনে পড়ে।

ক্যানভাসের হুড লাগানো উপজেলা পরিষদের এই জিপটিকে পরবর্তী সময়ে রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে যেতে দেখলে সুহাসিনীর লোকদের মফিজুদ্দিন মিয়ার কথাও মনে পড়ে, বস্তুত এই জিপ দেখলে তাদের মনের ভেতর এই কথা জেগে থাকে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার এই গাড়িতে চড়া হলো না; উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের পর জিপটির কর্তৃত্ব ইদ্রিস খাঁর অধীনে যায়, সে এই জিপে চড়ে রায়গঞ্জের বুকের ভেতর দিয়ে ক্রমাগতভাবে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে চলে। তখন সুহাসিনীর লোকদের পুনরায় পূর্ণিমা রাতের পরদিন সকালের কথা স্মরণে আসে, যখন অনির্দিষ্টকাল ধরে বেঁচে থাকা মফিজুদ্দিন মিয়ার লাশ তারা ছাই এবং ধ্বংসস্তূপের ভেতর গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারে যে, ম্যাসাবের কম্ম কাবার, তখন সেই সকালে আফজাল খাঁ এবং তার ছেলে ইদ্রিস খা মিয়াবাড়ির ভিটায় এসে ওঠে এবং সেখানে উপস্থিত সুহাসিনীর লোকেরা আফজাল খাঁর পাকা দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে দেখে; চোখের পানি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিতে নিতে সে এই বলে বিলাপ করে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া তার পিতার বন্ধু ছিল। সেদিন সুহাসিনীর লোকেরা ইদ্রিস খাঁকে কেমন নিশ্চুপ হয়ে থাকতে দেখে, এবং এর কয়েক দিন পর তারা জানতে পারে যে, ইদ্রিস খাঁ সিরাজগঞ্জ গিয়ে জেলা প্রশাসকের অফিসে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করে এসেছে, এবং তখন সুহাসিনীর লোকেরা এই কথা জানতে পারে যে, যেদিন পূর্ণিমার এক ভয়ঙ্কর চাঁদ উঠে মফিজুদ্দিন মিয়াকে ধ্বংস করে ফেলে, তার এক সপ্তাহ পর ছিল উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত দিন। তখন দুটো জিনিস গ্রামের লোকদের একসঙ্গে মনে হয়, তারা প্রথমত বুঝতে পারে যে, মফিজুদ্দিন

মিয়ার এই নির্বাচন করা হলো না, এবং দ্বিতীয়ত, প্রায় পঞ্চাশ বছর ক্রমাগত অপেক্ষা করার পর এবার তারা হয়তো ভোট দেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু সুহাসিনীর মানুষদের এই অপেক্ষার শেষ হয় না, কারণ, কয়েক দিন পর তারা জানতে পারে যে, উপজেলা চেয়ারম্যানের পদের জন্য মাত্র একটি মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়, সেটা ছিল ইদ্রিস খাঁর মনোনয়ন, ফলে ভোটের আর প্রয়োজন হয় না; ইদ্রিস খাঁ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। সুহাসিনীর লোকেরা যখন এ খবর পায় তারা তাদের দাড়িতে হাত বুলায় এবং বলে, ইদ্রিস খাঁ তাইলে চেয়ারম্যান হইলো; তারপর তারা নারকেলের খোলের হুঁকোর ফুটোয় ঠোঁট লাগিয়ে গুড়গুড় করে তামাক খায়, পাটের আঁশে পাক দিয়ে দড়ি বানায় অথবা কলাপাতা কেটে বাড়ির পেছনে পায়খানার বেড়া দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে; এবং এই সময়টায় মনে হয় যেন একটা বিষয়ে তারা অসচেতন প্রতীক্ষায় থাকে, সেইদিন পর্যন্ত, যেদিন সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া এবং তার পরিবারের লোকদের হত্যার অভিযোগে পুলিশ ইদ্রিস খাঁকে গ্রেফতার করে। গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, রায়গঞ্জ থেকে হেঁটে এসে পুলিশ যখন সুরধ্বনি গ্রামে আফজাল খাঁর বাড়িতে যায় তার ছেলে ইদ্রিস খাঁকে গ্রেফতার করার জন্য, তখন পুলিশের এই দলের নেতা, থানার বড় দারোগাকে ইদ্রিস খাঁ বলে, তাকে হাতকড়া না পরানোর জন্য। কিন্তু পুলিশ তার কথা শোনে না, তারা খাঁবাড়ির বৈঠকখানায় আরাম করে বসে চা-নাশতা খায় তারপর তাকে শুধু হাতকড়াই পরায় না, তার কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে, রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে আশপাশের গ্রামের লোকদের চোখের ওপর দিয়ে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে যায়, সেখান থেকে তাকে সিরাজগঞ্জ জেলহাজতে পাঠানো হয়। এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা, ছ মাস পর সুহাসিনীর লোকেরা ইদ্রিস খাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনে, যখন একদিন পুলিশ তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করার মতো না পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয় এবং সে উপজেলা পরিষদের সবুজ জিপে চড়ে রায়গঞ্জে ফিরে আসে। ইদ্রিস খাঁ রায়গঞ্জ উপজেলায় তার শাসন কায়েম করার পর প্রথম এক সপ্তাহ তার সদর দপ্তর ধানঘড়ায় থেকে যায়, তখন রায়গঞ্জের বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন গ্রামের লোক 'ইদ্রিস ভাই জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে ফুলের মালা নিয়ে উপজেলা কেন্দ্রে এসে হাজির হতে থাকে। এতে করে, ইদ্রিস খাঁ ধানঘড়ায় এসে ওঠার পর ধানঘড়ার জীবন মানুষের ভিড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, এবং এইসব মিছিলের সামনে ভাষণ দিতে দিতে তার গলার স্বর ভেঙে ক্রমান্বয়ে বসে যেতে থাকে, চোখের শিরায় রক্ত জমে লাল হয়ে ওঠে, গলায় ফুলের মালা পরতে পরতে চামড়ায় জ্বালা ধরে যায়। তার সহযোগী এবং শিস্যরা ক্রমাগত স্ফূর্তি এবং অনিদ্রায় কাতর হয়ে পড়ে; তারা প্রথমে অনুনয় করে, তারপর ইদ্রিস খাঁর পায়ে ধরে কেঁদে ফেলে, ম্যাবাই, সুরদ্ধনিত যায়া দুই একটা দিন থাইকা আসেন, মাইনষের মিছিল ইকটু কুমুক। তাদের কথা শুনে ইদ্রিস খাঁ রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকিয়ে ভাবে, কিন্তু সে ধানঘড়া থেকে নড়ে না, তার অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে

থাকে, গলার শব্দের অবশেষটুকু তিরহিত হয়, চোখের যন্ত্রণায় অশ্রু গড়াতে থাকে; তখন, এই অবস্থায়, সপ্তম দিন বিকেলে আব্দুল গাজি আর মুদিদোকানি তোরাপ আলির নেতৃত্বে সুহাসিনী থেকে একটি মিছিল এসে উপজেলা কেন্দ্রের মাঠে দাঁড়ায়। সুহাসিনীর কৃষকেরা তখন উপজেলা কেন্দ্রের দালানের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়ার প্রান্তে উপনীত ইদ্রিস খাঁকে একটি আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট দেখে; তখন তার সামনে সুহাসিনীর লোকদের দাঁড়ানো দেখে ইদ্রিস খাঁ তার শারীরিক বেদনা ভুলে হেসে ওঠে এবং পাঞ্জাবির পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ এবং কলম বের করে, এই কাগজে ইতোমধ্যে লেখা তেরোটি গ্রামের নামের নিচে চৌদ্দ নম্বরে লেখে সুহাসিনীর নাম; তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দুহাতে করতালির মতো শব্দ করে ফেসফেসে গলায় বলে ওঠে, এহন আমরা যামু। তখন, এই ঘোষণার পর, সুহাসিনীর মিছিলটির সঙ্গে রায়গঞ্জের নূতন উপজেলা চেয়ারম্যান ইদ্রিস খাঁ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সপ্তম দিনের বিকেলে ধানঘড়া ত্যাগ করে দলবল নিয়ে পূর্ব দিকে রওনা হয়; এই মিছিলটিকে অনুসরণ করে আসে তার গুবরে মাছির মতো সবুজ রঙের গাড়িটা। সেদিন জেলা বোর্ডের পুরনো চওড়া রাস্তা ধরে, ইদ্রিস খাঁকে সামনে রেখে এই মিছিল ক্রমাগতভাবে পূর্ব দিকে এগিয়ে যায় এবং সুহাসিনীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, এই রাস্তার পাশে নয়নতারার হাটের ওপর এসে থামে। সেখানে তখন ইদ্রিস খাঁ বহুদিনের পুরনো সেই বিশাল কড়ুই গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং তার চারদিকে জড়ো হয়ে থাকা মানুষদের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়ে বক্তৃতা করে, যে গাছের তলায় পঞ্চাশ বছরেরও আগে একদিন সুহাসিনীর কৃষকেরা মফিজুদ্দিনের চারপাশে ঘিরে এসেছিল এবং যে দিন নূতন মাটি কেটে উঁচু করা একখণ্ড জমির নাম রাখা হয় নয়নতারার হাট। বহু বছর পর পুরনো কড়ুই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ইদ্রিস খাঁর তার উন্মুক্ত করতলসহ ডান হাত, মনে হয় যেন একটি বৃক্ষের শাখার মতো সুহাসিনীর লোকদের মাথার ওপর প্রসারিত করে দেয়, সে সুহাসিনীর লোকদের তাদের জীবন এবং সম্ভাবনা, তাদের স্বপ্ন এবং বঞ্চনার কথা বলে; তারপর সে বলে যে, সুহাসিনীর মানুষের জীবনের উন্নয়নে সে সাহায্য করবে, এতদিন এই গ্রামে, এই ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নে, এই রায়গঞ্জে যে অনাচার হয়েছে সে তার সুরাহা করার চেষ্টা করবে। গ্রামের কৃষকদের সামনে হাত প্রবলভাবে আন্দোলিত করে সে ভাঙা গলায় চিৎকার করে, এখন, এই আইজক্যা থেইক্যা আমার কাম শুরু হইলো, এবং সে গ্রামের বিভ্রান্ত লোকদের এই কথা বলে যে, এই হাটের নাম একটি গণিকার নামে রাখা হয়, এটা মানুষের সভ্যতার, রুচির এবং ধর্মের অপমান। সে বলে যে, বেশ্যা কোনো ধর্মেই সম্মানিত নয়; তাই, সে বলে, আমরা এই হাটের নাম বদলায়া নতুন নাম রাখমু, এখন থেইক্যা এই হাটের নাম হইব রসুলপুরের হাট। গ্রামের লোকদের ভেতরে যারা বয়সে প্রবীণ তারা ঘোলাটে চোখে তাকায়, তাদের বহু বছর আগে এই হাট লাগানোর দিনের কথা মনে পড়ে, যখন তারা ছোট ছিল এবং পরে এ

সম্পর্কে শুনেছিল; সেদিন তার চতুর্দিকে ঘিরে আসা সুহাসিনীর মানুষকে মফিজুদ্দিন বলেছিল যে, এই হাটের নাম হবে নয়নতারার হাট এবং নয়নতারা একটি নষ্ট মেয়ে মানুষের নাম; সে বলেছিল, মা হইক কিম্বা না হউক, ম্যায়া মানুষ ম্যায়া মানুষই, ম্যায়া মানুষেক মাথায় কইর‍্যা রাইখপেন; এবং এই হাট লাগানোর পরে সেদিন সে পুনরায় আলি আসগর মিয়ার বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ায়।

নয়নতারা হাটের কড়ুই গাছতলায় সুহাসিনীর লোকদের দিকে হাত প্রসারিত করে এই হাটের নামের বিষয়ে যখন ইদ্রিস খাঁ তার মতামত প্রকাশ করে, তখন, তার সেই বিজয়ের ভেতরও, সুহাসিনীর লোকদের অবধারিতরূপে মফিজুদ্দিনের কথা মনে আসে। নয়নতারার হাট লাগানোর পর সে আলি আসগর মিয়ার রূপসী কন্যা চন্দ্রভানকে বিয়ে করে, এবং সুহাসিনীর লোকদের সেই সব ঘটনার কথা স্মরণ হয়; তারা বলে যে, রৌহার বিলের ধারে গভীর রাতে নিদ্রার ভেতরে ক্রিয়াশীল চন্দ্রভানের পরনের বস্ত্র পরিবর্তন করার পরদিন সকালে মফিজুদ্দিন যখন আলি আসগর মিয়ার কাছে চন্দ্রভানের বস্ত্র হরণের কথা বলে, আলি আসগর মিয়ার কাছে জিনের এই পুরো গল্পটাই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু নিজের উত্তেজনা ধরে রেখে সে যখন ভেতর বাড়িতে তার কন্যার ঘরের বন্ধ দরজায় গিয়ে আঘাত করে তখন ঝলমলে লাল কাপড় পরা চন্দ্রভান তার সামনে বাস্তব এবং স্বপ্নের এক অবিভাজিত রূপে প্রকাশিত হয়। আলি আসগর মিয়া কয়েক মুহূর্ত সম্বিৎরহিত হয়ে থাকে, তারপর উচ্চ স্বরে কলেমা শাহাদত পড়তে পড়তে সে চন্দ্রভানের দেহ থেকে দ্রুত সেই শাড়ি, ব্লাউজ এবং পেটিকোট অপসারণের ব্যবস্থা করে এবং এর একটু পর খুব বিচলিতভাবে সে সিরাজগঞ্জ রওনা হয়ে যায়। মফিজুদ্দিন সে সময় তার পিতার কুঁড়েঘরের সামনে বসে ক্রমাগতভাবে তামাক টেনে প্রতীক্ষা করে, কিন্তু মিয়াবাড়ির চাকরেরা তার জন্য কোনো বার্তা নিয়ে আসে না। মফিজুদ্দিন খুব হতাশ হয়ে পড়ে, তখন দুদিন পর আলি আসগর মিয়া সিরাজগঞ্জ থেকে ফিরে আসে এবং এ সময় একদিন অপরাহ্নে মফিজুদ্দিন তাদের জীর্ণ কুটিরের সামনে উঠোনের ছায়ায় আলি আসগর মিয়ার চাকরকে দেখতে পায়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করে ছিল, সে জানত যে এই ডাক আসবে, আলি আসগর মিয়ার চাকরের কাছে খবর পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ মিয়াবাড়িতে গিয়ে হাজির হয় এবং অপেক্ষমাণ আলি আসগর মিয়া তাকে সঙ্গে নিয়ে নির্জন বৈঠকখানায় প্রবেশ করে। এরপর তাদের দুজনকে আর কেউ দেখতে পায় না; মফিজুদ্দিন এই ঘরের ভেতর খুব অল্প সময় থাকে, তারপর একসময় গ্রামের লোকেরা দেখে যে, মফিজুদ্দিন মিয়াবাড়ির চৌচালা বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে হালকা এবং দীর্ঘ কদম ফেলে নিজের বাড়ির দিকে যায়। এই ঘটনার পরদিন হাটের মাটি কাটার কাজে ব্যস্ত যুবক এবং কিশোরদের কাজ চালিয়ে যেতে বলে মফিজুদ্দিন নিজে দুপুরের পর সিরাজগঞ্জ রওনা হয়। সে কাউকে

বলে যায় না তার সিরাজগঞ্জ যাওয়ার কেন দরকার পড়েছিল, একটানা সতেরো দিন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকার পর সে গ্রামে ফিরে এসে এক বিধ্বস্ত বোবা জন্তুর মতো পড়ে থাকে। তারপর একদিন পুনরায় উঠে দাঁড়ানোর পর যখন ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার নতুন হাট বসে এবং সে গ্রামের মানুষের সামনে বলে যে, এর নাম হবে নয়নতারার হাট, তখন নয়নতারাকে গ্রামের লোকেরা চিনতে না পারলেও তাদের মনে হয় যে, মফিজুদ্দিন যেন এক ঘোরের ভেতর ডুবে আছে, এবং তার এই ঘোরের ভেতর, তখন তার অস্তিত্ব জুড়ে জেগে আছে একটি নারীর নাম। গ্রামের মানুষ এই নারীটির কথা একসময় ভুলে যায়, তারা আবার হয়তো ভুলে যায়ও না; কারণ, সময় প্রবাহিত হতে থাকলে নয়নতারার প্রসঙ্গটি তাদের সামনে অল্প অল্প করে উন্মোচিত হয় এবং কালক্রমে তাদের পূর্ণরূপে জানা হয় এই নারীর বিষয়টি। গ্রামের লোকেরা ক্রমে এই বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় যে, নয়নতারাই মফিজুদ্দিনকে প্রথম বলে সে এক শ এগারো বছর বাঁচবে; কারণ, তারা শুনতে পায় যে, মফিজুদ্দিন গ্রামের কাউকে কাউকে এ কথা বলে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, যমুনার বুকে নৌকোর পেছনের গলুইয়ের কাছে মফিজুদ্দিন নগ্ন অবস্থায় চাটাইয়ের ওপর কাত হয়ে পড়েছিল, তখন তার কোমরের কাছে ঝুঁকে পড়ে নয়নতারা তাকে বলে, তুমি ভয় পাও ক্যা, তুমি একশ এগার বছর বাঁইচপা! গ্রামের লোকেরা বলে যে, গ্রামের ছেলেদের মাটি কাটার কাজ অব্যাহত রাখার কথা বলে, লুঙ্গির ওপর হাফহাতা শার্ট পরে পায়ে হেঁটে রওনা হওয়ার তিন ঘণ্টা পর, সন্ধ্যার পূর্বে বাহিরগোলা রেল স্টেশনের পাশ দিয়ে মফিজুদ্দিন সিরাজগঞ্জ শহরে প্রবেশ করে; তারপর সে শহরের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে উত্তর প্রান্তে আমলাপাড়ার কাছে পুনরায় শহরের বাইরে এসে পড়ে এবং নিকটের গয়লা গ্রামের দিকে যায়। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, গয়লা গ্রামে পৌঁছাই ছিল মফিজুদ্দিনের এই যাত্রার উদ্দেশ্য। শহরের এই প্রান্তের ইট বিছানো রাস্তা ত্যাগ করার পর সে মাটির কাঁচা রাস্তার ওপর এসে পড়ে, তখন আবছা অন্ধকার হয়ে আসা প্রান্তরের মধ্যে সে নিজেকে একা দেখতে পায় এবং এই মেঠোপথ ধরে যমুনার খোলা পাড়ের কাছে চলে আসে। নদীর কিনার দিয়ে দূরে ঝোপঝাড়ের মতো অন্ধকার গ্রামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়, নদীর পাড়ের সঙ্গে বাঁধা একটি মাঝারি আকারের ছৈ-তোলা নৌকো সে দেখতে পায়, এই নৌকোর ছৈয়ের নিচে একটি হারিকেনের বাতি জ্বলছিল এবং সামনের গলুইয়ের কাছে দুজন লোক বসে হুঁকো খাচ্ছিল। মফিজুদ্দিন দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে এবং নৌকাটির সামনে দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে মাঝিরা তাকে ডাক দেয়, কেডা যায়? কনে যাইবেন? মফিজুদ্দিন তখন পথচলায় ক্লান্ত ছিল এবং তার মনে শীঘ্রই চন্দ্রভানকে পাওয়ার সম্ভাবনার ঘোর ছিল, ফলে ডাক শুনে সে থামে এবং যমুনার পাড়ে পুবদিকে মুখ করে দাঁড়ায় এবং বলে, আমার নাম মফিজদ্দি, বাড়ি সুহাসিনী, আয়গঞ্জ। তখন মাঝিদের একজন মুখ থেকে হুঁকোর ফুটো সরিয়ে মফিজুদ্দিনকে তামাক সেবন করে

যাওয়ার আমন্ত্রণ করলে, সে তাদের নৌকায় উঠে আসে। তারা অনেকক্ষণ ধরে তামাক খায় এবং গল্প করে, তারপর একসময় মফিজুদ্দিন লক্ষ করে যে, মাঝিদের একজন পাড়ের উপর পুঁতে রাখা লগির সঙ্গে বাঁধা নৌকোর দড়ি খুলছে; কিন্তু তার পরেও, সন্দেহ করার কোনো কারণ না থাকায়, সে বেখেয়াল হয়ে থাকে, এবং সে যখন বিষয়টাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়, সে দেখতে পায় যে, নৌকা নদীর পাড় থেকে সরে এসেছে; তখন সে বিভ্রান্ত এবং বিচলিত বোধ করে এবং বলে, কি করেন; কিন্তু মাঝিরা তার কথার উত্তর দেয় না, নৌকা ভাটির দিকে ভেসে যেতে থাকে। মফিজুদ্দিনের বিভ্রান্তি তখনো কেটে না গেলেও সে ভয় পেতে শুরু করে, সে ভেবে দেখার চেষ্টা করে কি ঘটছে এবং সে এখন কি করবে, কিন্তু সে কিছু বুঝতে পারে না; যতক্ষণ সে হুঁকো হাতে বিমূঢ়ের মত বসে থাকে মাঝিরাও একজন হাল ধরে এবং অন্যজন তার গায়ের কাছ ঘেঁষে পাটাতনের উপর বসে অপেক্ষা করে, সে হুঁকোটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা মাত্র নিকটে বসে থাকা লোকটি তার লোমশ হাত দিয়ে তাকে জাপটে ধরে, অন্য লোকটি তখন কিছুক্ষণের জন্য স্রোতের মুখে নৌকা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে আসে। তারা দুজন বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মফিজুদ্দিনকে কাবু করে, তারপর পাটাতনের তল থেকে দড়ি বের করে পিছমোড়া করে তার হাত-পা বেঁধে ছৈয়ের নিচে ফেলে রাখে। এরপর আততায়ী দুজন হারিকেনের আলো নিভিয়ে দেয় এবং নৌকা দক্ষিণ দিকে নেমে শহরের কাছে সরে এসে অন্ধকারের ভেতর পুনরায় কূলে ভেড়ে। বৈঠা দিয়ে প্রহারের পরও মফিজুদ্দিন জ্ঞানরহিত হয় নাই, নৌকার লোক দুজনের কথাবার্তা অনুসরণ করে সে জানতে পারে যে, এদের ভেতর যে লোকটা হাল ধরেছিল তার নাম জোবেদ এবং অন্য লোকটির নাম হালাকু। নৌকা পুনরায় ভেড়ানোর পর হালাকু নৌকা থেকে নেমে যায় এবং মফিজুদ্দিন সঙ্গের লোকটিকে নিয়ে অন্ধকারের ভেতর পড়ে থাকে; মুখের ভেতর গামছা গুঁজে পেঁচিয়ে বেঁধে দেয়ায় সে কথা বলতে পারে না, তার মুখ দিয়ে শুধু অস্পষ্ট গোঙানোর শব্দ হয়। নৌকায় পেছনের গলুইয়ের ওপর হালের পাশে বসে থাকা লোকটি তার বিষয়ে উদাসীন হয়ে থাকে, তখন মফিজুদ্দিন পরিস্থিতির ভেতরকার সত্যটি উপলব্ধি করতে থাকে এবং সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে; সে বুঝতে পারে যে, আলি আসগর মিয়ার মেয়ে চন্দ্রভানকে তার আর বিয়ে করা হবে না, এই লোকগুলো শিগগিরই জবাই করে তার লাশ যমুনার বুকের কোনো অজানা চরে পুঁতে রেখে যাবে। তার মনে হয় যে, তাকে আসলে ইতোমধ্যেই শোয়ানো হয়েছে, তার আর উঠে দাঁড়ানো হবে না, হালাকু ফিরে আসার পরই হয়তো তার জীবন শেষ হবে; মফিজুদ্দিনের ভেতর তখন হঠাৎ অস্থিরতা দেখা দেয়, গামছার বাঁধনের নিচে তার মুখে ফেনা জমে; এক হতবিহ্বল ঘোরের ভেতর তার চেতনা লুপ্ত হয়ে আসে। এইসব ঘটনার কথা পরবর্তী সময়ে সুহাসিনীর লোকেরা টুকরো টুকরো আকারে ক্রমান্বয়ে জানতে পারে, এবং মফিজুদ্দিন অথবা নয়নতারা হাটের কথা মনে হলে

তাদের এইসব কথা স্মরণ হয়; তারা বলে যে, সেদিন কোনো এক সময়, মফিজুদ্দিন বলতে পারে না কোন সময়, হয়তো অনেক্ষণ পর, হয়তো অল্পক্ষণ পর, সে সেই দৃষ্টিরহিত অন্ধকারের ভেতর একটি নারীর কণ্ঠ শুনতে পায় এবং ছৈয়ের ভেতর থেকে সে দেখে, নদীর পাড় থেকে দুটো ছায়ামূর্তি নৌকার ওপর নেমে আসে, তারপর লোকগুলো পুনরায় নৌকা ছেড়ে দেয় এবং অস্পষ্ট চেতনার তল থেকে মফিজুদ্দিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত লোক দুজন এবং রমণীটির কথা বলা শোনে। পরদিন ভোর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে রমণীটির চেহারা দেখতে পায় না, সে তার কণ্ঠধ্বনি শোনে, মোটা ফেসফেসে এবং ভাঙা কণ্ঠস্বর মেয়েটার, হেসে উঠলে ভরা কলসির জলের ধ্বনির মতো শব্দের বলক ওঠে। মফিজুদ্দিন বুঝতে পারে যে, হালাকু মেয়ে মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে আছে এবং এভাবে অনেক্ষণ থাকার পর, সে মেয়েটাকে হালের বৈঠায় বসে থাকা জোবেদের পায়ের কাছে পাটাতনের ওপর শোয়ায় এবং তার কাপড় খুলে ছৈয়ের ওপর ছুড়ে দেয়। তখন, হয়তোবা হালাকুর শরীরের নিচে পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ার সময় এই নগ্ন গণিকার চোখ খোলা আকাশের দিকে চলে যায়, সেখানে নিকষ অন্ধকারের ভেতর সে দেখে যে, মানুষের চোখের মতো রাতের সব তারা জেগে আছে এবং তখন গণিকার ভেতর নারী জেগে ওঠে, সে বলে যে, এভাবে খোলা আকাশের তলে নয়। ছৈয়ের নিচে, ছৈয়ের নিচে, সে বলে এবং তার এই কথায় হালাকুর যদিও কর্ণপাত না করলেও চলত, তবুও সে মেয়েটির কথায় রাজি হয়। নগ্ন গণিকাকে তখন পাটাতনের ওপর রেখে নগ্ন হালাকু ছৈয়ের ওপর দিয়ে পার হয়ে নৌকোর সামনের দিকে এসে নামে এবং উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে ছৈয়ের তল থেকে হাত-পা বাঁধা মফিজুদ্দিনকে বস্তার মতো টেনে বাইরে খোলা আকাশের নিচে বার করে আনে এবং মফিজুদ্দিন যাতে পানিতে গড়িয়ে গিয়ে পড়তে না পারে সে জন্য পাটাতনের সঙ্গে তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধে, এবং তখন, মফিজুদ্দিনের চোখে পড়ে উবু হয়ে থাকা খুনির অণ্ডকোষ নক্ষত্র-জ্বলা আকাশের প্রেক্ষাপটে কালো এক জোড়া সুপারির মতো দোল খায়। মফিজুদ্দিনের তখন কি যে হয় তা সে বলতে পারে না, পরবর্তী সময়ে তার শুধু এ রকম মনে পড়ে যে, এই টানাহ্যাঁচড়ার সময় সে সম্ভবত শব্দ না করে চুপ করে থাকে এবং তখন মেয়েটি যখন জিজ্ঞেস করে যে, জিনিসটা কি, হালাকু উত্তর দেয়, আলুর বস্তা। মফিজুদ্দিনকে বাইরে রেখে হালাকু ছৈয়ের ভেতর প্রবেশ করে এবং মেয়েটি অন্য প্রান্ত থেকে শুয়ে থেকেই গড়িয়ে ভেতরে চলে আসে, তখন একটু পর নৌকাটি দুলতে থাকে এবং শোনা যায় চাপা শব্দ এবং হাসি। তখন সেই বিভীষিকার ভেতর শুয়ে থেকে একধরনের ঘোরের ভেতরও মফিজুদ্দিন এই সত্যটি বুঝতে পারে যে, এই মেয়েটির সঙ্গে খুনিদের মিথুন ক্রিয়া সমাপ্তির সময়টি হবে তার জীবনের প্রান্ত সীমা, কারণ, প্রবল আতঙ্কজনিত হতবুদ্ধিতার ভেতরও তার এ রকম মনে হয় যে, মেয়েটিকে ব্যবহার করার পর খুনি লোক দুটো তাকে নৌকোর কিনারায় রেখে জবাই করবে। হালাকু ছৈয়ের নিচে

প্রথমবার মেয়েটিকে টেনে নেয়ার কতক্ষণ পর নৌকার আন্দোলন থামে তা সে মনে করতে পারে না, তবে একসময় তা থামে এবং ছৈয়ের তলায় সব শব্দ বিলীন হয়ে গিয়ে নিথর নীরবতা নামে, এবং তার কিছুক্ষণ পর আবার পাটাতনের কাঠ মচমচ করে, ছৈয়ের নিচে দুজন নড়াচড়া শুরু করে, কথা শুরু হয় এবং মুক্ত হয় ভরা কলসির পানি ঢেলে দেয়ার শব্দের মতো ভারি হাসি। হালাকু এবং মেয়েটি ছৈয়ের নিচ থেকে বের হয়ে কাপড়চোপড় পরে জোবেদের সামনে পাটাতনের ওপর বসে এবং তখন মফিজুদ্দিন ভাবে যে, হাল ধরার দায়িত্ব হালাকুকে দিয়ে জোবেদ এবার মেয়েটিকে ছৈয়ের ভেতর নিয়ে ব্যবহার করবে এবং তার এই কাজ শেষ হলে তারা দুজন তার দিকে নজর দেবে; এই সময় মেয়েটি অশ্লীলভাবে হেসে ওঠে এবং মফিজুদ্দিন বুঝতে পারে যে, হালাকু পুনরায় মেয়েটিকে পাটাতনের উপর ফেলে বুকের তলায় চেপে ধরেছে। মেয়েটি মুখ বন্ধ করে গোঙাতে থাকে এবং নৌকা তোলপাড় করে; হালাকু তখন গণিকাটিকে অনাবৃত করে পুনরায় ছৈয়ের নিচে টেনে আনে এবং তখন, মফিজুদ্দিন বুঝতে পারে না যে, তার নিজের গামছাবাঁধা মুখ থেকেও চাপা গোঙানোর শব্দ বের হতে থাকে। হালাকু এবং জোবেদ সম্ভবত ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, তারা মফিজুদ্দিনের গোঙানোর শব্দ শুনতে পায় না অথবা পেলেও তারা হয়তো মনে করে যে, এই শব্দ মেয়েটির মুখ থেকে নির্গত, কিন্তু নদীর ঢেউ এবং পানিতে বৈঠার আঘাতের শব্দ এবং হালাকুর জ্বালাতনের ভেতরও মেয়েটি সম্ভবত মফিজুদ্দিনের গোঙানোর শব্দ শোনে, কারণ, সে বলে, ওইটা কিসের শব্দ? হালাকু তার নগ্ন শরীরের নিচে নগ্ন নারীদেহ অনুভব করতে করতে, নিজে কিছু না শুনলেও বুঝতে পারে মেয়েটি কিসের শব্দের কথা বলে; তখন মেয়েটি যখন পুনরায় বলে, বাইরে কি যানি নড়ে, হালাকু সেই অবস্থায় থেকেই সব বলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়, এবং বলে যে, বাইরে আলুর বস্তাই নড়ে এবং নিজের রসিকতায় নিজেই হাসে, তারপর আরো পরিষ্কার করে সে মেয়েটিকে জানায় যে, বাইরে পাটাতনের ওপর আসলে হাত-পা বাঁধা একটি লোককে ফেলে রাখা হয়েছে এবং এই লোকটিকে তারা পরে রামদা দিয়ে জবাই করবে। সে সময় হালাকু হয়তো মিথ্যে বলার প্রয়োজনীয়তা দেখে না, কারণ, তার হয়তো মনে হয় যে, একজন দরিদ্র বেশ্যার সঙ্গে আলুর বস্তা-বিষয়ক এই রসিকতার চাইতে বেশি কোনো সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই; হালাকু তার শরীরের নিচে এই স্খলিত নারীর উষ্ণতার ভেতর প্রবিষ্ট থেকে মফিজুদ্দিন সম্পর্কে তার বিশদ কথা অকপটে খুলে বলে। সে বলে যে, বাইরে সামনের গলুইয়ের কাছে পাটাতনের ওপর সে লোকটি পড়ে আছে তার জীবনের দাম তিন শ টাকা এবং সে গণিকা নারীর উপস্থিতিজনিত তার তুরীয়াবস্থার কারণে পুনরায় রসিকতায় লিপ্ত হয়, আলিঙ্গনাবদ্ধ নারীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে সে বলে যে, খুনে তার প্রয়োজন নাই, তার প্রয়োজন টাকার; সে বলে যে, এখন কেউ চার শ টাকা দিলে লোকটিকে তারা ছেড়ে দেবে। সুহাসিনীর লোকেরা পরে বলে যে মফিজুদ্দিনের সেই

বিপর্যয়ের সময় সহবাসরত খুনি এবং গণিকার এই আলাপের পর্যায়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, তখন মেয়েটির ভেতরকার নারী দ্বিতীয়বারের মতো জাগরিত হয় এবং হালাকুর কথা শুনে অন্ধকারের ভেতর পড়ে থাকা লোকটির জন্য তার হৃদয়ে করুণার প্রথম ধারা প্রবাহিত হয়; তার হাসি থেমে যায়, হালাকুর তৎপর শরীরের নিচে তার দেহ শিথিল হয়ে আসে এবং হালাকু যখন ছৈয়ের তল থেকে বের হয়ে যায়, সে তখনো ছৈয়ের ভেতর চিৎ এবং নগ্ন হয়ে নীরবে পড়ে থাকে; অনেক্ষণ এভাবে পড়ে থাকার পর, মনে হয় যেন, সে পুনরায় তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, ছৈয়ের তল থেকে সে দুই খুনির উদ্দেশে ইতর কথা ছুড়ে দেয় এবং নদীর ঢেউয়ের শব্দের ওপর দিয়ে তার তরঙ্গায়িত হাসি পুনরায় গড়িয়ে যায়। সেদিন ছৈয়ের তলায় জোবেদ যখন মেয়েটিকে নেয় তখন হালাকু গিয়ে নৌকার হাল ধরে এবং পুনরায় নৌকার দুলুনিতে মফিজুদ্দিনের চোখে অবশেষে নিদ্রা নেমে আসে। সুহাসিনীর লোকেরা এই গল্প যখন করে, তারা বলে যে, যমুনার বুকে সেদিন রাতে সকল আচ্ছন্নতার ভেতরও সে হয়তো ভেবেছিল যে, খুনিদের হাতের ভেতর ঘুমিয়ে না পড়ে জেগে থাকা প্রয়োজন; যদিও জেগে কি লাভ হবে, বা সে কি করতে পারবে, তা তার জানা ছিল না। সে রাতে নৌকার ক্রমাগত দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়ার পর পরবর্তী সকালে জেগে ওঠার আগ পর্যন্ত সে বুঝতে পারে না যে, সে ঘুমিয়েছে। পথ হাঁটার ক্লান্তি এবং নিহত হওয়ার উৎকণ্ঠায় জর্জরিত দেহ নিয়ে সে এক নিশ্ছিদ্র ঘুমের তলায় ডুবে থাকে; পরদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙে এবং সে চোখ খুলে তাকায়, তার চোখে নিচু হয়ে বয়ে যাওয়া ভোরের সূর্যের আলো স্পর্শ করে এবং তখন নড়াচড়া করতে গিয়ে সে বুঝতে পারে যে, নৌকোর পাটাতনের সঙ্গে তার পা-ও বেঁধে রাখা হয়েছে। গরুর মতো দড়ি-বাঁধা হয়ে থাকলেও রাতের ঘুম এবং ভোরের নরম বাতাসের স্পর্শে মফিজুদ্দিনের ভালো লাগে। সে বুঝতে পারে যে, নৌকোটিকে লগির সঙ্গে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এবং ঘাড় একটু উঁচু এবং কাত করে নিকটে ডাঙা না দেখে সে বোঝে যে মাঝনদীতে এখানে পানি কম, হয়তো কোমর সমান; এই অল্প পানিতে লগি পুঁতে নৌকো বেঁধে, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত লোক দুজন ঘুমিয়েছে। ঘাড় কাত করে সে ছৈয়ের নিচে তিনজন নিদ্রামগ্ন মানুষকে দেখতে পায়, সে দেখে যে, নৌকোর দৈর্ঘ বরাবর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা দুজন পুরুষের মাঝখানে একটি নারী, নদীর ক্রমাগত ঠাণ্ডা বাতাসে মফিজুদ্দিনের শীত লাগে এবং একসময় তার শরীরে কাঁপুনি ধরে। তখন হয়তো মফিজুদ্দিনের, পুনরায় তন্দ্রার ঘোর এসেছিল, তারপর একসময় সেই তন্দ্রা কেটে গেলে চোখ খুলে সে অন্ধকারের রমণীটিকে দেখে; সে দেখে যে, আগের দিন রাতে ছৈয়ের নিচে যে অদৃশ্য নারী দাপাদাপি করেছিল, সে ছৈয়ের মুখের কাছে বাইরে পাটাতনের ওপর তার খুব নিকটে এসে বসেছে। এই মেয়েটি তখন হয়তো চোখ বুজে কাত হয়ে পড়ে থাকা মফিজুদ্দিনকে দেখছিল, অথবা দেখছিল ধূসর বয়ে যাওয়া নদী, কিংবা সে হয়তো চোখ বুজে ছৈয়ের

মুখের কাছে হেলান দিয়ে ভোরের বাতাস এবং নরম রোদের ভেতর শুধু আরাম করছিল; তখন মফিজুদ্দিন পুনরায় চোখ খুললে, সে দেখতে পায়। মেয়েটি মফিজুদ্দিনের গামছা দিয়ে বাঁধা মুখ এবং বিভ্রান্ত ভীত চোখের দিকে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, জার নাগে? গণিকা মেয়েটির প্রশ্ন শুনে মফিজুদ্দিনের মনে হয় যেন, তার চেতনা নয় বরং তার দেহ স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে ঘাড় নাড়ে, মেয়েটি তখন উঠে গিয়ে নৌকোর ছৈয়ের ভেতর থেকে একটি কালো রঙের বস্ত্র এনে মফিজুদ্দিনের গলা থেকে কোমরের নিচ পর্যন্ত ঢেকে দেয়; মফিজুদ্দিন বুঝতে পারে যে, এটা এই মেয়েটার সায়া, আগের দিন রাতে হালাকু এটা খুলে তাকে অনাবৃত করেছিল, তারপর সে আর সায়া এবং ব্লাউজ পরে নাই। মফিজুদ্দিনকে পেটিকোট দিয়ে আবৃত করার পর মেয়েটি নৌকোর অন্য প্রান্তে গিয়ে বসে; এই নারীটি, হালাকু যাকে সিরাজগঞ্জ শহরের পতিতালয় থেকে এক রাতের জন্য পাঁচ টাকায় ভাড়া করে আনে, মফিজুদ্দিনকে তার নোংরা পেটিকোট দিয়ে ঢেকে শীতের কাঁপুনি থেকে রক্ষা করার সময়, অথবা পরে নৌকোর পেছনের গলুইয়ের কাছে পাটাতনের ওপর বসে থাকার সময়, কতগুলো বিষয় হয়তো ভেবে নেয়। কারণ, একটু সময় পর হালাকু এবং জোবেদ জেগে ওঠে এবং নৌকোর পাটাতনের তল থেকে মাটির আলো চুলা বার করে হালাকু যখন মাটির হাঁড়িতে ভাত বসায়, মেয়েটি তখন তার ছলাকলার পেখম বিস্তার করে এবং এক পর্যায়ে দেখা যায় যে, তার গলার ভেতর থেকে তরল জলের মতো গড়ানো হাসি পুনরায় প্রবাহিত হয় এবং হালাকুর পক্ষে খড়ির চুলোর ওপর বসানো ভাতের হাঁড়ির সামনে বসে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে; সে চুলোর পাশেই মেয়েটিকে কাত করে ফেলে দেহের নিচে চাপা দেয় এবং হালের বৈঠা টানায় ব্যস্ত জোবেদের চোখের সামনে দিনের প্রকাশ্য আলোতে মিথুন ক্রিয়া সমাপ্ত করে। মফিজুদ্দিন তখন মিথুনবিদ্ধ খুনি এবং গনিকার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল কিনা তা বোঝা যায় না, তবে সূর্যের সরাসরি আলো থেকে চোখ বাঁচানোর জন্য ঘাড় কাত করলে নৌকোর ছৈয়ের তল দিয়ে অন্য প্রান্তের এই দেহক্রীড়া হয়তো তার চোখে পড়ে। কিছুক্ষণ পর চুলো থেকে ভাতের হাঁড়ি নামানোর পর আলু ভর্তা করার সময় হালাকু যে কথা বলে তাতে বোঝা যায় যে, সে যখন দিবালোকে নারকীয় কায়দায় মেয়েটিতে উপগত হয়েছিল তখন তার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই; সে খিক খিক করে হেসে বলে যে, মফিজুদ্দিনকে সে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল; এর নাম মানুষ, সে বলে, আর একটু পরে শ্যাষ হয়্যা যাইব, কিন্তু এমন কইরা তাকায়া দেইখপ্যার নিছিল যানি ও-ই কাম হইরত্যাছে! হালাকুর কথা শুনে জোবেদ এবং হাসে মেয়েটি, মেয়েটি বলে, দিমু নাকি একবার শ্যাষ খাওয়ান খাওয়ায়া? এবং এভাবেই, পরবর্তী সময়ে মফিজুদ্দিনের মনে পড়ে, গণিকা নারীর এই খেলা অথবা বিস্তৃত পরিকল্পনার শুরু হয়; হালাকু তার প্রস্তাবে রাজি হয়, বোঝা যায় যে, গণিকা নারীর ব্যাপারে হালাকু এবং জোবেদের কোনো ঈর্ষাকাতরতা নাই। হালাকুর

রান্না করা ভাত তারা তিন জনে খাওয়ার পর মেয়েটি একটি সানকিতে করে ভাত নিয়ে গিয়ে মফিজুদ্দিনের সামনে বসে, পাটাতনের সঙ্গে মফিজুদ্দিনকে বেঁধে রাখা দড়ি খুলে দেয় এবং তাকে ছৈয়ের মুখের কাছে টেনে এনে ছৈয়ের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসায়, তারপর মুখের গামছা খোলে এবং দেখে যে, তার মুখের কোণায় থুতুর ফেনা জমে আছে। তখন, দিগন্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ধূসর নদীর বুকের ওপর দিয়ে তাদের নৌকো ক্রমাগতভাবে ভাটির দিকে নেমে যেতে থাকে এবং সেই বিস্তীর্ণ আকাশ এবং পানির মাঝখানে, নিঃসঙ্গ নৌকোর ওপর কৈশোর এবং যৌবনের সীমায় দাঁড়ানো মফিজুদ্দিনের বিস্ফারিত চোখ এবং বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে সিরাজগঞ্জ শহরের যুবতী পতিতার চোখ পানিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মফিজুদ্দিনের হাত পিছ-মোড়া করে বাঁধা থাকায় মেয়েটি ভাতের সঙ্গে আলু ভর্তা মাখিয়ে তার মুখে লোকমা তুলে দেয়; কিন্তু তখন, মেয়েটির এই আচরণে মফিজুদ্দিন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে, তার দেহে পুনরায় কাঁপুনি শুরু হয় এবং পাটাতনের ওপর কাত হয়ে পড়ে সে বোবা জন্তুর মতো গোঙায়, তার মুখ দিয়ে আবার লালা এবং ফেনা গড়াতে থাকে। পেছনের পাটাতনের ওপর বসে হালাকু হুঁকো সেজে তামাক টানতে শুরু করলে মেয়েটা ছৈয়ের মুখের কাছে সামনের পাটাতনের ওপর হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা মফিজুদ্দিনকে পুনরায় টেনে তুলে বসায়, তারপর কোমর ধরে টেনে ছৈয়ের তলায় নিয়ে যায়। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, এই গণিকা মেয়েটির মনে কি ছিল তা মফিজুদ্দিন কোনো দিনই বুঝতে পারে নাই; বহু বছর পরে বহুবার তার যখন সেই অসাধারণ দিন এবং রাত্রির কথা মনে পড়ে, সে শুধু বিস্মিত হয়ে থাকে; তার মনে হয় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই এমন ঘটনা ঘটতে পারে এবং সেই ভাড়া করা মেয়েটি, যে যমুনার বুকে নৌকোয় তার প্রতি আগ্রহী হয়েছিল, ছিল মায়ের মতো, প্রেমিকার মতো, করুণাময়ী ধরনীর মতো। কারণ, সে সময় বিভ্রান্তির এক চরম অবস্থার ভেতর থাকলেও মফিজুদ্দিনের মনে পড়ে যে, তার অবস্থা দেখে মেয়েটির চোখ প্রথমে পানিতে পূর্ণ হয়ে আসে, কিন্তু তারপর তাকে ছৈয়ের নিচে টেনে নেয়ার পর তার অন্য এক পরিচয় যেন প্রকাশিত হয়, এবং সেই পরিচয়ের প্রকৃতি মফিজুদ্দিন তার সমগ্র জীবনে নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। সেদিন ছৈয়ের তলায় টেনে নেয়ার পর মেয়েটা মফিজুদ্দিনের গায়ের শার্ট খুলে ফেলে, লুঙ্গি টেনে নামায়; পিছ-মোড়া করে হাত বাঁধা মফিজুদ্দিনকে সে চিৎ করতে পারে না, তখন সে কাত হয়ে থাকা মফিজুদ্দিনের দুই উরুর সন্ধিতে ডান হাত প্রবেশ করিয়ে দিয়ে একটি আতা ফলের মতো মফিজুদ্দিনের অণ্ডকোষসহ শিশ্ন করতলের ভেতর নেয় এবং তারপর ফিসফিস করে বলে, জুইম্যা একদম বরফ হয়্যা গেছে! এরপর মেয়েটি মফিজুদ্দিনের পাশে শুয়ে পড়ে এবং মা যেমন শিশুকে কোলের ভেতর নেয়, সেভাবে তাকে তার বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে রাখে। এভাবে তারা কতক্ষণ ছিল মফিজুদ্দিনের তা মনে পড়ে না, তার মনে হয় যে, রমণীটির আলিঙ্গনের ভেতর সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ, সে যখন পুনরায় সচেতন হয়

সে দেখে যে, মেয়েটি তাকে বুকের ভেতর নিয়ে শুয়ে নাই – সে উঠে বসে তার শীর্ণ নিতম্বে হাত বুলাচ্ছে। এই সময় মফিজুদ্দিন সেই তথ্যটি প্রথম জানতে পারে, যেটাকে সে এক অলঙ্ঘনীয় সত্য হিসেবে পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করে এবং যার ভ্রান্ততা বহু বছর পর এক পূর্ণিমা রাতে তার জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। সেদিন মফিজুদ্দিনের নগ্ন নিতম্বে হাত বুলানোর সময় মেয়েটি তার নিতম্বের কাছে ঝুঁকে আসে, মুখ নিচু করে চুমু খায়; তখন সে মফিজুদ্দিনের নিতম্বে আঁকা সেই চিহ্নটি দেখে এবং তার কানের কাছে মুখ এনে বলে যে, সে এক শ এগার বছর বাঁচবে, তার নিতম্বের ওপর কালো রঙে লেখা আছে, এক শ এগারো। সে বলে, ভয় পায়ো না, তোমাক মাইরব্যার পাইরব না কেউ; তারপর সে পুনরায় মফিজুদ্দিনের পাশাপাশি শুয়ে পড়ে এবং তার উরুর ফাঁক দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে বলে, বরফ! এই মেয়েটি পরবর্তী দুদিন একই জায়গায় তার করস্থাপন করে, তার বলা, এই বরফের অস্তিত্ব অনুভব করে এবং সতেরো দিন পর মফিজুদ্দিন যখন পুনরায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো সুহাসিনীতে এসে দাঁড়ায় এবং তার পিতার কুঁড়েঘরে কয়েক দিন মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, তখন সেই আতঙ্কের ঘোরের ভেতরও সে তার উরুসন্ধির জমাট শীতলতা টের পায়।

মফিজুদ্দিন গ্রামে ফিরে আসার পর গ্রামের লোকেরা যখন তা জানতে পারে, কিশোর এবং যুবকেরা তার কুঁড়েঘরের দরজায় এসে জড়ো হয় এবং তাকে মেঝেতে পাতা খড়ের ওপর আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকতে দেখে, তারা তখন তাকে নূতন হাটের বিষয়টি সম্পর্কে বলে, এবং তখন তার নয়নতারা এবং চন্দ্রভানের কথা মনে পড়ে। মফিজুদ্দিন তখন তিন দিন পর মেঝের খড়ের ওপর উঠে বসে এবং তার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু করিম খাঁকে কুঁড়েঘরের ভেতর ডেকে এনে তার সম্মুখে নিজের নিতম্ব উন্মোচন করে জানতে চায়, সেখানে কি লেখা আছে। তখন করিম খাঁ হয়তো প্রথমে একটু হতভম্ব হয়ে পড়ে, তারপর পাটখড়ির বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসা আলোয় মফিজুদ্দিনের নিতম্ব রেখে সে দেখে যে, তার কোমরের একটু নিচে, ডান দিকের নিতম্বে পাশাপাশি স্থাপিত তিনটি কালো জুড়ল। আকালুর কুঁড়েঘরের বাইরে দাঁড়ানো ছেলেদের যারা তখন ঘরের ভেতর উঁকি দেয়, তারা দেখে যে, ঘরের পূর্ব দিকের বেড়ার কাছে একটা চিকন আলোর রেখার সামনে মফিজুদ্দিন হাঁটু এবং হাতের ওপর উপুড় হয়ে লুঙ্গি তুলে নিতম্ব উন্মোচিত করে রেখেছে এবং এই নগ্ন পাছার খুব নিকটে মুখ নিয়ে করিম খাঁ স্তম্ভিত হয়ে আছে। মফিজুদ্দিনের নিতম্বের জড়ুলগুলোর দিকে তাকিয়ে করিম খাঁর মনে হয়েছিল যে, এগুলো আসলে জন্মদাগ; তখন মফিজুদ্দিন যখন তার নিতম্বের লিখন সম্পর্কে পুনরায় জানতে চায়, সে বলে যে, তার নিতম্বের ওপর একশ এগারো লেখা আছে। এরপর মফিজুদ্দিন ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় এবং সমাগত যুবকদের বলে যে, ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার তারা সুহাসিনীর হাট বসাবে এবং এই ছেলেরা ক্যানেস্তারা টিন নিয়ে

চতুর্দিকের গ্রামে ছড়িয়ে যাওয়ার পর সে করিম খাঁকে বলে যে, সে চন্দ্রভানকে বিয়ে করতে চায়। তারপর যেদিন সুহাসিনীতে হাট বসে মফিজুদ্দিন এই হাটের নামকরণ করে নয়নতারার হাট এবং জনতার ভিড়ের ভেতর দিয়ে পার হয়ে, সেই বিকেলে একা আলি আসগর মিয়ার প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ায়। সে সময় আলি আসগর মিয়া তার বৈঠকখানার সামনের বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে গরগরা হুঁকোয় তামাক সেবন করছিল, তখন সে চেক লুঙ্গির ওপর হাতাকাটা জামা গায়ে মফিজুদ্দিনকে তার বাড়ির ভিটায় উঠে আসতে দেখে; তার সামনে এসে দাঁড়ানোর পর মফিজুদ্দিন চুপ করে অপেক্ষা করে এবং আলি আসগর মিয়া হাতে ধরা নলের প্রান্তটা কিছুক্ষণের জন্য মুখে তুলতে ভুলে যায়; তারপর সে দ্রুত আত্মস্থ হয় এবং হুঁকোয় একটা হালকা টান দিয়ে বলে, ভিতরে আসো, এবং বাইরে হুঁকো রেখে মফিজুদ্দিনকে নিয়ে সে বৈঠকখানার ভেতর প্রবেশ করে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, বারান্দায় বসে হুঁকো টানতে ভুলে যাওয়ার সময়টিতেই আলি আসগর মিয়া তার নূতন ফন্দি আঁটে এবং বৈঠকখানার ভেতর ঢুকে চুপ করে থাকা মফিজুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলে যে, মফিজুদ্দিনের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে সে দেবে, তবে সে জন্য মফিজুদ্দিনকে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু মফিজুদ্দিন তার প্রস্তাবে রাজি হয় না, সে বলে যে, সেদিন বিকেলেই সে চন্দ্রভানকে বিয়ে করবে, আর এক দিনও সে অপেক্ষা করবে না, এবং আলি আসগর মিয়া যদি এতে সম্মত না হয়, তাহলে সে তার বন্ধু সেই জিনটাকে ব্যবহার করবে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, তখন, আলি আসগর মিয়ার সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকে না, সে অবস্থাটা বুঝতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তা মেনে নেয়। আলি আসগর মিয়ার সিদ্ধান্তের কথা শোনার পর মফিজুদ্দিন তার বুড়ো বাপ এবং বন্ধুদের নিকট ফিরে যায় এবং তখন, সেই বিকেলেই আকালুর ছেলে মফিজুদ্দিনের সঙ্গে চন্দ্রভানের বিয়ের কথা শুনে মিয়াবাড়ির অন্দর মহলে কান্নার রোল পড়ে। আলি আসগর মিয়ার স্ত্রী তাদের একমাত্র সন্তানকে এভাবে পানিতে ভাসিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চায় না, কিন্তু আলি আসগর মিয়া কোনো কথা না শুনলে সে কাঁদতে থাকে এবং চন্দ্রভান গিয়ে ঘরের দরজা দেয়। সেদিন সন্ধের পর মফিজুদ্দিন যখন তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে মিয়াবাড়িতে এসে হাজির হয় তখন দরজা ভেঙে চন্দ্রভানকে বার করা হয়, তারপর বৈঠখানার চৌকির ওপর পুরনো শাড়িপরা, কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলা চন্দ্রভানের বিয়ে পড়ানো হয়। জুম্মাঘরের ইমাম সাহেব বিয়ে পড়ানোর পর যখন মফিজুদ্দিনকে কবুল করতে বলে, সে অতিদ্রুত তা করে, তারপর একটা পর্দার আড়ালে বসা চন্দ্রভানকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, আকালুর ছেলে মফিজুদ্দিনের বিয়ের প্রস্তাবে সে রাজি কি না, তখন ময়লা শাড়ি জড়ানো চন্দ্রভানের ক্ষীণ দেহটি কেঁপে ওঠে, বসে থাকা অবস্থায় তার দেহটি ভাঁজ হয়ে আসে এবং গুমগুম করে তার আকুল কান্নার শব্দ শোনা যায়। তখন পর্দার এ পাশে বৈঠকখানায় জড়ো হওয়া যুবকেরা হর্ষধ্বনি করে বলে ওঠে, কবুল

কইরছে। সে রাতে আলি আসগর মিয়ার বাড়ির দক্ষিণদুয়ারি ঘরে মফিজুদ্দিনের বাসর হয়; রাতে খাওয়ার পর তার বন্ধুরা ফিরে গেলে সে সেই ঘরে প্রবেশ করে হারিকেনের আলোতে উঁচু খাটের ওপর এক কোণায় সেই পুরনো শাড়িপরা চন্দ্রভানকে বসে থাকতে দেখে, তখন মফিজুদ্দিন দরজায় খিল দেয়া মাত্র চন্দ্রভান চাপা আর্তনাদ করে ওঠে এবং মফিজুদ্দিন খাটের কাছে এগিয়ে এলে সে ফোঁপাতে থাকে; সে সময় সেই ক্রন্দনরত নারীর দিকে তাকিয়ে মফিজুদ্দিনের নয়নতারার কথা মনে পড়ে এবং তখন সে তার দুপায়ের মাঝখানে প্রস্তরের মতো শীতল এক অস্তিত্ব টের পায়। তখন মফিজুদ্দিন খাটের এক পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে এবং চন্দ্রভান তার দিকে তাকিয়ে ক্রমাগতভাবে নিচু স্বরে কাঁদে, তারপর অনেক রাতে কান্না থামিয়ে চন্দ্রভান ঘুমিয়ে পড়লে মফিজুদ্দিন গড়িয়ে গড়িয়ে তার গায়ের কাছে এগিয়ে যায় এবং তখন সে সেই গন্ধ পায়, যে গন্ধ সে কিছুদিন আগে রৌহার বিলের পাড়ে চন্দ্রভানের পরিত্যক্ত কাপড়ে পেয়েছিল। মফিজুদ্দিন তার বাসররাত নবপরিণীতা স্ত্রীর দেহের সৌরভ শুঁকে কাটাতে থাকে, সে তার উরুর ফাঁকে হাত দিয়ে অনুভব করে এবং নৌকোর উপরকার নারীর মতো করে উচ্চারণ করে, একদম বরফ! মফিজুদ্দিন তখন উঠে গিয়ে এক টুকরো কাপড় খোঁজে, কিন্তু সেই ঘরে কোনো কাপড় না পেয়ে সে নিজের পরনের লুঙ্গি খুলে ভাঁজ করে হারিকেনের মাথার ওপর ধরে গরম করে এবং এই গরম কাপড় দিয়ে তার জননেন্দ্রিয়ে সেক দেয়। পরদিন সকালে দরজায় করাঘাতের শব্দে চন্দ্রভানের ঘুম ভেঙে গেলে সে দেখে যে, খাটের ওপর নগ্ন মফিজুদ্দিন পড়ে আছে, পায়ের কাছে চার কোণা করে ভাঁজ করা রয়েছে তার লুঙ্গি; এই অবস্থায় উপায়ন্তর না দেখে সে পুনরায় চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে, যতক্ষণ না মফিজুদ্দিন উঠে তার লুঙ্গি পরে নেয়। নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকলেও চন্দ্রভান বুঝতে পারে যে, মফিজুদ্দিন তাকে রাতে ঘাঁটায় নাই এবং দ্বিতীয় রাতে মফিজুদ্দিন দরজায় খিল দিলে সে পুনরায় কান্না শুরু না করে খাটের এক কোণায় গুটিশুটি হয়ে পড়ে থাকে। পরদিন সকালে সে পুনরায় দেখে যে, মফিজুদ্দিন তাকে এদিন রাতেও ঘাঁটায় নাই, আগের দিনের মতোই সে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে এবং তার চারকোণা করে ভাঁজ করা লুঙ্গি মেঝের ওপর ফেলে রাখা। চন্দ্রভান বিষয়টা ভালোমতো বুঝতে পারে না, কিন্তু তৃতীয় রাতের পর সে যখন মফিজুদ্দিনকে একই অবস্থায় দেখে, এবং দেখে যে, সে তাকে কোনোভাবেই ঘাঁটায় নাই, তখন বড় রহস্যজনক কারণে তার মন খারাপ হয়ে যায় এবং সারা দিন তার মুখ কালো হয়ে থাকে। চতুর্থ রাতেই কেবল চন্দ্রভান বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারে, যখন খাটের ওপর এক কোণায় পড়ে থাকার সময় তার ঘুম আসে না এবং সে মফিজুদ্দিনকে খাট থেকে উঠে গিয়ে হারিকেনের তাপে লুঙ্গি গরম করে সেক দিতে দেখে। বিস্মিত চন্দ্রভান এ কাজের অর্থ বুঝতে পারে না, খাট থেকে নেমে মফিজুদ্দিনের সামনে সে যখন দাঁড়ায়, মফিজুদ্দিন শুকনো কণ্ঠে বলে, ভয় পায় জুইমা গেছে; তখন চন্দ্রভান মফিজুদ্দিনের কাজটা নিজের হাতে তুলে নেয়,

ঘরের মেঝেতে নিচু টুলের ওপর বসা মফিজুদ্দিনের সামনে সে হাঁটু গেড়ে বসে এবং জ্বলন্ত হারিকেনের ওপর পরনের শাড়ির আঁচল গরম করে স্বামীর বীজভাণ্ডার সেক দিয়ে উত্তপ্ত করে তোলে, এবং পরিণতিতে সেদিন শেষ রাতে সে গর্ভবতী হয়। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, বিয়ের চতুর্থ রাতে চন্দ্রভান গর্ভধারণ করে এবং তার দুদিন পর গভীর রাতে মফিজুদ্দিনের ঘুম ভেঙে গেলে সে দেখে যে, তার বিছানায় নববধূ এবং অন্তঃসত্ত্বা চন্দ্রভান নাই, ঘরের দরজার কপাট হাঁ-করে খোলা। মফিজুদ্দিন এক মুহূর্তের জন্য ভয় পায়, তারপর সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে, এবং তা বুঝতে পারার পর তার অন্য এক ধরনের অনিশ্চিত আতঙ্ক হয়; সে বুঝতে পারে যে, তার চালাকির দিন শেষ হয়ে গেছে, চালাকি করে আলি আসগর মিয়ার মেয়েকে বিয়ে করা গেলেও তাকে সে ঘরে রাখতে পারে নাই। মফিজুদ্দিন সেই রাতে, তখন, ঘর থেকে বের হয়ে উঠোনে নামে এবং দেখে যে, ভেতরের প্রাঙ্গণের বেড়ার দরজা খোলা; সে বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে রৌহার বিলের দিকে রওয়ানা হয়। রৌহার বিলের কাছে মফিজুদ্দিন যখন পৌঁছোয়, চন্দ্রভান তখন পাড়ের ওপর কাপড়-চোপড় ছেড়ে পানিতে নেমে গেছে; তখন মফিজুদ্দিন আগের সেই পুরনো জায়গাটিতে গিয়ে বসে এবং তার সম্মুখে তার বিবসনা স্ত্রী অন্ধকার কালো পানিতে ডুব দেয়া শেষ করে উঠে আসে। ফেরার পথে মফিজুদ্দিন, লঘু এবং দ্রুত পায়ে অগ্রসরমাণ তার নিদ্রিতা স্ত্রীর পেছন পেছন আসতে থাকে, ফলে একটু পরেই সেদিন তার আর এক বিপত্তি ঘটে, চন্দ্রভান দ্রুত বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে উঠোনের গেট লাগিয়ে দিলে মফিজুদ্দিন বাইরে পড়ে যায়, তারপর সে বেড়ার এক কোণার বাঁধন খুলে ভেতরে প্রবেশ করে কিন্তু চন্দ্রভান ততক্ষণে ঘরের দরজা লাগিয়ে স্বাভাবিক নিদ্রায় ফিরে গেছে। তখন ঘরে ঢুকতে পারার কোনো উপায় না দেখে মফিজুদ্দিন অবশিষ্ট রাত গোয়ালঘরের পাশে খড়ের গাদার ওপর শুয়ে কাটায় এবং সকালবেলা বাড়ির চাকরেরা যখন খড়ের গাদার ভেতর নূতন জামাইকে শুয়ে থকতে দেখে, তখন মিয়াবাড়িতে এই কথা নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয় যে, তুলোর তোশকে শুয়ে মফিজুদ্দিনের চার পাঁচ দিন চোখে ঘুম আসে নাই, অবশেষে সে নূতন বৌ ঘরে ফেলে গোয়ালঘরে গিয়ে ঘুমের তৃষ্ণা মেটায়। সেদিন সকালে চন্দ্রভান যখন দরজা খুলে বের হয় সে খেয়াল করে না যে, মফিজুদ্দিন ঘরে নাই, তারপর সে যখন শোনে যে, মফিজুদ্দিন রাতে গোয়ালঘরের পাশে খড়ের গাদার ভেতর ঘুমিয়ে ছিল তখন তার মনে হয় যে, সকালে ঘরের দরজা আসলে হয়তো খোলাই ছিল এবং সে যখন শোনে যে, তুলার তোশকে শুতে তার কষ্ট হচ্ছিল তখন সে তার চাকরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তোশক তুলে ফেলে দেয় এবং খাটের ওপর পুরু করে খড় পেতে তার ওপর কাঁথা বিছিয়ে শয্যা রচনা করে মফিজুদ্দিনের খোঁজে বের হয়। কিন্তু মফিজুদ্দিনকে তখন মিয়াবাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় না, চন্দ্রভানের খড়ের শয্যা রচনাবিষয়ক কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার আগেই মফিজুদ্দিন চান্দাইকোনা রওনা হয়ে যায়। চান্দাইকোনা বাজারের উত্তর প্রান্তে

ইয়াকুব আলি মৌলবির বাড়িতে গিয়ে মফিজুদ্দিন, মৌলবি সাহেবকে বাড়িতে পায় এবং সে তাকে তার দুর্গতির কথা খুলে বলে। মৌলবি ইয়াকুব আলি সবকিছু শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে যে, মাফিজুদ্দিনের স্ত্রীর আচরণের ব্যাখ্যা করা খুবই মুশকিল, হয়তো খুবই দুষ্ট কোনো জিন আসর করেছে এবং এই জিনই তাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যায়। ইয়াকুব মৌলবি তখন মফিজুদ্দিনকে তার বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিয়ে রেখে বাড়ির ভেতরে যায় এবং কিছুক্ষণ পর একটি নূতন মাটির হাঁড়িতে করে, দোয়া পড়ে ফুঁ দেয়া পানি নিয়ে আসে এবং মফিজুদ্দিনকে বলে, প্রত্যেক দিন রাইতে শুইতে যাওয়ার আগে তোমার বৌয়ের গায়ে ছিটায়া দিব্যা। মফিজুদ্দিন এই পড়া-পানির জন্য ইয়াকুব আলি মৌলবিকে দুআনা পয়সা দেয়, তখন সে বলে যে, মফিজুদ্দিন যদি একই সঙ্গে তাদের বাড়িটা বন্ধ করে নেয়, তাহলে আরো ভালো হয়। মফিজুদ্দিন তার এ প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং ইয়াকুব মৌলবি তখন তার কাছ থেকে আরো দুআনা নিয়ে পুনরায় বাড়ির ভেতর যায় এবং চারটে মন্ত্রপূত গজাল নিয়ে আসে। ইয়াকুব মৌলবি গজালগুলো মফিজুদ্দিনকে দেয় এবং বলে দেয় এগুলো সে কিভাবে ব্যবহার করবে; মফিজুদ্দিন কলার পাতায় মুখ ঢাকা মাটির হাঁড়িতে করে পড়া-পানি এবং জামার পকেটে কালো রঙের চারটে ভারি লোহার গজাল নিয়ে সকালের সূর্য বেশি দূর ওঠার আগেই সুহাসিনীতে ফিরে আসে। গ্রামের লোকেরা এই সব বিষয়ে কিছু কিছু কথা জানতে পারে, তবে তারা বুঝতে পারে না যে, তারা যা শুনেছে তা সত্যি না মিথ্যা; তারা এসবের সত্যতা যাচাইও করতে পারে না, কারণ, এইসব ঘটনার মূল ব্যক্তিবর্গ মফিজুদ্দিন চন্দ্রভান এবং আলি আসগর মিয়া, তাদের কাউকে তারা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে না, কেউ কেউ সাহস এবং কায়দা করে জিজ্ঞেস করলেও তারা কোনো নির্দিষ্ট উত্তর দেয় না। গ্রামের লোকেরা এই বিষয়টি জানতে পারে যে, মফিজুদ্দিন তার বিয়ের পর চতুর্থ রাতে চন্দ্রভানের কৌমার্যের পর্দা খোলে, ষষ্ঠ রাতে তুলোর তোশকের আরাম ত্যাগ করে গিয়ে গোয়ালঘরের পাশে খড়ের গাদায় ঘুমায় এবং সপ্তম দিন রাতে বাড়ির ভিটার চার কোণায় দোয়া পড়া গজাল পুঁতে দিয়ে বাড়ি বন্ধ করে, তারপর ঘরে এসে শোয়ার সময় মাটির একটি নূতন হাঁড়ির ভেতর থেকে পানি নিয়ে তার গর্ভবতী স্ত্রী চন্দ্রভানের মাথায় এবং শরীরে ছিটিয়ে দেয়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, গজাল পুঁতে দিয়ে এবং দশ দিন, রাতে চন্দ্রভানের গায়ে পানি ছিটানোর পর মফিজুদ্দিন নিশ্চিত বোধ করে, যদিও তা খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। এক মাসের মতো কেটে যাওয়ার পর একদিন সে দেখে যে, তার খড়ের বিছানায় চন্দ্রভান নাই এবং সেদিন তখন সে উঠে গিয়ে পুনরায় রৌহার কালো শীতল পানিতে চন্দ্রভানকে দেখে। পরদিন মফিজুদ্দিন পুনরায় চান্দাইকোনায় ইয়াকুব আলি মৌলবির বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়, ইয়াকুব আলি মৌলবি মফিজুদ্দিনের নিকট থেকে সব শুনে পুনরায় নিশ্চিত হয় যে, খুবই দুষ্ট জিনের পাল্লায় পড়েছে মফিজুদ্দিনের স্ত্রী এবং সে পুনরায় দুআনা পয়সা নিয়ে তাকে আর-এক হাঁড়ি

পানি দেয়, কিন্তু এবার সে বাজার থেকে মফিজুদ্দিনকে একটি তালা কিনে নিয়ে যাওয়ার উপদেশ দিয়ে বলে, রাইতের বেলা কপাটে তালা দিয়্যা রাইখো। মফিজুদ্দিন ধানঘড়া বাজার থেকে তালা এবং দরজার ভেতর দিকে লাগনোর জন্য এক জোড়া কড়া কিনে আনে এবং সুহাসিনীর লোকেরা এই কথা জানতে পারে যে, মফিজুদ্দিন তুলোর আরামের বিছানা ছেড়ে খড়ের বিছানায় সুন্দরী চন্দ্রভানকে নিয়ে শোয় আর কেউ যাতে খিল খুলে ঘরে ঢুকতে না পারে সে জন্য রাতে শুতে যাওয়ার আগে ঘরের ভেতর থেকে কড়ায় তালা লাগিয়ে রাখে। ঘরের দরজায় ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে এবং খড়ের বিছানায় শুয়ে মফিজুদ্দিনের পুনরায় ভালো ঘুম হতে থাকে; কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলে যে, সে পুনরায় তার অশান্তি খুঁজে বার করে, কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন তার মনে হয় যে, চন্দ্রভান যদি এই জিনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ভালো হয়ে যায় তাহলে সে কিভাবে তা বুঝবে? এবং এরপর থেকে মফিজুদ্দিনের ঘুম কমে যেতে থাকে, সে বুঝতে পারে যে, ঘুমের ভেতরও সে সজাগ হয়ে আছে এবং লক্ষ রাখছে চন্দ্রভান উঠে তালা দেয়া দরজার কাছের যায় কি না তার দিকে। এই আধো ঘুম আধো জাগরণের দিনগুলোতে সে দেখে যে, তালা লাগানো শুরু করার পর চন্দ্রভান দুদিন বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করে এবং তা করতে না পেরে পুনরায় বিছানায় ফিরে এসে শোয়। কিন্তু এই পাহারাদারি করতে গিয়ে মফিজুদ্দিনের শরীর ভেঙে পড়ে, বিয়ের পরের কিছু দিনে তার চেহারায় যে ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছিল তা নিদ্রাহীনতার কারণে দ্রুত নেমে যায় এবং ম্লান হয়ে ওঠে, তার চোখের কোণে কালি পড়ে এবং তাকে দেখা যায় দিনের বেলায় ঝিমোতে; তার শারীরিক অবস্থার এই অবনতিতে গ্রামের যুবকেরা শঙ্কিত হয় এবং চন্দ্রভান লজ্জা ও ভয়ে মুষড়ে পড়ে। তখন একদিন বিকেলে মফিজুদ্দিন অস্থির হয়ে তৃতীয় বারের মতো চান্দাইকোনায় ইয়াকুব মৌলবির কাছে ছুটে যায় এবং পুনরায় সব খুলে বলে। মফিজুদ্দিনের এই অসাধারণ ব্যক্তিগত সমস্যার যে সমাধান সেদিন ইয়াকুব আলি মৌলবি উদ্ভাবন করে, বহুদিন পর সুহাসিনীর লোকেরা তা ক্রমান্বয়ে জানতে পেরে চমৎকৃত বোধ করে; মফিজুদ্দিনের সমস্যার কথা শুনে সে অনেকক্ষণ ধরে ভাবে এবং একসময় উঠে বাড়ির ভেতর গিয়ে একটি কাচের বোতলে কালচে বাদামি রঙের কিছু একটা নিয়ে ফিরে আসে এবং মফিজুদ্দিনকে বলে, এ্যার ভিতর তিসির ত্যাল আছে; তারপর সে মফিজুদ্দিনকে কিছু পরামর্শ দেয় এবং বোতল আর তেলের জন্য এক আনা পয়সা নিয়ে, আল্লা মাবুদ রহম করো, বলে উঠে ভেতরে চলে যায়। সেদিন রাতে মফিজুদ্দিন ভেতর থেকে দরজার কপাটে তালা লাগানোর পর তার স্ত্রীকে যা বলে তা হচ্ছে এই যে, চন্দ্রভান কোনো অবস্থাতেই এই তালার গায়ে হাত দেবে না, সে যদি সকালে মফিজুদ্দিনের আগে ঘুম থেকে ওঠে, তাহলে সে নিজে তালা না খুলে মফিজুদ্দিনকে ডেকে তুলবে; এবং তখন চন্দ্রভান মফিজুদ্দিনের কথায় চিন্তাভাবনা না করেই সম্মত হয় এ কারণে যে, সে জানে সে কখনোই মফিজুদ্দিনের আগে ঘুম থেকে

উঠবে না। এরপর থেকে গ্রামের লোকেরা মফিজুদ্দিনের উদ্ভট দাম্পত্য আচরণের সর্বশেষ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারে, এবং তারা দেখে যে, মফিজুদ্দিনের চেহারায় রঙ ফিরে আসে, চোখের কোণের কালি মুছে যায়। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মিয়াবাড়ির চাকরেরা তাদেরকে এইসব কথা বলে; তারা তাদেরকে বলে যে, কোনো কোনো সকালে মফিজুদ্দিনের শোবার ঘরের জানালার কপাট খোলা থাকলে এবং সেই খোলা জানালা দিয়ে তারা ভেতরে তাকালে কখনো কখনো তারা এমন এক দৃশ্য দেখতে পায়, যা দেখে তাদের যুগপৎ বিস্ময় জাগে এবং হাসি পায়। কোনো কোনো সকালবেলা খোলা জানালা দিয়ে তারা দেখতে পায় যে, খাটের ওপর খড়ের বিছানায় নিদ্রিতা চন্দ্রাভান একটি ছিন্নলতার মতো পড়ে আছে এবং তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে মফিজুদ্দিন, তার করতলের ভেতর চন্দ্রভানের কর এবং সে অনেকক্ষণ ধরে বারবার নিচু হয়ে নিদ্রিতা চন্দ্রভানের এই কর শোঁকে। চন্দ্রভানের সঙ্গে মফিজুদ্দিনের এই আচরণে মিয়াবাড়ির চাকরেরা এবং তাদের কাছ থেকে এই গল্প শুনে গ্রামের লোকেরা রোমাঞ্চিত বোধ করে, তাদের মনের ভেতর অনেক প্রশ্ন জমা হয়, কিন্তু এইসব গোপন দাম্পত্য ক্রিয়ার বিষয়ে তাদের গোপন প্রশ্নের উত্তরের জন্য বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়। মফিজুদ্দিন প্রতিদিন সকালে নিদ্রামগ্ন স্ত্রীর দুহাতের তালু কুকুরের মতো শুঁকে দরজার তালা খুলে বাইরে বের হয় এবং বাড়ির পেছনের জঙ্গল থেকে নিশিন্দার ডাল ভেঙে মেছওয়াক করতে করতে সেইসব চাকর এবং গ্রামবাসীর সম্মুখ দিয়ে পুকুরের দিকে যায়, যারা তার এই অতিবিস্ময়কর আচরণের ব্যাখ্যাটি বোঝার জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না। এভাবে মফিজুদ্দিনের, চন্দ্রভানের হাত শোঁকার বিষয়টি যখন গ্রামের প্রায় প্রতিটি লোকের জানা হয়ে যায় তখন একদিন চন্দ্রভান একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে এবং মফিজুদ্দিন তার প্রথম ছেলের নাম রাখে আব্দুল গফুর। আব্দুল গফুর পৌষের এক সকালে জন্ম নেয় এবং এর প্রায় এক বছর পর মিয়াবাড়ির চাকরেরা মফিজুদ্দিনের আচরণের বদল হতে দেখে এবং এবারও এই পরিবর্তনের কারণ তারা বুঝতে পারে না; তারা একদিন একে অন্যের নিকট থেকে জানতে পারে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া তার শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে রাখার নিয়ম ত্যাগ করেছে, এবং সকালবেলায় তাদের ভেতরকার সাহসী চাকরেরা, যারা জানালা দিয়ে নজর ভেতরে রেখে গরুর জাবনা বানায় তারা মফিজুদ্দিনকে হাঁটু গেড়ে বসে ঘুমন্ত স্ত্রীর হাত শুঁকতে দেখে না। গ্রামের লোকেরা একসময় এই খবরটি জানতে পারে এবং তাদের মনে স্বাভাবিকভাবে অনেক প্রশ্ন দেখা দেয় এবং তাদের এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্যও তাদেরকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। বহুদিন পর সুহাসিনীর লোকেরা, যারা তাদের শৈশবে মফিজুদ্দিনের এইসব কাণ্ডের কথা শুনেছিল, তারা এর ব্যাখ্যা এবং চন্দ্রভানের জীবনের এক রহস্যের কথা জানতে পারে। ভাদ্র মাসের বিপর্যয়কর পূর্ণিমা রাতের কিছুদিন আগে, একদিন খুব সকালে

সুহাসিনীর কিছু লোক, যারা মিয়াবাড়ির পেছন দিকে ঘাটের কাছে খালে নৌকো নিয়ে যায়, তারা এই ঘাটের কাছে পানি ছুঁয়ে একটি নগ্ন নারীদেহ পড়ে থাকতে দেখে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটির লম্বা চুল দেখে তারা বুঝতে পারে যে, এটা একটি নারীর দেহ; কিন্তু নিতম্ব, পিঠ এবং উরু দেখে তারা বুঝতে পারে না, এই নারী দেহটি যুবতী, না বৃদ্ধার। এই ঘটনার পর গ্রামের লোকেরা চন্দ্রভানের পুরনো আচরণগত রহস্যের কথা জানতে পারে, তারা জানতে পারে যে, খালের ঘাটের কাছে যে নারীদেহটি পড়ে ছিল সেটা ছিল আসলে চন্দ্রভান; সেদিন সে মনে নাই, পানির কিনারায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল কেবল, এবং বহুদিন পরে সেদিন রাতে বৃদ্ধ মফিজুদ্দিন মিয়া তার কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকের ভেতর থেকে একটি জং ধরা তালা এবং একটি পুরনো কাচের বোতল বের করে। মফিজুদ্দিন সেদিন তার ছেলেদের সামনে তাদের মা এবং এই তালা ও তিসির তেলের বোতলের রহস্য সম্পর্কে সকল কথা বলে এবং তখন, ষাট বছর পর, সুহাসিনীর প্রবীণেরা জানতে পারে যে, বিয়ের পর মফিজুদ্দিন নূতন বৌকে নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে তালা দিয়ে শুতো, কারণ, তার বৌ চন্দ্রভানের নিশির ডাকে ঘর ত্যাগ করার অভ্যাস ছিল, এবং পরবর্তী সময়ে মিয়াবাড়ির চাকরেরা তাকে সকালবেলা ঘুমন্ত স্ত্রীর হাত নাকের ওপর চেপে ধরে বসে থাকতে দেখে। সুহাসিনীর লোকেরা তখন বহুদিন পূর্বে মফিজুদ্দিনের বিস্ময়কর আচরণের কারণ সম্পর্কে জানতে পারে, তারা জানতে পারে যে, মফিজুদ্দিন রাতের বেলা ঘরের ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দেয়ার পর, চান্দাইকোনার ইয়াকুব মৌলবির পরামর্শ অনুযায়ী এই তালায়, তিসির তেল মাখিয়ে দিত এবং সকালে চন্দ্রভানের হাত শুঁকে সে বুঝতে পারত, চন্দ্রভান রাতে উঠেছিল কি না; যেদিন সকালে চন্দ্রভানের হাতে তেলের গন্ধ পাওয়া যেত, মফিজুদ্দিন বুঝতে পারত যে, চন্দ্রভান দরজা খুলে বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করেছিল এবং এভাবে মফিজুদ্দিন নিজের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তার স্ত্রীর গোপন সমস্যাটির প্রকৃতির ওপর নজর রাখতে পেরেছিল। আব্দুল গফুরের জন্মের ছয় মাস পর চন্দ্রভানের আবার গর্ভ হয় এবং এই সময় মফিজুদ্দিন সকালবেলা চন্দ্রভানের হাতের ঘ্রাণ নিয়ে ক্রমাগতভাবে তিসির তেলের বিশেষ গন্ধ পেতে ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তী আট মাস চন্দ্রভানের হাতে এই গন্ধের অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মফিজুদ্দিন রাতের বেলা ঘরের দরজায় তালা লাগানো ত্যাগ করে। মফিজুদ্দিন যেদিন চন্দ্রভানকে মুক্ত করে দিয়ে তালা এবং তিসির তেলের বোতল দূরে সরিয়ে রাখে তার তিন দিন পর, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চন্দ্রভান পুনরায় আর-একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে এবং মফিজুদ্দিন তার এই ছেলের নাম রাখে, নূরুল হক। পরবর্তী আঠারো বছরে চন্দ্রভান নিয়মিতভাবে গর্ভবতী হয় এবং জন্ম হয় আরো দশটি ছেলের, মফিজুদ্দিন এদের নাম রাখে মোহাম্মদ জমিরউদ্দিন, আব্দুল খালেক, আব্দুল কাদের, মোহসিন আলি, দেলোয়ার হোসেন, শাহজাহান আলি, ফরিদ হোসেন, আব্দুল আজিজ, নাসিরউদ্দিন এবং আবুবকর সিদ্দিক। আবুবকর সিদ্দিকের যখন জন্ম হয় তখন

মফিজুদ্দিনের বয়স সাঁইত্রিশ এবং চন্দ্রভানের চৌত্রিশ। মফিজুদ্দিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ছেলে আব্দুল গফুর ও নরুল হক, ষষ্ঠ, মোহসিন আলি এবং সপ্তম দেলোয়ার হোসেন তাদের শৈশবে অথবা যৌবনের প্রথমে মারা যায়। ফরিদ হোসেন প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তিনবার ফেল করে পরীক্ষায় পাস করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে, যদিও সুহাসিনীর লোকেরা এই কথা বলে যে, ফরিদ হোসেন অসীম সাহস নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাসের চেষ্টা করার পর ব্যর্থতার কারণে একসময় সরে পড়লেও বস্তুত তার সঙ্গে সুহাসিনীর মিয়াবাড়িতে বিদ্যাচর্চা দানা বেঁধে ওঠে, এবং গ্রামবাসীদের কেউ কেউ হয়তো এ কথা বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার অল্প বয়সের শুক্রাণুর চাইতে অধিক বয়সেরগুলো বেশি সক্ষম এবং সারবান ছিল। গ্রামের লোকেরা এই ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারে না যে, মফিজুদ্দিন তাদের কথা শুনতে পেয়েছিল কি না; তারা বলে যে, মফিজুদ্দিন হয়তোবা শুনেছিল অথবা শোনেনি, হয়তোবা সে নিজেই সেই সত্যটি বুঝতে পেরেছিল, যে সত্যটি গ্রামের লোকেরা বহুদিন থেকে ভেবেছিল, এবং তখন সুহাসিনীর লোকেরা জানতে পারে যে, মফিজুদ্দিনের বাড়িতে একই সঙ্গে দুই নারী গর্ভের বোঝা বয়ে বেড়ায়, এদের একজন মফিজুদ্দিনের নয় নম্বর ছেলে ফরিদ হোসেনের স্ত্রী এবং অপরজন হচ্ছে বৃদ্ধা চন্দ্রভান। মফিজুদ্দিনের সর্বশেষ ছেলে আবুবকর সিদ্দিকের জন্মের প্রায় ঊনত্রিশ বছর পর চন্দ্রভান আর-একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে, তখন মফিজুদ্দিন তার এই ছেলের নাম রাখে রফিকুল ইসলাম এবং তখন কোনো একদিন চুল কাটার সময় সুহাসিনীর নাপিত তোরাপ আলি বৃদ্ধ মফিজুদ্দিন মিয়ার হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে থাকলে মফিজুদ্দিন তাকে বলে যে, তার হাতের রেখা বেয়ে যা ঝরে পড়ে তা হচ্ছে জীবন। সেদিন এর পরও হয়তো তোরাপের চেহারায় কোনো এক ধরনের সংশয় দেখা গিয়েছিল এবং তার এই চেহারা দেখে অথবা কণ্ঠের বিভ্রান্ত স্বর শুনে, মফিজুদ্দিন এই নরসুন্দরের অবিশ্বাস এবং সংশয় অপনোদনের কথা ভাবে এবং সেই ভরদুপুরবেলা বিস্মিত তোরাপ আলির চোখের সামনে লুঙ্গি খুলে কোমরের একাংশ উন্মোচিত করে বলে যে, তার কোমরের এইখানে জন্ম থেকে লেখা হয়ে আছে যে, সে এক শ এগারো বছর বাঁচবে এবং এই এক শ এগারো বছর সে জীবনের আবাদ করে যাবে; কিন্তু তার পরেও হয়তো তোরাপ আলি তার কথা বুঝতে পারে নাই। সুহাসিনীর লোকেরা মফিজুদ্দিন মিয়ার প্রজননের সক্ষমতা সম্পর্কে অবগত ছিল, যদিও জীবনের আবাদ করে যাওয়া সম্পর্কিত মফিজুদ্দিন এবং তোরাপ আলির আলাপের বিষয়ে তারা জানতে পারে বহু বছর পর, মহির সরকারের উঠোনে বসে তোরাপ যেদিন এক পূর্ণিমার বর্ণনা দেয়। তবে মিয়াবাড়ির গাছতলায় চুল কাটার সময় মফিজুদ্দিনের কথার অর্থ তোরাপ আলি না বুঝতে পারলেও এবং সুহাসিনীর লোকেরা এই আলাপের কথা না শুনতে পেলেও মফিজুদ্দিনের সরাসরি জীবনের আবাদ রফিকুল ইসলামের জন্মের পর বন্ধ হয়ে যায়। রফিকুল ইসলামের জন্মের দুমাস পর ফরিদ

হোসেনের স্ত্রী জরিনা সন্তান প্রসবের জন্য তার বাপের বাড়ি সিরাজগঞ্জ শহরে যায় এবং গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, জরিনার একটি কন্যাসন্তান জন্মানোর খবর পাওয়ার পর তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য কোলের ছোট বাচ্চা ফেলে সিরাজগঞ্জ যাওয়ার জন্য চন্দ্রভান অস্থির হয়ে পড়ে। মিয়াবাড়ির চাকরদের কাছ থেকে গ্রামের লোকেরা সব শোনে, তারা জানতে পারে যে, চন্দ্রভান বিনা কারণে, শুধুমাত্র জরিনা এবং তার মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য শহরে যায় নাই; সে কোনোভাবে একটি বিষয় জানতে পেরেছিল, হয়তো মফস্বল শহরের মেয়ে জরিনাই তাকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেছিল, এবং চন্দ্রভান রফিকুল ইসলামের জন্মের পরেই হয়তো সিদ্ধান্তটা নেয় এবং তার পরিকল্পনা কার্যকর করে। গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, জরিনার মেয়ের জন্মের খবর শুনে চন্দ্রভান সিরাজগঞ্জ গিয়ে সেখানে সাত দিন থেকে ছেলে বৌ এবং নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে, মফিজুদ্দিন স্ত্রীর এই অহেতুক শহরে যাওয়ার ঘটনায় বিরক্ত হলেও নবজাত মেয়েটির মুখ দেখার পর তার মন নরম হয়। কিন্তু চন্দ্রভানের ফিরে আসার পর সেদিন রাতে অথবা তার পরের রাতে অথবা অন্য কোনো এক রাতে মফিজুদ্দিনের বৃদ্ধ এবং অসাড় হয়ে আসা হাতের আঙুল চন্দ্রভানের নাভি থেকে নিম্নমুখী বয়ে গিয়ে দুই কুঁচকির সামান্য ওপরে তলপেটে দুটো ক্ষতচিহ্ন অনুভব করে, এবং কেবল মাত্র তখন মফিজুদ্দিন তার সিরাজগঞ্জ যাওয়ার আসল কারণ জানতে পারে; চন্দ্রভান মফিজুদ্দিনকে তার লজ্জা এবং বিদ্রোহের কথা বলে, সে তাকে বলে যে, সিরাজগঞ্জ শহরের হাসপাতালে গিয়ে সে তার ডিম্বনালি ছেদন করিয়েছে; মফিজুদ্দিনের বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, আমি লাইগেশন করাইছি। তখন প্রায় চল্লিশ বছর পর মফিজুদ্দিনের হাতের আঙুল তার পরিচিত নারীর স্পর্শের ভেতরও কুঁকড়ে আসে এবং তার পুনরায় যমুনার বুকে গণিকা নারী নয়নতারার কথা মনে পড়ে এবং সে অনুভব করে যে, চন্দ্রভান নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে সেকে যে ভাণ্ডার উষ্ণ এবং সক্ষম করে তুলেছিল এতদিন পর তার কোমরের নিচে দুপায়ের মাঝখানে তা শীতল এবং জমাট বেঁধে আসে। মফিজুদ্দিনের বিপর্যস্ত অস্তিত্বে তখন নয়নতারার কথার ধ্বনি অনুরণিত হয়, যমুনার বুকে তার দুই উরুর মাঝখানে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে বলেছিল, একদম ঠাণ্ডা বরফ!

যমুনার বুকের এই নারীটির কথা জীবনের প্রায় প্রতিটি বাঁকেই মফিজুদ্দিনের মনে পড়ে। সুহাসিনীর হাট যেদিন প্রথম বসে সেদিন সুহাসিনীর লোকেরা এই নামটি শুনতে পায় এবং দেখতে পায়, এই নাম উচ্চারণের সময় কি অসাধারণ পরিমাণ আবেগ মফিজুদ্দিনকে তাড়িত করে। সুহাসিনীর হাট প্রথম বসার দিন মফিজুদ্দিন যখন বলে যে, এই হাটের নাম হবে নয়নতারার হাট, তখন সুহাসিনীর লোকেরা বুঝতে পারে না, এই নামটি কার নাম এবং তখন মফিজুদ্দিন বলে যে, নয়নতারা একজন বেশ্যার নাম,

নয়নতারা দেবীদের মতো একজন দেবীর নাম। সেদিন সে বলে, এই রহম ম্যায়া মানুষ আর দেখি নাই, আর দেখমুও না; সে এমন এক ম্যায়ামানুষ আছিল যে মায়ের নাহাল, বৌ আর বিটির নাহাল; এই হাটের নাম হবি নয়তারার হাট, এরপর মফিজুদ্দিন তার গলার স্বর নামিয়ে নেয় অথবা আবেগের তাড়নায় তা নিজে নিজেই নেমে আসে এবং সে বলে নয়নতারার নাহাল ম্যায়ামানুষ জীবনে দেহি নাই, নয়নতারা আমার মুর্শিদের নাম; সে হিন্দু আছিল, না মুসলমান আছিল, আমি জানি না, কিন্তু সে আমাক কইছিল, ভয় পায়ো না ভগমানের নাম নেও; সে আমাক কইছিল, ভয় পায়ো না আল্লা নবির নাম নেও। সুহাসিনীর হাট যেদিন প্রথম বসে সেদিন কড়ুই গাছের বিস্তৃত শাখার নিচে মফিজুদ্দিনকে ঘিরে দাঁড়ানো গ্রামের লোকদের তার কথা শুনে একধরনের বিভ্রান্তি হয়, কারণ, সে এত কথা বলার পরেও তারা নয়নতারার বিষয়টি বুঝে উঠতে পারে না; তবে তারা তখন এই অনুমান করতে পারে যে, আর-একটি নারী মফিজুদ্দিনের জীবনে বড় হয়ে উঠেছে এবং পরবর্তী সময়ে তারা এ বিষয়ে পরিপূর্ণরূপে জানতে পারে। যমুনার বুকে নৌকোর ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বধ্যভূমি এবং সময়ের দিকে ভেসে যাওয়ার সময় এক কামুকী নারী বিষণ্ন চোখে তার মুখের দিকে তাকায় এবং ভাতের নলা মুখের কাছে তুলে ধরে বলে, খাও। মফিজুদ্দিন আতঙ্ক এবং বিভ্রান্তির চাপে যখন গোঙায় এবং মুখের ভেতর গুঁজে দেয়া ভাত গিলতে পারে না, তখন এই নারী তাকে বলে, তুমি কি মুসলমান? ভয় পায়ো না, আল্লার নাম নেও; তুমি কি হিন্দু? ভয় পায়ো না, ভগবানের নাম নেও। তখন মফিজুদ্দিন তার কথার কিছুই বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলে সে তার বাম বাহুটি মফিজুদ্দিনের কাঁধের ওপর রাখে, তার চোখ পুনরায় চিকচিক করে এবং সে পুনরায় বলে, ভয় নাই; এরপর তাকে ছৈয়ের নিচে টেনে নিয়ে সেই নারী মফিজুদ্দিনের বরফের মতো যৌনাঙ্গ আবিষ্কার করে এবং উলঙ্গ ও কাত হয়ে পড়ে থাকা মফিজুদ্দিনের দেহ জড়িয়ে ধরে ছৈয়ের নিচে শুয়ে থাকে। এই সময় অথবা এর আগেই অন্য কোনো এক সময়ে এই নারী হয়তো একটি সিদ্ধান্ত নেয়, এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে মফিজুদ্দিন বড় বিভ্রান্ত বোধ করে; তার অনেক সময় মনে হয় যে, নৌকোর ওপর এই নারীর সে সময়কার আচরণের পেছনে কোনো পরিকল্পনা ছিল না; সে যা করেছিল, তা সে কোনো কিছু না বুঝেই করেছিল; কিন্তু একই সঙ্গে তার মনে হয় যে, কোনো কারণ ছাড়া এ রকম আচরণ করার মানে কি? সে যে আচরণ করেছিল, কোনো নির্দিষ্ট কারণ বা উদ্দেশ্য ছাড়া তা করার কোনো দরকারই তার ছিল না। সেদিন ছৈয়ের নিচে মফিজুদ্দিনকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকার পর মেয়েটি মাথা উঁচু করে বাইরে তাকায় এবং ছৈয়ের মুখের উপরে বসা হালাকুর দুপা ঝুলে থাকতে দেখে; তখন সে ঘষটে ঘষটে একটু এগিয়ে এক হাত বাড়িয়ে হালাকুর ঝুলে থাকা পা ধরে এবং অন্য হাতে তার পায়ের তালু জোরে চুলকে দেয়। পায়ের তলায় সুড়সুড়ির ফলে হালাকুর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, সে লাফ দিয়ে

নৌকোর পাটাতনের ওপর নেমে আসে এবং ছৈয়ের মুখের কাছে উবু হয়ে উঁকি দিয়ে দেখে যে, মফিজুদ্দিনের নগ্ন উরুর ফাঁকে নিজের শাড়ি আবৃত পা তুলে দিয়ে তাদের ভাড়া করে আনা মেয়েটি ছৈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে; হালাকুকে তাকাতে দেখে সে হাসে এবং বলে, এইটা একটা খাসি, ভিতরে আইসা ধইরা দেখো, বিচি নাই! হালাকুর তখন পুনরায় রতি বাসনা জাগরিত হয়, সে মফিজুদ্দিনকে টেনে পুনরায় সামনের গলুইয়ের কাছে পাটাতনের ওপর নিয়ে আসে। তারপর হালাকু তার পরনের লুঙ্গি খুলে নগ্ন হয়ে লুঙ্গিটা ছৈয়ের এক দিকের মুখে পর্দার মতো ঝুলিয়ে দেয়, অন্য প্রান্তের মুখে বাঁধে মেয়েটার কালো এবং ময়লা সায়া, এবং তখন একটু পর নৌকোর সেই বিস্ময়কর দুলুনি শুরু হয়। নৌকোর কাঁপুনি যখন থামে তখন ঘর্মাক্ত এবং ক্লান্ত মেয়েটি তার ওপর চেপে পড়ে থাকা পুরুষটির দিকে নজর দেয় এবং, পরবর্তী সময়ে মফিজুদ্দিনের যেমন মনে হয়, বিষয়টিকে একটি খেলায় পরিণত করে; মেয়েটি তার ওপরে পড়ে থাকা রতিক্লান্ত খুনির কানে কানে বলে যে, সে বধ্য লোকটি বা ছেলেটির সঙ্গে একটি বার সহবাস করতে চায়; এবং যতক্ষণ বা যতদিন মফিজুদ্দিন সে কাজের যোগ্য হয়ে না ওঠে ততদিন তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে প্রস্তাব করে। হালাকু এবং জোবেদ ক'দিন পর কোনো বালুচরে মফিজুদ্দিনকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল তা বোঝা যায় না, তারা গণিকা নারীটির প্রস্তাব গ্রহণ করে কি না তাও বোঝা যায় না, তাদের নৌকো শুধু ক্রমাগত ভেসে যেতে থাকে। গণিকা মেয়েটি তখন তার ছলকালার রঙধনু মেলে ধরে; সে হালাকু এবং জোবেদকে বলে যে, তার বয়স যখন আরো কম ছিল তখন সে একবার কোলকাতায় ছিল, তখন সেখানে সে কিছু লেখাপড়া শেখে এবং বাৎসায়নের বই পড়ে; কামসূত্রের নাম শুইনছ? সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে। তার কথা শুনে হালাকু যখন হাঁ করে থাকে, নষ্ট মেয়েটির উচ্ছ্বসিত স্খলিত হাসি পানির শব্দের পাশাপাশি যমুনার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যায়; হালাকুর ফাঁকা নির্বোধ চাউনির দিকে তাকিয়ে সে বলে যে, সে চৌষট্টি কলা জানে এবং এ বিষয়ে হালাকু এবং জোবেদের মূর্খতার কথা বলে তাদেরকে বিভ্রান্ত এবং লোভী করে তোলে; তোমরা এই মজার কিচ্ছু জান না, সে বলে, বাৎসায়ন এই কামের নেইগা আশিটা আসনের কথা লেইখ্যা গেছে; এবং তারপর বলে যে, সে তাদেরকে এ সবই শেখাবে যদি তারা অপেক্ষা করে এবং কেবলমাত্র একবার মফিজুদ্দিনকে তার অভ্যন্তরে গ্রহণ করতে দেয়। এই প্রস্তাবে হালাকু এবং জোবেদ সম্মত হয় কি না তা বোঝা যায় না, তবে তারা নৌকোর মুখ ঘোরায় না; নৌকো ভেসে যেতে থাকে, বাইরে খোলা আকাশের নিচে রোদের ভেতর হাত-পা পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকে মফিজুদ্দিন, নৌকোর ছৈয়ের মুখে টাঙানো লুঙ্গির পর্দার ফাঁক দিয়ে হালাকু ও জোবেদ আধ ঘণ্টা পরপর ছৈয়ের ভেতরে যাওয়া-আসা করতে থাকে, এবং সারা দিন, প্রায় সন্ধে পর্যন্ত, নৌকো একটানা দোল খায়। সেদিন সন্ধের সময় তারা পদ্মা এবং যমুনার মিলনস্থলের কাছে পৌঁছায়, এখানে এক

গ্রামের কাছে নৌকো ভিড়িয়ে জোবেদ নেমে গিয়ে চাল, ডাল ও দেশলাই কিনে আনে এবং তারপর নৌকো পুনরায় ভাটির দিকে বয়ে চলে। সারা দিনের পরিশ্রমে হালাকু ও জোবেদ ইতোমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে ছিল, রাতে ভাত খাওয়ার পর মেয়েটি যখন বলে যে, এবার তারা ষোড়শতম আসনের চর্চা করবে, হালাকু তাকে নৌকোর পাটাতনের ওপর চিৎ করে পেড়ে ধরে। সে রাতে তারা কে কখন ঘুমায় তারা কেউ বলতে পারে না, তবে সকালে উঠে সূর্যের আলো দেখে তারা বুঝতে পারে যে, তারা পদ্মার বুকের ওপর আছে, নৌকো সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে নেমে না গিয়ে যাচ্ছে, একটু দক্ষিণ মুখে কাত হয়ে, পূর্ব দিকে। তখন জোবেদ হাল ধরে বসে, হালাকু পাটাতনের ওপর সকালের রোদের ভেতর কিছুক্ষণ মরার মতো চিৎ হয়ে পড়ে থাকে এবং তখন ছৈয়ের তলায় গণিকা নারীটি জেগে ওঠে; সে হাই তুলে চোখ কচলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছৈয়ের মুখের কাছে হালাকুকে পড়ে থাকতে দেখে এবং তার মাথায় প্রবৃত্তি অথবা পরিকল্পনা তৎক্ষণাৎ জেগে ওঠে, সে হাত বাড়িয়ে হালাকুর পায়ের তলায় জোরে খামচে দেয়। হালাকু এই রহস্যময়ী নারীর পরিকল্পনার বিষয়টি সম্পর্কে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে পারে নাই, সে জানতেও পারে না যে, মধুর পাত্রে আটকে যাওয়া মাছির মতো সে এক মোহন ফাঁদে ধরা পড়েছে; গণিকাটি তার পায়ের তলায় খামচে দিলে তার ঘুমের ঘোর কেটে গিয়ে শরীর জেগে ওঠে, সে পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আগের দিনের মতো ছৈয়ের পেছনের গলুইয়ের মুখে নিজের পরনের লুঙ্গি খুলে টাঙিয়ে দিয়ে ছৈয়ের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নৌকো ঝঞ্ঝায় পতিত হওয়ার মতো ঝাঁকানি খায়। সেদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হালাকু ও জোবেদ প্রত্যেকে চব্বিশ বার নৌকোর ছৈয়ের তলায় প্রবেশ করে, এবং সন্ধের সময় সূর্য ডুবে যাওয়ার পর হালাকু পঞ্চবিংশতিতম বারের অভিজ্ঞতা অর্জন করে যখন বের হয়ে আসে, জোবেদ আর ভেতরে ঢুকতে চায় না। সে রাতে জোবেদ আর ছৈয়ের নিচে যায় না, হাল ধরে বসে থাকে; কিন্তু পরদিন সকালে সে হালাকুর আগেই এই ক্রিয়ায় যোগ দেয়। পরদিন সকালে সূর্য মাথার ওপর যখন অনেকটা উঠে আসে তখন হালাকুর ঘুম ভাঙে এবং চেতন হওয়ার পর চোখ না খুলেই সে নৌকোর ঢুলুনি টের পায় এবং ছৈয়ের তলায় তার শরীরের পাশ ঘেঁষে চূড়ান্ত সঙ্গমে লিপ্ত দুটো দেহের নিশ্বাসের চাপা বিস্ফোরণের শব্দ শোনে। হালাকু চোখ বুজে পড়ে থাকে, তারপর জোবেদ মেয়েটির ওপর থেকে নেমে গেলে সে চোখ না খুলেই কাত হয়ে এই ক্লান্ত নগ্ন নারীকে জড়িয়ে ধরে এবং নৌকোর দুলুনি অব্যাহত থাকে। এই লাগাতার রমণ চক্রের ভেতর পড়ে মনে হয় যেন খুনি দুজন এবং গণিকা খাওয়া-দাওয়া এবং বাইরে দিনের রোদ এবং রাতের ঠাণ্ডার ভেতর পড়ে থাকা মফিজুদ্দিনের কথা ভুলে যায়; সেদিন সন্ধে পর্যন্ত হালাকু তিন দিনে তার চল্লিশতম বারের সঙ্গম সমাপ্ত করে, শেষ বার যখন তার নির্গত হয়ে যায় সে নগ্ন নারীর দেহের ওপর নিজের অবশ হয়ে আসা দেহ ফেলে পড়ে থাকে, নেমে আসতে পারে না। সে রাতে মেয়েটি প্রথমবারের মতো ভাত রান্না করার

দায়িত্ব নেয়, ভাত রাঁধার পর জোবেদ আর সে খায় এবং সানকিতে করে নিয়ে গিয়ে মফিজুদ্দিনকে খাওয়ায় এবং পুনরায় বলে, ভয় পায়ো না; হালাকু কেবল অভুক্ত অবস্থায় অঘোর নিদ্রায় ডুবে থাকে। পুরো পরিস্থিতিটা চতুর্থ দিনে মনে হয় যেন পরিপক্ব হয়ে ওঠে এবং গণিকা নারীটি যেন কিছু একটা ঘটানোর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, অথবা, মফিজুদ্দিনের পরবর্তী কালে যেমন বহুবার মনে হয় যে, এই মেয়েটি তার জাল পাতা এবং তাতে খুনি দুজনের ধরা পড়ার পর তখন সেই জাল ক্রমান্বয়ে গুটিয়ে আনতে থাকে; এবং দীর্ঘ পরিশ্রম ও কৌশলের পর চতুর্থ দিন মনে হয় যেন তার গোপন ষড়যন্ত্রের বৃক্ষে ফুল ফুটে ওঠে এবং শীঘ্রই তাতে ফল ধরে। সেদিন সকালে লগি টেনে তুলে যখন নৌকো ছাড়া হয়, হালাকু ও জোবেদ এত দুর্বল বোধ করে যে, তারা কেউ হালের বৈঠা ধরে বসতে পারে না, নৌকো কাণ্ডারিহীন অবস্থায় স্রোতের টানে ভেসে যায়; কিন্তু সিরাজগঞ্জ শহরের বাৎসায়ন পড়া গণিকার হাত থেকে তারা রেহাই পায় না, তারা পেছনের গলুয়ে হালের কাছে পাটানের ওপর পড়ে থাকে এবং একের পর এক হামাগুড়ি দিয়ে নৌকোর ছৈয়ের মুখে ঝুলিয়ে দেয়া শাড়ি সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং নৌকো ক্রমাগতভাবে নেচে চলে। এভাবে সময় যখন পার হতে থাকে অথবা সময়ের গতি যখন একটি আবর্তের ভেতর পড়ে রহিত হয় এবং রতিক্রিয়ার একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলে দুজন পুরুষ ও একটি নারী আটকা পড়ে যায়, সেদিন দুপুরের পর সবল জোয়ান এবং নিষ্ঠুর খুনি হালাকু তার পঞ্চান্নতম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হতে থাকে, তার চোখে নিদ্রার ঘোর নেমে আসে এবং তার দেহ যখন অতিক্লান্ত ঘোড়ার মতো দুই উরুর মাঝখান থেকে ক্ষরণ সম্ভব করে আনে, তখন তার মস্তিষ্কের ভেতরও ক্ষরণ ঘটে এবং তার চেতনা লুপ্ত হয়; হালাকু তার জীবনের শেষ বীর্যপাতের কথা জানতে পারে না। হালাকু যখন মেয়েটির নগ্ন দেহের ওপর দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকে, সরে না, সে তাকে ধাক্কা দিয়ে দেহের ওপর থেকে নামিয়ে দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে এবং তখন জোবেদ ছৈয়ের বাইরে বিকেল পর্যন্ত মেয়েটিকে নিয়ে থাকে। তখন মেয়েটি জোবেদকে বলে যে. তার বন্ধু হালাকু খুব দুর্বল পুরুষ ছিল, সে তার কাজ শেষ করার আগেই মারা গেছে, এখন তাই কামসূত্রের অবশিষ্ট আসনগুলো সম্পর্কে জানার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে; কারণ, সে-ই হালাকুর চাইতে সমর্থ পুরুষ। হালাকুর মৃত্যুর খবরে জোবেদ প্রথমে ভয় পায়, কিন্তু তার পরেও গণনা এগিয়ে যায়, পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন করে; আটান্নতম বারে জোবেদের গাত্রোত্থানের শক্তি রহিত হয় এবং তখন সে, তাকে চিৎ করে নিচে ফেলে তার দেহের ওপর নগ্ন ক্লান্ত গণিকাটিকে ঘোড়সওয়ারের মতো চেপে থাকতে দেখে। পদ্মা নদীর বুকে সে এক অসাধারণ খেলা ছিল এবং এই খেলার চরম পরিণতিতে মফিজুদ্দিনের জীবন রক্ষা হলেও এর জন্য গণিকা নারীটিকে চরম মূল্য দিতে হয়; নদীর বুকে কোনো এক অজানা জায়গায় খোলা আকাশের নিচে এক উলঙ্গ এবং ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা চেহারার নারীকে জোবেদ যখন তার দেহের ওপর চেপে মুখের কাছে নত হয়ে

আসতে দেখে, তখন প্রবল অবসাদ এবং ক্লান্তির ভেতরও সে সম্ভবত তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, নৌকোর সামনের পাটাতনের ওপর পড়ে থাকা মফিজুদ্দিন প্রথমে কিছুই বুঝতে পারে নাই, তবে একসময় সে এই বিষয়টি বুঝতে পারে যে, নৌকোর চার দিনের ক্রমাগত ঢুলুনি থেমে গেছে; এবং তখন সন্ধ্যার আলো অনেক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে মরে আসার পর রাত নামে। মফিজুদ্দিন সেদিন সারা রাত অভুক্ত পড়ে থাকে, গণিকা মেয়েটি তার কাছে ভাত নিয়ে আসে না, নৌকোয় কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না; কিন্তু তার পরেও মফিজুদ্দিনের বড় কোনো ধরনের সন্দেহ হয় না। সকালে পেটে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে মফিজুদ্দিন জেগে ওঠার পর সূর্য ক্রমান্বয়ে মাথার ওপর উঠে আসতে থাকে, কিন্তু নৌকোয় কোনো নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যায় না; তখন মফিজুদ্দিনের মনে একধরনের অস্পষ্ট সন্দেহ অথবা কৌতূহল হয়, সে কাত হয়ে থেকেই ঘষটে ঘষটে নৌকোর ছৈয়ের কাছে এসে পর্দার মতো ঝোলানো কালো পেটিকোট ঘাড় উঁচু করে মুখ দিয়ে কামড়ে নামায় এবং দেখে যে, হালাকু উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার কাত হয়ে থাকা মাথার কানের কাছ থেকে কালো রঙের শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ধারা গাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে; ছৈয়ের নিচে হালাকু ছাড়া অন্য কাউকে সে দেখে না, এবং ছৈয়ের অন্য প্রান্তে কাপড় ঝোলানো থাকায় ছৈয়ের বাইরে পেছনের গলুইয়ের সম্মুখের পাটাতন সে দেখতে পায় না, তবে মফিজুদ্দিন এই অবিশ্বাস্য রকমের সত্যটি বুঝতে পারে যে, এই নৌকোয় সে ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো জীবিত প্রাণী নাই। এই অবস্থায় তার আতঙ্কের ঘোর দ্রুত অপসৃত হতে থাকে, সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে; সে প্রথমে তার পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে, নৌকোর সঙ্গে বেঁধে রাখা দড়ি, পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করে খোলে। নৌকোর পাটাতন থেকে মুক্ত হয়ে সে গড়িয়ে ছৈয়ের নিচে আসে এবং পাটাতনের এক পাশে মৃত হালাকুর বল্লমটা পড়ে থাকতে দেখে, তখন বল্লমের ফলার সঙ্গে ঘষে ঘষে সে তার হাতের দড়ি কাটে এবং তারপর পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নগ্ন মৃত খুনির পাশে বন্ধনমুক্ত হওয়ার পর মফিজুদ্দিন উঠে বসে উঁচু হতে গেলে ছৈয়ের সঙ্গে তার মাথা ঠেকে যায়, সে তখন উবু হয়ে ছৈয়ের খোলা মুখ দিয়ে পুনরায় বাইরে বের হয়ে আসে এবং হাতে বল্লমটা তুলে নেয়। সুহাসিনীর লোকেরা এই সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানতে পারে; তারা বলে যে, সেদিন তখন মফিজুদ্দিন নিশ্চিতরূপে অনুভব করেছিল যে, নৌকোয় আর কেউ বেঁচে নেই, তবুও সে বল্লমটার তেল দিয়ে মাজা পাকা বাঁশের হাতল শক্ত মুঠোয় নিয়ে নৌকোর ছৈয়ের ওপর চড়ে অন্য প্রান্তে আসে এবং ছৈয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেই সেই দৃশ্যটি দেখে এবং তার অন্তর গণিকা মেয়েটির জন্য শঙ্কায় পূর্ণ হয়ে ওঠে; সে দেখতে পায় যে, নগ্ন এবং চিৎ হয়ে পড়ে থাকা জোবেদের দেহের ওপর নগ্ন গণিকার স্তব্ধ দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে মফিজুদ্দিন পরবর্তী সময়ে একটি সিদ্ধান্তে আসে, সে বুঝতে পারে

যে, জীবনের প্রান্তে পৌঁছে দুই নম্বর খুনি, জোবেদ, হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে, নদীর ওপর ভাসমান এই নারী অথবা কুহকিনীর হাত থেকে তার রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নাই; তখন সে নিজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকেও হত্যা করে। নৌকোর ছৈয়ের ওপর থেকে নিচে নেমে এসে মফিজুদ্দিন যখন চিৎ হয়ে পড়ে থকা জোবেদের দেহের ওপর থেকে নগ্ন গণিকাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে, সে দেখে যে, মেয়েটির কণ্ঠনালি জোবেদের চেপে বসা দুপাটি দাঁতের শক্ত কামড়ের ভেতর আটকা পড়ে আছে। হালাকু টের পায় নাই, কিন্তু জোবেদ হয়তো টের পেয়েছিল যে, তার জীবনের সেই সময়টি এসে গেছে, হয়তো তার অতিক্রান্ত শরীর তাকে এই সংকেতটি দিয়েছিল, এবং তখন, ভয় ও এক ধরনের ঘুম ঘুম ঘোরের ভেতর যখন নগ্ন নারী মূর্তিটিকে তার ওপর চেপে বসে তার মুখের দিকে নত হয়ে আসতে দেখে, সে অপেক্ষায় থাকে এবং নারী-মুখটি তার মুখের কাছ দিয়ে কাঁধের ওপর স্থাপিত হলে সে নিজের মুখটা অল্প ঘুরিয়ে, মেয়েটির লম্বা করে রাখা কণ্ঠনালির ওপর তার দাঁতের পাটি একটি সাঁড়াশির হাঁ-এর মতো স্থাপন করে, মেয়েটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই, কামড় দিয়ে ধরে। জোবেদের মস্তিষ্কে হয়তো তখনই একটি শিরা ছিঁড়ে গিয়ে লাল জবার মতো একটি ফুল বিকশিত হয়, কারণ, মফিজুদ্দিন দেখে যে, জোবেদের কানের পাশ দিয়েও চিকন সুতোর মতো রক্তের শুকনো ধারা নিচের দিকে নেমে গেছে; তবে গণিকা মেয়েটির মৃত্যু সম্পর্কে মফিজুদ্দিনের বিভ্রান্তি চিরদিনের জন্য থেকে যায়, সে বুঝে উঠতে পারে না যে, মেয়েটি দাঁতের সাঁড়াশিতে কণ্ঠনালি আটকে দম বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল, নাকি মারা গিয়েছিল গলা থেকে রক্তক্ষরণের কারণে সেদিন মফিজুদ্দিন যখন বুঝতে পারে যে, তার জীবন বেঁচে গেছে, সে তখন এই সঙ্গে বিস্ময়ের সকল ঘোরের ভেতর এই কথাটিও বুঝতে পারে যে, একটি পতিত মেয়ের দয়ায় তার এই বেঁচে থাকা; এই একটি বিষয় সে তার পরবর্তী জীবনে কখনো বিস্মৃত হয় নাই। সেদিন মফিজুদ্দিন পদ্মা নদীর ওপর এই গণিকা নারীর শেষকৃত্যের আয়োজন করে, সে তার কণ্ঠনালি মুক্ত করে শক্ত হয়ে আসা নগ্ন দেহ সরিয়ে সামনের পাটাতনের ওপর নিয়ে আসে, নদী থেকে পানি তুলে তাকে গোসল করায় এবং পাটাতনের ওপর শোয়ানো এই মৃত নগ্ন নারীর পায়ের কাছে বসে তার দুপায়ের পাতা নিজের দুই করতলের ভেতর কোনো এক পবিত্র সামগ্রীর মতো ধারণ করে বিড়বিড় করে, আল্লার নাম উচ্চারণ করতে করতে সেই মলিন পদযুগল চুম্বন করে; তখন, অপহৃত হওয়ার পর থেকে এতক্ষণ যে জিনিসটির দেখা পাওয়া যায় নাই, তার আবির্ভাব ঘটে, মফিজুদ্দিনের চোখ পানিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে; সেদিন উন্মুক্ত আকাশের নিচে পদ্মার বিস্তৃত বুকের ওপর মরে শক্ত হয়ে যাওয়া এক দরিদ্র গণিকার চরণ মফিজুদ্দিনের চোখের পানিতে ভিজে যায়। তিনটি লাশ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নদীর পানিতে ফেলে দেয়ার পর মফিজুদ্দিন নৌকো কূলে নিয়ে এসে ভেড়ায় এবং নিকটবর্তী গ্রামে হেঁটে গিয়ে তার বিপর্যয়ের কথা খুলে বলে, এবং

তখন এই গ্রামের লোকদের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে, এটা হরিরামপুর থানার রাজখাড়া গ্রাম এবং এখান থেকে সিরাজগঞ্জ এবং সুহাসিনী অনেক দূর। এই গ্রামের লোকেরা মফিজুদ্দিনের থাকার ব্যবস্থা করে এবং দুদিন এখানে থাকার পর যখন একটু সুস্থ বোধ করে, তৃতীয় দিন খুব ভোরে গ্রাম ছেড়ে সে রওয়ানা হয়; তখন তার আশ্রয়দাতা কৃষক একটি পুরনো গামছায় তার জন্য চিড়া এবং গুড় বেঁধে দেয় এবং তার হাতে গুঁজে দেয় একটি রুপোর টাকা। এই গ্রাম ত্যাগ করার পর মফিজুদ্দিন কত পথ বা কতদিন ধরে হাঁটে তা সে হিসেব করতে পারে না, অথবা ভুলে যায়, তার শুধু কতগুলো গ্রামের কথা কিছুদিন মনে থাকে; রাজখাড়া গ্রাম থেকে লেছরাগঞ্জ, তারপর গোপীনাথপুর হয়ে বাল্লার ভেতর দিয়ে শিবালয়, সেখান থেকে যমুনা নদী পার হয়ে পুনরায় দীর্ঘ পথ হেঁটে সে সুহাসিনীতে এসে পৌঁছয় এবং তারপর সুহাসিনীর মানুষের চোখের সামনে মফিজদ্দি থেকে মফিজুদ্দিন মিয়া হয়ে ওঠে। এবং গ্রামে ফিরে আসার পর সে গ্রামের মানুষের কাছে এই ঘোষণা দেয় যে, সে এক শ এগারো বছর বাঁচবে, তাপর এক অপরিচিত নারীর নামে সুহাসিনীর নূতন হাটের নামকরণ করে এবং বিয়ে করে আলি আসগর মিয়ার নির্মল কুসুমের মতো কিশোরী মেয়ে, চন্দ্রভানকে।

আলি আসগর মিয়াকে যে জিনের ভয় দেখিয়ে মফিজুদ্দিন তার মেয়েকে বিয়ে করে সেই জিনকে পরিণতিতে সে কাবু করতে সক্ষম হয় না, চন্দ্রভানকে নিয়ে বাসরশয্যায় প্রবেশের চৌষট্টি বছর পর গ্রামের লোকেরা যেদিন মিয়াবাড়ির পেছনে খালের কিনারায় বৃদ্ধা চন্দ্রভানকে উলঙ্গ এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে, এবং যেদিন মফিজুদ্দিন এসে পানি-কাদা মাখানো চন্দ্রভানের অজ্ঞান দেহটি ঘরে তুলে আনে, তখন তার কাছে পুরো বিষয়টির পরিহাসের দিকটি উন্মোচিত হয়। সে বুঝতে পারে যে, আলি আসগর মিয়া যে ফাঁদে পড়ে কাবু হয়েছিল এখন সে নিজে তাতে ধরা পড়েছে, তার শঙ্কা হয় এবং সে একই সঙ্গে বিভ্রান্ত বোধ করে; সে বুঝতে পারে না এটা আবার কেন ঘটতে শুরু করে, এই জিনটা এই বিগত যৌবনা নারীর প্রতি পুনরায় কেন আগ্রহী হয়ে ওঠে! মফিজুদ্দিন সেদিন তার সন্তানদের ডেকে বাড়ির ভেতরের প্রাঙ্গণে বসে সমস্ত কথা খুলে বলে এবং সেদিন থেকে রাতের বেলা চন্দ্রভানের পুনরায় বন্দি জীবন যাপন শুরু হয়। এই সময় রফিকুল ইসলাম তার ভাই নাসিরউদ্দিনের কাছে একটি চিঠি লিখে বিষয়টি বর্ণনা করে এবং জানায় যে, তাদের মাকে এখন রাতের বেলা শোয়ার ঘরে ভেতর থেকে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। সুহাসিনীর লোকেরা এই সব বিষয় যখন জানতে পারে এবং তারা যখন এই সব নিয়ে কথা বলে, তারা তখন বলে যে, চন্দ্রভানের এই রহস্যময় আচরণের পুনরাবির্ভাব এবং এ বিষয়টি অবহিত করে রফিকুল ইসলামের লেখা পত্র, পরিবারের অন্যদের সঙ্গে ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা রাতে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে দেয়। নাসিরউদ্দিন তখন নওগাঁয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিল, যখন সে একদিন তার ছোটো ভাই রফিকুল ইসলামের লেখা চিঠিটা পায় এবং নারীবর্জিত মোল্লা নাসিরউদ্দিনের হৃদয় মায়ের জন্য হাহাকার করে ওঠে; সে বুঝতে পারে যে, রাতের বেলা ঘুমের ভেতর ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং বিলের পানিতে ডুব দিয়ে আসা একটি রোগ এবং এর চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। তখন নাসিরউদ্দিন দশ দিনের ছুটি নিয়ে সুহাসিনীতে এসে হাজির হয়, তাকে দেখে বৃদ্ধা চন্দ্রভান তার চিবুক টিপে দিয়ে বলে, আমার লায়েক ব্যাটা আইসা পইড়ছে; তখন চন্দ্রভানের এই কথা শুনে এবং আদর পেয়ে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের বিষণ্ন মুখ আরো বিষণ্ন হয়ে ওঠে, কারণ, তখন তার হয়তো শৈশবের সেই সব ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার এ রকম ইচ্ছে ছিল যে, তার ছেলেদের ভেতর একজনকে সে মাদ্রাসায় পড়াবে, যাতে করে একটি ছেলে পরিবারে ধর্মকর্ম চালু রাখতে পারে, এ জন্য নাসিরউদ্দিনকে সে শিশুকাল থেকে নির্বাচিত করে রাখে এবং সুহাসিনীর লোকদের এই কথাটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার অবহিত করে বলে, নাসিরউদ্দিনকে আমি আল্লাহ্‌র নামে মাদ্রাসায় দিমু; এবং গ্রামের লোকেরা এই কথা শুনে শুনে বিষয়টিতে এতটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে, নাসিরউদ্দিনকে তারা একসময় মোল্লা নাসিরউদ্দিন বলে সম্বোধন করতে থাকে। নাসিরউদ্দিন প্রথমে বিষয়টা বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু ক্রমান্বয়ে সে যখন বড় হয়ে উঠতে থাকে, মাদ্রাসায় পড়া, না-পড়ার বিষয়ে তার ব্যক্তিগত পছন্দ গড়ে ওঠে এবং সে এমন এক গোপন পরিকল্পনা করে যে, তাকে মাদ্রাসায় পড়ানোর তার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, যদিও তার নাম সারা জীবনের মতো মোল্লা নাসিরউদ্দিন হয়ে যায়। নাসিরউদ্দিনের বয়স যখন দশ বৎসর তখন গ্রামের আরো পাঁচটি ছেলের সঙ্গে তার খাৎনা করানো হয় এবং এরপর মফিজুদ্দিন তাকে সিরাজগঞ্জ নিয়ে গিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে জায়গির বাড়ি রেখে আসে, তিন মাস পর মাদ্রাসার ছুটিতে সে যখন গ্রামে ফেরে তখন গ্রামের লোকেরা তার কাজ-কারবার সম্পর্কে জানতে পারে। গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, মাদ্রাসার ছুটিতে গ্রামে ফিরে আসার পর একদিন সকালে সে চন্দ্রভানের মুরগির খোঁয়াড় থেকে তিনটি বাচ্চা মোরগ ধরে সেগুলোর তলপেট কেটে কিছু একটা করতে উদ্যত হয়, তখন এই খবর শুনে চন্দ্রভান হা হা করে ছুটে আসে; নাসিরউদ্দিন তখন তার মাকে বিষয়টা খুলে বলে, এবং তাকে বাটা হলুদ এবং পান খাওয়ার চুন এবং সুঁই সুতো নিয়ে আসতে বলে। চন্দ্রভান একটি মাটির সরায় চুন ও হলুদ বাটা এবং সুঁই-সুতা নিয়ে আসে; তখন নাসিরউদ্দিন মায়ের সহায়তায় সিরাজগঞ্জে জায়গির বাড়িতে মোরগ খাসি করার বিষয়ে তার নবলব্ধ জ্ঞান তিনটি মোরগের বাচ্চার উপর প্রয়োগ করে। চন্দ্রভান একটি মোরগ চিৎ করে রাখে, নাসিরউদ্দিন তখন মোরগটার তলপেটের পালক সব ছিঁড়ে তুলে ফেলে, তারপর সে মোরগের পরিষ্কার করা পেট নরুন দিয়ে দুআঙুলের মতো কেটে একটা ফোকর তৈরি করে এবং এই ফোকর দিয়ে একটি আঙুল, ডান হাতের তর্জনী,

মোরগটার পেটের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেয়। সে একটি আঙুল চালনা করেই এই পাখির পেটের ভেতর থেকে নরম অণ্ডকোষ দুটো আঙুরের মতো ছিঁড়ে একটি একটি করে বের করে এনে সরার উপর রাখে, তারপর কাটা অংশ সেলাই করে চুন ও হলুদ একত্রে মিশিয়ে, ক্ষতে এই মলম লাগিয়ে দেয়। তখন চন্দ্রভান এই মোরগটিকে প্রাঙ্গণের ওপর ছুড়ে দিয়ে দ্বিতীয় মোরগের বাচ্চাটিকে চিৎ করে ধরে এবং এভাবে মাটির সরার উপর মোরগের ছটি ছিন্ন অণ্ডকোষ জমা হয়। সেদিন যখন সব কাজ শেষ হয়ে যায়, মা এবং ছেলে একজন আরেক জনের দিকে তাকিয়ে হাসে এবং মধ্যবয়স্কা চন্দ্রভান একটি বালিকার মতো চপল হয়ে ওঠে, সে তার বালক ছেলের গাল টিপে দিয়ে বলে, আমার লায়েক ব্যাটা, এবং তখন সুহাসিনীর লোকেরা মোল্লা নাসিরউদ্দিনের এই গল্প জানতে পারে। চন্দ্রভানের খাসি করে দেয়া মোরগ তিনটি দুমাসের ভেতর লম্বা ঢ্যাঙা হয়ে ওঠে, তাদের লেজের চকচকে বাঁকানো পালক মাটিতে গিয়ে ঠেকে; তখন মিয়াবাড়িতে গ্রামের যারা যায়, তারা এই তিনটি রাজকীয় মোরগের চেহারা দেখে বিমোহিত হয়ে পড়ে। আরো তিন মাস পর মোল্লা নাসিরউদ্দিন একদিন বিকেলে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসে এবং গ্রামের লোকেরা তা জানতে পারে, তখন পরদিন সকালে মিয়াবাড়ির লোকেরা ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, তাদের প্রাঙ্গণে সুহাসিনীর দশ জন কৃষক হাতে দশটি মোরগের বাচ্চা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে; বাড়ির লোকদের দেখে তারা বলে যে, তারা তাদের এই মোরগগুলো মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দিয়ে খাসি করাতে চায়। নাসিরউদ্দিন সেদিন তার নরুন, চুন-হলুদের মলম এবং সুঁই সুতো নিয়ে এসে তিন ঘণ্টায় দশটি মোরগের বিশটি বিচি বের করে আনে এবং গ্রামের লোকেরা, বাপু খুব কামের ছাওয়াল হইছ দেহি, বলে তাদের মোরগের বাচ্চা নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তার পরদিন সকালে যখন আরো বিশ জন কৃষককে মোরগের বাচ্চা হাতে অপেক্ষা করতে দেখা যায়, তখন মোল্লা নাসিরউদ্দিন বিব্রত বোধ করে, সে বলে যে, তার সময় নাই, গ্রামের সব লোকের জন্য সে এ কাজ করতে পারবে না। কিন্তু গ্রামের লোকেরা তার কথায় কর্ণপাত করে না, তরা মিয়াবাড়ির বৈঠকখানার সামনে ভিড় করে বসে থাকে, এবং বেলা যখন বাড়তে থাকে কিন্তু লোকগুলো তবুও ওঠে না তখন মোল্লা নাসিরউদ্দিন তার সরঞ্জাম নিয়ে আসে। এদিন প্রথম কৃষকটি, তার মোরগ খাসি করার কাজ সমাপ্ত হলে লুঙ্গির খুঁট থেকে এক আনার একটি মুদ্রা বের করে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের সামনের সরার উপর রাখে, এবং এই দ্বিতীয় দিন মোল্লা নাসিরউদ্দিনের সরায় বাচ্চা মোরগের চল্লিশটি অণ্ডকোষ এবং এক আনার বিশটি মুদ্রা জমা হয়। এরপর রৌহা থেকে, বিশ্বাসপাড়া এবং কুমারচর থেকে, চকনূর এবং ধর্মদাসগাতি থেকে, সুরধ্বনি এবং তেবাড়িয়া থেকে কৃষকেরা মোরগের বাচ্চা হাতে সুহাসিনীর মিয়াবাড়িতে এসে হাজির হয়। এভাবে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের শৈশবে সুহাসিনী এবং এর আশপাশের গ্রামের মোরগকুল নপুংসক হতে থাকে, নাসিরউদ্দিনের বাঁশের চোঙে বাড়তে থাকে জমানো

মুদ্রার সংখ্যা, এবং মোল্লা নাসিরউদ্দিন এগিয়ে যায় তার জীবনের একটি পরিণতির দিকে। প্রথম মোরগটি নপুংসকে পরিণত হওয়ার দুবছর পর সুহাসিনীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বসবাসকারী মোবারক আলির মেয়ে বালিকা দুলালি একদিন একটি মোরগের বাচ্চা কোলে করে মিয়াবাড়ির উঠোনে দুপুরের রোদের ভেতর এসে দাঁড়ায়, এ সময় বালক নাসিরউদ্দিন একটি গাব গাছের মগডালে উঠে পাকা গাব পেড়ে খাচ্ছিল, সেখান থেকে সে দুলালিকে মোরগ কোলে তাদের প্রাঙ্গণে দেখে এবং চিৎকার করে তাকে ফিরে যেতে বলে, কাইল বিয়ানে আসিস। কিন্তু দুলালি যখন নড়ে না তখন সে নেমে এসে উঠোনের এক কিনারায় গাছতলায় নরুন নিয়ে বসে। সেদিন নাসিরউদ্দিন যখন তার কাজ করতে থাকে, বালিকা দুলালি তার গায়ের ফর্সা রঙের বিষয়ে উৎসাহী হয়ে পড়ে, তুমি এমন ধলা ক্যা, সে বলে। নাসিরউদ্দিন বলে যে, এটা একটা রোগ; কিন্তু দুলালি তার পরিহাস বুঝতে পারে এবং তখন নিজের গায়ের শ্যামলা রঙের কথা তার মনে পড়ে, তার বালিকা হৃদয় এ কারণে দুঃখে ভরে যায়, নাসিরউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে সে অকপটে বলে, আমি এমন কালা যে আমার বিয়াই হইব না! নাসিরউদ্দিন তখন মোরগের পেটের ভেতর আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বিচি দুটোর অবস্থান ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিল, দুলালির কথা শুনে তার মজা লাগে এবং মাথার ভেতর নিষ্ঠুর বদমায়েশি উঁকি দেয়; সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলে যে, দুলালি ইচ্ছে করলে গায়ের রঙ পরিষ্কার করতে পারে, দেখ না আমি এহন কেমন ধলা হয়্যা গেছি, আগে কত্তো কালা আছিলাম! দুলালির তখন বিভ্রান্তি হয়, মোল্লা নাসিরউদ্দিন আগে কখনো কালো ছিল কি না তা সে মনে করতে পারে না, সে বোকাটেভাবে হাসে এবং বলে, কেমন কইর‍্যা ধলা হইছো? নাসিরউদ্দিন তখন জীবনে প্রথম এবং শেষবারের মতো এই বালিকাকে প্রতারণা করে, সে বলে যে, মোরগের ডিম খেয়ে খেয়ে সে ফর্সা হয়েছে এবং সে তখন তার সামনে চিৎ করে রাখা মোরগের পেটের ভেতর থেকে দুটো বিচি বের করে সরার উপর রাখে এবং বলে, এই দেখ মোরগার আন্ডা, এই দুইটা যুদি তুই কাঁচা খায়া ফালাইস তাইলে তুই অনেক ফর্সা হয়া যাবি! নাসিরউদ্দিন দুলালির হাতে মোরগটা ভালোমতো ধরিয়ে দেয় এবং একটি কলাপাতায় মুড়িয়ে মোরগের ছিন্ন অণ্ডকোষ দুটো বালিকার শাড়ির আঁচলে বেঁধে দিয়ে বলে, কাউক কইস না, বাড়িত যায়া এই দুইট্যা টপ কইর‍্যা খায়া ফালাবি, তাইলে তুই ফর্সা হয়া যাবি, আর পট কইর‍্যা তর বিয়া হয়া যাইব! সুহাসিনীর লোকেরা এই সব গল্প শোনে এবং তারা দেখে যে, মোরগের বিচি খাওয়ার পরও দুলালির বিয়ে হয় না, সে বিয়ে ছাড়াই মরে যায় এবং মোল্লা নাসিরউদ্দিন তার বালক বয়সের এই বদমায়েশির মাশুল গোনে, মোরগের অণ্ডকোষ-খেকো দুলালির স্মৃতির ভেতর তার মায়ের নিশিগ্রস্ততার মতো আজীবন ঘুরপাক খায়। সেদিন সঙ্গে পয়সা না থাকায় অন্যান্য কৃষকের মতো মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে পয়সা না দিয়ে দুলালি দুহাতে তার খোজা করা মোরগটিকে চেপে ধরে সুহাসিনীর দক্ষিণ-পশ্চিম কিনারায় নিজের

বাড়ির ভিটায় ফিরে আসে, তখন সে তার পিতা মোবারক আলি, মা ছমিরুন্নেছা এবং সাত ভাইকে তাদের উঠোনে দাঁড়ানো দেখতে পায়। দুলালিকে দেখে তাদের উৎকণ্ঠা দূর হয়, তারপর দুলালি যখন তাদেরকে বলে যে, সে তার কোলের মোরগটিকে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কাছ থেকে খাসি করে এনেছে, তখন তারা হেসে ওঠে, তাদের বাড়িতে স্থাপিত কাপড়ের দশটি তাঁতের খটাখট শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যায় সেই হর্ষধ্বনি। দুলালির সাত ভাই তার দিকে এগিয়ে আসে এবং শীঘ্রই দেখা যায় যে, তার সবচাইতে বড় ভাই আব্দুল জলিলের বাহুর ভেতর দুলালি দোল খায়; কিন্তু এর একটু পরেই মোবারক আলির সাত ছেলে বাড়ির প্রাঙ্গণে পুনরায় জড়ো হয় যখন তারা এই খবর শুনতে পায় যে, দুলালি হঠাৎ করে বমি করতে শুরু করেছে। দুলালির বমি করা দেখে ছমিরুন্নেছা প্রথমে ভয় পেয়ে যায়, তারপর দুলালিকে প্রশ্ন করে সে যখন এই তথ্য উদ্ধার করে যে, সে মোরগের দুটো ছিন্ন অণ্ডকোষ খেয়ে নিয়েছে, তখন সে দুলালির গলার ভেতর আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে আরো বমি করায়। অল্প অল্প করে মোট তিনবার বমি হয়ে যাওয়ার পর ছমিরুন্নেছা মেয়েকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাশে বসে থাকে, তার কালো বালিকা কন্যার কাছ থেকে বিকেলের ঘটনাবলির বিশদ বর্ণনা শোনে এবং দুলালি যখন বলে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিন তাকে বলেছে মোরগের বিচি খেলে গায়ের রঙ ফর্সা হয়, তখন সন্তানের জন্য ছমিরুন্নেচার মন বেদনায় আপ্লুত হয়ে আসে এবং বদমাশ বালকের প্রতি ক্রোধ হয়। দুলালি তখন রসিকতাটি পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও ক্রমাগতভাবে বিষয়টি তার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসে, মোরগের কাঁচা বিচি খেয়ে নেয়ার কথা ভেবে দিনে দিনে তার অস্তিত্ব লজ্জিত হয়ে ওঠে এবং মোল্লা নাসিরউদ্দিনের ওপর তার রাগ হয়। মোল্লা নাসিরউদ্দিনের ওপর প্রতিশোধ ওঠানোর জন্য তাকে একটি বছর অপেক্ষা করতে হয়, যখন একদিন রায়গঞ্জ থেকে স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার সময় সুহাসিনীর দিক্ষণ-পশ্চিম কোনায় খালের পাড়ে এসে দুলালি আটকে যায়, এখানে যে কলার ভেলায় করে মানুষ পানি পার হয় সে সেটা দেখতে পায় না, এবং এই সময় মোল্লা নাসিরউদ্দিন রায়গঞ্জের দিক থেকে এসে খালের পাড়ে দুলালিকে বসে থাকতে দেখে।

গ্রামের খালটির কথা প্রায়ই মনে হয়, যে খালটি রৌহার বিলের পানি থেকে উৎসারিত হয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে একটি হাতের আঙুলের মতো বিস্তৃত হয়ে গেছে। যে পূর্ণিমা রাতে মফিজুদ্দিন মিয়া নিহত হয়, তারপর ক্রমান্বয়ে গ্রামের লোকেরা সব জানতে পারে এবং তখন তারা এই তথ্যটি অবগত হয় যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার আততায়ীরা এই খাল বেয়ে উঠে আসে। গ্রামের লোকেরা এই কথা বলে যে, পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘটনার দিন ধানঘড়ার উত্তরে শিমলা গ্রামের পাশে করতোয়া নদীর পশ্চিম কিনার ঘেঁষে ছটি নৌকো সারা দিন পড়ে থেকে কুমিরের মতো রোদ পোহায়,

তারপর রাত গভীর হয়ে এলে ছৈতোলা মাঝারি আকারের এই নৌকোগুলোকে কেউ কেউ দেখে দড়ি খুলে নিঃশব্দে ভাটির দিকে নেমে যেতে। নৌকোগুলো ধানঘড়া বাজারের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত নেমে আসার পর পূর্ব দিকে প্রবাহিত খালে প্রবেশ করে, তারপর লক্ষ্মীকোলা গ্রামের কাছে রৌহার বিলের ভেতর পড়ে, এখান থেকে নৌকোগুলো বিলের পানির ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মিয়াবাড়ির পেছনে খালের ধারে ভেড়ে; এবং আততায়ীদের আগমন-পথের কথা শুনে সুহাসিনীর লোকেরা অদৃষ্টের এই পরিহাসের বিষয়ে সচেতন হয় যে, সুহাসিনীর এই খালতো মূলত মফিজুদ্দিনই কেটেছিল। সুহাসিনীর প্রবীণ লোকদের তখন তাদের শৈশবের কথা মনে পড়ে, যখন প্রতি বছর খরায় তাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এবং যখন একদিন মফিজুদ্দিন এবং তার যুবক বন্ধুরা মিয়াবাড়ির বৈঠকখানায় বসে সলাপরামর্শ করার পর কোদাল হাতে মাঠের মাঝখানে গিয়ে ডাক দেয় এবং তারপর গ্রামের তাবৎ লোক কোদাল হাতে করে মফিজউদ্দিনের পিছন পিছন রৌহার বিলের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের মনে পড়ে, সেদিন মহির সরকারের ভিটা এবং মিয়াবাড়ির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে রৌহার ধারে পৌঁছে মাটির বুকে কোদালের কোপ বসিয়ে দিয়ে মফিজুদ্দিন বলে, কাটো; তখন সুহাসিনীর খরাপীড়িত কৃষকেরা ধপাধপ শব্দ করে মাটি কাটতে শুরু করে এবং তারা যখন খালটি জাহাঁ বক্সের বাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে আনে, তারা দেখে যে, খালের ঠিক মাথায় আসকার আলির ভিটা পড়ে যায়, তারা তখন মাটি কাটায় ক্ষান্ত দিয়ে মিয়াবাড়িতে উঠে আসে এবং উঠোনে বসে তামাক টানে এবং তখন মিয়াবাড়ির বৈঠকখানায় মাটির মেঝের উপর কয়লা দিয়ে আঁক কষে মফিজুদ্দিনসহ সাত জন যুবক ঠিক করে খালের ধারা কোন দিক দিয়ে কোন দিকে যাবে; পরিণতিতে সুহাসিনীর মাঠের ভেতর দিয়ে, মিয়াবাড়ির বৈঠকখানার লেপা মেঝেয় আঁকা নকশার মতো, পানি ভরা একটি বিস্তৃত খাল ফুটে ওঠে। সুহাসিনীর লোকেরা, এখন, যখনই এই ইতিহাস স্মরণ করে, তারা বলে যে, তাদের গ্রামের খাল, যে খালটি রৌহার বিল থেকে উৎপন্ন হয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো প্রবাহিত, তাদের পূর্বপুরুষেরা চার বছর পরিশ্রম করে খনন করেছিল। তারা তাদের বয়স্ক আত্মীয়দের কাছ থেকে, যারা এই খাল কাটায় অংশ নিয়েছিল, শুনেছিল যে, নয়নতারার হাট লাগানো এবং তারপর খরাপীড়িত লোকদের জন্য এই খাল কাটার কাজের দ্বারা মফিজুদ্দিন সুহাসিনীতে তার স্বাভাবিক নেতৃত্বের গুণ প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা করতে পারে; কিন্তু তারা এ কথাও ক্রমাগতভাবে জানতে পারে যে, দীর্ঘদিন পূর্বে সুহাসিনীর বাড়িঘর এবং ফসলের মাঠের ওপর দিয়ে কাজিদের পাগলা কুকুর তাড়া করে ফেরার ঘটনার ভেতর সুহাসিনীর লোকেরা মফিজুদ্দিনের যে একরোখামি একদা দেখেছিল, তা মফিজুদ্দিনের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত টিকে থাকে এবং পরবর্তীকালে অনেক সময়ই তা সুহাসিনীর লোকদের জন্য সুখকর হয় না। সুহাসিনীর প্রবীণ লোকেরা বলে যে, খরার বছরগুলো আঙুলের

মতো বিস্তৃত খাল বেয়ে রৌহার পানি জীবনের আশ্বাসের মতো গ্রামের চতুর্দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল, যেন করুণাময়ী মায়ের একটি শীতল হাত স্থাপিত হয়েছিল সুহাসিনীর মাথার ওপর। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খালের পানির আশীর্বাদের বিপরীত দিকটি সুহাসিনীর লোকদের নিকট প্রকাশিত হয়, যখন করতোয়া নদীর বন্যার পানি রৌহার বিল থেকে খালের ভেতর দিয়ে জেগে উঠে তাদের ফসলের মাঠ এবং বসতবাড়ি প্রতি বছর প্লাবিত করে দিতে থাকে। তখন একটা কিছু করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সুহাসিনীর লোকেরা ভাবে যে, মফিজুদ্দিন হয়তো কিছু একটা করবে, কিন্তু মফিজুদ্দিন এবার কিছু করে না; বরং গ্রামের লোকেরা দেখে যে, মফিজুদ্দিন এই খাল কাটার কীর্তির কথা ক্রমাগতভাবে বলে চলে। তখন অনেক দিন অপেক্ষা করার পর গ্রামের লোকেরা মিলিত হয় এবং মফিজুদ্দিন ও সেই ছজন লোককে, যারা অনেক দিন আগে একদা মিয়াবাড়ির বৈঠকখানায় বসে এই খালের ছক কেটেছিল, তাদের এই নূতন দুর্গতির বিষয়ে কিছু একটা করতে বলে; তারা তাদেরকে বলে যে, সেচের পানি পাওয়ার চাইতে বানের পানি আটকানো এখন জরুরি হয়ে পড়েছে, এই খালটি তাই ভরাট করে ফেলা দরকার। খাল কাটার মূল স্থপতিদের ভেতর মফিজুদ্দিন ছাড়া অন্য ছজন বিবেচনা করে দেখে যে, বহুদিন গ্রামে খরা নাই, বরং প্রতি বছর বন্যার পানির প্রকোপ হয়; তারা তখন ভাবে যে, এই ক্রমাগত বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খালের উৎসস্থল ভরাট করে দেয়া যায়, তাহলে রৌহা বিলের পানি বর্ষার সময় খালে প্রবেশ করে ফসলের মাঠে উপচে পড়া বন্ধ হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকর করা যায় না, কারণ, মফিজুদ্দিন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সম্মত হয় না, এই খাল বন্ধ না করে দেয়ার পক্ষে তার যুক্তি ছিল দুটো, এক, বন্যা কোনো চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়, এখন বন্যা হচ্ছে কিন্তু পরে হয়তো বন্যা হবে না; এবং দুই, এখন খরা না থাকলেও, অনেকদিন আগে যেমন এই গ্রাম খরার প্রকোপের কবলে পড়েছিল আবার কখনো তেমন খরা দেখা দেবে না, তা কেউ বলতে পারে না। সুহাসিনীর লোকেরা বন্যার বিপর্যয় আটকানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝে কিন্তু মফিজুদ্দিনের দেয়া যুক্তির উত্তর কেউ দিতে পারে না; সে তার জীবৎকালে এ ব্যাপারে কারো কথা শোনে না, গ্রামের বন্যাক্রান্ত চাষিদের ঘোলা মুখের দিকে নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে পরবর্তী ত্রিশ বছর সুহাসিনীর ভেতর দিয়ে কাটা এই খালের সাফল্য এবং উপকারিতার কথা বলে চলে। সে বলে, এই গাঁওয়ে তোমাগোরে ভালোর নেইগ্যা আমি কি সব সময় চিন্তা করি নাই? সুহাসিনীর বন্যাপীড়িত লোকেরা বলে, হেঁ হইরছেন; মফিজুদ্দিন তখন ক্রমাগত সব প্রশ্ন করে যায় এবং গ্রামের লোকেরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সে গ্রামের মানুষের জন্য এ সবকিছুই করেছে, তখন বন্যার হাত থেকে বাঁচার শেষ আশাটুকু নির্বাপিত করে দিয়ে সে বলে, তাইলে, এই বইন্যা আর এই খালের ব্যাপার আমার উপুর ছাইড়্যা দেও, দরকার হইলে আমিই তোমাগোর খাল বুজায়া দিব্যার কমু। তখন এক সময় সুহাসিনীর লোকেরা বুঝতে পারে যে,

সুহাসিনীতে বন্যা এবং মফিজুদ্দিন মিয়াকে গ্রহণ করেই তাদেরকে বাঁচতে হবে; এবং যে দিন মফিজুদ্দিন মিয়ার পতনের খবর গ্রামের লোকেরা শোনে তারা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারপর তারা যখন জানতে পারে যে, আততায়ীরা রৌহার ভেতর দিয়ে, কাটা খাল বেয়ে এসে মিয়াবাড়ির ভিটার পেছনের ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে ছিল, তারা খুব বিভ্রান্ত বোধ করে; তখন তাদের এ খালের ইতিহাস মনে পড়ে, তাদের মনে পড়ে যে, এই খাল মফিজুদ্দিনের খুব প্রিয় ছিল, এ নিয়ে তার অনেক গর্ব ছিল; কারণ, তাদের মনে পড়ে যে, উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে করিম খাঁর পরিবারের সঙ্গে মফিজুদ্দিন মিয়ার সংঘাত যখন প্রকাশিত হতে থাকে তখন সে একদিন নয়নতারা হাটে গিয়ে হাজির এবং পুরনো কড়ুই গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাটে উপস্থিত গ্রামবাসীকে দুহাত উঁচু করে কাছে ডেকে আনে এবং বহুদিন পূর্বের মতো তার চতুর্দিকে জড়ো হয়ে আসা মানুষের মাথার ওপর দিয়ে তার দীর্ঘ বাহু পুনরায় ছড়িয়ে দিয়ে বলে যে, সুহাসিনী এবং আশপাশের গ্রামের মঙ্গলের জন্য সে তার পুরো জীবন ব্যয় করেছে, মানুষের সঙ্গে থেকেছে সব সময়, এবং তখন সে পুনরায় সেই খালটির কথায় ফিরে আসে। এই খালটি খরাপীড়িত মানুষের মঙ্গলের জন্য গ্রামের সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাটার গল্প যখন সে বলে, সুহাসিনীর বন্যা-পীড়িত মানুষ বিমূঢ় বিস্ময়ে দেখে যে, শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ মফিজুদ্দিনের নিষ্প্রভ ঘোলা চোখে বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলো কেমন চকচক করে ওঠে এবং তখন হাটে উপস্থিত লোকেরা বুঝতে পারে যে, মফিজুদ্দিন যে তাদের নূতন উপজেলার চেয়ারম্যান হবে সে বিষয়ে কোনো ভুল নাই। কিন্তু আততায়ীর গুলি মফিজুদ্দিনকে থামায় এবং ইদ্রিস খাঁ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান হয়, তারপর জেল থেকে ফিরে আসার পর যেদিন বিকেলে সে মিছিল করে সুহাসিনীতে এসে নয়নতারা হাটে দাঁড়িয়ে এই হাটের নাম পাল্টে করে রসুলপুরের হাট, সেদিন সেখানে সমাগত জনতার উদ্দেশে সে বলে যে, সুহাসিনীর দুঃখ ওই খাল বন্ধ করার ব্যবস্থা সে করবে। কিন্তু সুহাসিনীর লোকেরা পরে এই কথা বলে যে, তারা সম্ভবত সেদিন বিকেলে ইদ্রিস খাঁর কথা বুঝতে পারে নাই; কারণ, তারা দেখে যে, রৌহার বিলের সঙ্গে এই খালের সংযোগস্থল বন্ধ না করে ইদ্রিস খাঁ গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়, যেখানে বহুদিন পূর্বে মোল্লা নাসিরউদ্দিন একদিন ঘাড়ে করে দুলালিকে খালের পানি পার করেছিল, সেখানে মাটি কাটার কাজ শুরু করে। তখন সুহাসিনীর লোকদের রায়গঞ্জ থেকে আসা এই রাস্তাটির কথা মনে পড়ে, রাস্তাটি রায়গঞ্জ থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে এসে এই খালের কারণে কাটা পড়ে যায়; রাস্তাটা খাল পার হয়ে আসতে পারলে সেটা সোজা গিয়ে সুরধ্বনি গ্রামকে রায়গঞ্জের সঙ্গে যুক্ত করত। এই রাস্তার বিষয়টি সুহাসিনীর লোকদের কাছে আর এক রহস্য হয়ে থাকে, তারা এই কথাটি কখনো বুঝতে পারে না যে, মফিজুদ্দিন কেন এই রাস্তাটিকে সোজা সুরধ্বনির দিকে এগিয়ে যেতে দেয় না, তবে তাদের অনেকে বলে যে, এটা হয়তো ছিল মফিজুদ্দিন মিয়ার একটি খেয়াল; কিন্তু অন্য

একদল লোক এই কথা বলে যে, মফিজুদ্দিনের মনে ছিল এক গভীর ক্ষত, যে ক্ষতের কথা প্রকাশ করার সাহস এবং সুযোগ তার ছিল না। এই রাস্তাটি সোজা খাল পার হয়ে এসে সুরধ্বনি গ্রামের দিকে যেতে চাইলে, তাঁতের মালিক মোবারক আলির পোড়োভিটার ওপর দিয়ে তা যেত, এবং মফিজুদ্দিন মিয়া চায় নাই যে, এই রাস্তা মোবারক আলির পোড়োভিটার ওপর দিয়ে যাক। কারণ, এই পোড়োভিটার ওপর এক সারিতে রচিত হয়েছিল ছটি মাটির কবর, এবং এই কবরের সারির সর্বোত্তরে জামগাছের ছায়ায় ঢাকা কবরটি ছিল দুলালির, মোল্লা নাসিরউদ্দিন যাকে একদিন ঘাড়ের ওপর তুলে রাস্তার এই কাটা জায়গায়, খালের কোমরসমান পানি পার করেছিল।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে পানি পার হওয়ার ভেলা না পেয়ে দুলালি রাস্তার এই জায়গায় খালের কিনারায় বসে ছিল, তখন মোল্লা নাসিরউদ্দিনের জীবনের চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটে; সে রায়গঞ্জের দিক থেকে এসে হাজির হয় এবং কিছু না বুঝে এতে জড়ায়। কলার ভুরাটা না থাকায় পানি পার হওয়ার অন্য উপায় যখন সে দেখে না, সে বালিকা দুলালিকে ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়ে সন্তর্পণে খালের পানিতে নেমে আসে এবং ক্রমাগতভাবে গভীরতার দিকে এগোয়। পানি যত বাড়তে থাকে সে তার পরনের লুঙ্গিটাও টেনে ওপরের দিকে ওঠায়, এভাবে পানি যখন তার কোমরসমান হয় সে তার লুঙ্গি উল্টে বুকের কাছে জড়ো করে ধরে, পানির ভেতর তার নগ্ন নিম্নাঙ্গ ঢাকা পড়ে থাকে এবং ঘাড়ের ওপর তার মাথা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে দুলালি। তারপর গভীর পানি পার হয়ে এলে, অন্য কূলের দিকে পানি যখন আবার কমতে থাকে, সে তার লুঙ্গিও নিচে নামিয়ে আনে। কূলে নেমে কয়েক পা বাড়ির দিকে হাঁটার পর দুলালি বিষয়টি লক্ষ করে, সে দেখে যে, তার পা বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে; বালিকা মেয়েটি রক্ত দেখে প্রথমে হকচকিয়ে যায় তারপর সে তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করে বাড়ির দিকে ছোটে। নাসিরউদ্দিন বিষয়টি বুঝতে পারে না, দুলালিকে চিৎকার করে ছুটে যেতে দেখে সে পেছন পেছন যায় এবং হঠাৎ করে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দুলালিদের বাড়ির বাইরে মোবারক আলি তার রক্তাপ্লুত মেয়েকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তারপর সে মেয়ের ফ্রকের ঝালর তুলে ইজারের ভেতর থেকে রক্তের ধারা নেমে আসতে দেখে। এক মুহূর্তে মোবারক আলির গলার রগ ক্রোধে ফুলে উঠে, সে শুধু অস্ফুটে জিজ্ঞেস করে, কেড্যা হইরছে? তখন দুলালি আঙুল তুলে পিছনে আসা মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দেখিয়ে দেয়। মোবারক আলি একটু দূরে নীরবে দাঁড়ানো মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দেখে, তারপর একটি চিতা বাঘের মতো লাফ দিয়ে প্রাঙ্গণে পড়ে থাকা একটি বাঁশ তুলে নিয়ে অপেক্ষমাণ বালকের ওপর চড়াও হয়। হঠাৎ এই আক্রমণে নাসিরউদ্দিন হকচকিয়ে যায়, সে প্রথম একটা দুটো আঘাত হাত দিয়ে ঠেকায় তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দেয়; সেদিন সুহাসিনীর লোকেরা দেখে, মোবারক আলি রাস্তা এবং

মাঠের ওপর দিয়ে মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে তাড়া করে নিয়ে যায়। পলায়নপর নাসিরউদ্দিন নিজের বাড়ির নিকটবর্তী হলে মোবারক আলি তাকে প্রায় ধরে ফেলতে থাকে, এই অবস্থায় সে বাড়ির ভিটায় ওঠার চেষ্টা না করে পুকুরের দিকে দৌড় দেয় এবং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুহাসিনীর লোকেরা, সেদিন যারা মিয়াবাড়ির আশপাশে ছিল তারা এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পায়; নাসিরউদ্দিন সাঁতার কেটে পুকুরের এক ধারে পৌঁছার চেষ্টা করতেই মোবারক আলি ছুটে গিয়ে বাঁশ হাতে পুকুরের সেই প্রান্তে ডাঙায় দাঁড়ায়, আর এটা দেখে নাসিরউদ্দিন তখন পুনরায় উল্টোদিকে যায় এবং মোবারক আলিও একইভাবে দৌড়ে গিয়ে উল্টো দিকের ডাঙার ওপর অপেক্ষা করে। এই সময় কেউ, হয়তোবা মিয়াবাড়ির কোনো চাকর, মফিজুদ্দিনকে খবরটা দেয় এবং সে বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে এসে ছেলের এই দুরবস্থা দেখে। কিন্তু মোবারক আলি যখন তাকে সব কথা খুলে বলে, সে মোবারক আলির চাইতেও ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং প্রাঙ্গণের ওপর থেকে একটি বাঁশ কুড়িয়ে নিয়ে আসে, তারপর তারা দুজন মিলে মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে তাড়া করে। গ্রামের লোকেরা যারা পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপর কলাগাছের ঝোপ অথবা পেঁপে গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তারা দেখে যে, পুকুরের মাঝখানে একটি চুবানো মুরগির মতো মোল্লা নাসিরউদ্দিন মাথাটা পানির ওপর উঁচা করে রেখে চুপচাপ ভেসে আছে এবং পুকুরের দুপাশে পানির কিনারায় বাঁশ হাতে দাঁড়িয়ে আছে মফিজুদ্দিন ও মোবারক আলি। সুহাসিনীর লোকেরা যারা মিয়াবাড়ির পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দেখে, তারা তখন এই ঘটনার কারণ জানতে পারে না; তবে কয়েক দিন পর গ্রামের নারী এবং পুরুষেরা এ কথা জানতে পারে যে, মোবারক আলির দশ বছরের বালিকা কন্যা হায়েজবতী হয়েছে, এবং কয়েক দিন আগে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের ঘাড়ে চড়ে খালের পানি পার হওয়ার সময় তার প্রথম রক্তপাত ঘটে, তখন মোবারক আলি বিচার-বিবেচনা ছাড়াই মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে পুকুরের পানিতে ফেলে। গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, মোবারক আলি চিৎকার করে বাঁশ হাতে নাসিরউদ্দিনকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়ার পর দুলালি তাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তার মা ছমিরুন্নেসা রক্তাপ্লুত মেয়েকে দেখে বুঝতে পারে, তার কি হয়েছে; সে দুলালির সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়, তারপর বড় ছেলে আব্দুল জলিলকে পাঠায় তার পিতাকে ডেকে আনার জন্য। তখন মিয়াবাড়ির পুকুর পাড়ে তামাশা দেখায় রত সুহাসিনীর লোকেরা দেখে যে, আব্দুল জলিল এসে তার বাপের কানে কি কথা বলে, আর তার কথা শুনে মোবারক আলি হাতের লাঠি নামিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়। এই ঘটনার পর দুলালির বেশভূষার পরিবর্তন ঘটে; সুহাসিনীর লোকেরা তাকে সালোয়ার পরে স্কুলে যেতে দেখে বুঝতে পারে যে, দুলালি নারী হয়ে উঠেছে, যদিও তখনো সে একই সঙ্গে সমতলবক্ষা বালিকা মাত্র। দুলালিকে নিয়ে গ্রামে যেসব ঘটনা ঘটে, তার কারণে সুহাসিনীর মানুষের কাছে দুলালি খুব পরিচিত হয়ে ওঠে

এবং এই মেয়েটির মৃত্যুর পরও তারা তার কথা ভুলতে পারে না, বহুদিন বহুবার তার কথা তাদের মনে পড়ে। সুহাসিনীর লোকেরা এ কথা বলে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিনের ঘাড়ের ওপর ঋতুমতী হয়ে পড়ার বিষয়টির তাৎপর্য বালিকা দুলালি তখন বুঝতে পারে নাই, প্রকৃতির এই অবধারিত নিয়ম পালনের জন্য তার শরীর এবং মন তখনো প্রস্তুত হয় নাই, নিজের রক্তাপ্লুততার ঘটনার চাইতে নাসিরউদ্দিনকে তার বাপের বাঁশ নিয়ে তাড়া করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সে বেশি আগ্রহী হয়; তার মনে হয় যে, তাকে মোরগের বিচি খাওয়ানোর জন্য বালক মোল্লা নাসিরউদ্দিনের এটা প্রাপ্য ছিল। কিন্তু দুলালির মন দ্রুত পরিণত হয়ে ওঠে, তার দ্বাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই সে তার লজ্জার ব্যাপারটি বুঝতে পারে এবং তখন একদিন মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দেখার জন্য তার বুকের ভেতরটা ছটফট করে ওঠে; কিন্তু তখন গভীর রাত থাকায় সে মিয়াবাড়িতে যেতে পারে না, হারিকেন জ্বালিয়ে তার স্কুলের খাতায় লেখে, নাসির ভাই, তোমাক দেইখপ্যার ইচ্ছা কইরত্যাছে; এবং এই কাগজটা ছিঁড়ে শাড়ির আঁচলে বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, কোনো এক রাতে অন্ধকার ঘরের ভেতর নিদ্রিতা মায়ের সঙ্গে শুয়ে বালিকা দুলালির মনে সেই অসময়ে মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দেখতে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং তৎক্ষণাৎ তা সম্ভব না হওয়ার যে যন্ত্রণা জেগে ওঠে, সেই আকাঙ্ক্ষা এবং যন্ত্রণাই এই বালিকার জীবন বিপর্যস্ত করে দেয়। সেদিন রাতে চিরকুটটা আঁচলে বেঁধে সে আবার বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর সে হয়তো ঘুমায় অথবা ঘুমায় না, সকাল হওয়ার প্রতীক্ষা করে। পরদিন সকালে সে একটি মোরগের বাচ্চা নিয়ে মিয়াবাড়ির উঠোনে গিয়ে ওঠে এবং জানতে পারে যে, মোল্লা নাসির সিরাজগঞ্জ থেকে বাড়ি ফেরে নাই, এবং ব্যাখ্যার অতীত এক পীড়নে জর্জরিত এই বালিকাকে সিরাজগঞ্জে মাদ্রাসা-পড়ুয়া মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দেখার জন্য এক মাস উনত্রিশ দিন অপেক্ষা করতে হয়। সুহাসিনীর লোকেরা দুলালিকে একটি কালো রঙের চটপটে মোরগের বাচ্চা বুকের কাছে চেপে ধরে এই উনষাট দিনের প্রতিদিন মিয়াবাড়ির দিকে যেতে দেখে। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান যেদিন ঘটে, কাল-গণনার ষাটতম দিনে গ্রামের লোকেরা যখন জানতে পারে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিন গ্রামে ফিরেছে, তার পরদিন সকালে তেরো জন কৃষক মোরগ কোলে মিয়াবাড়ির ভিটায় এসে ওঠে এবং এদের সঙ্গে মোবারক আলির কিশোরী কন্যা দুলালিকেও দেখা যায়। কিন্তু সেদিন সকালে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের পক্ষে মোরগের অণ্ডকোষ খসানোর কাজ করা সম্ভবপর হয় না এবং উনষাট দিন অপেক্ষা করার পর নাসিরউদ্দিনকে একমুহূর্তের বেশি দেখার সুযোগ হয় না দুলালির। সেদিন সকালে তেরোজন কৃষক এবং কালো মোরগ কোলে দুলালি মিয়াবাড়ির ভিটার ওপর চারচালা টিনের বৈঠকখানার পাশে অপেক্ষা করার সময় বাড়ির ভেতর থেকে কলহের আওয়াজ শোনে এবং এক পর্যায়ে গরু তাড়ানোর পাচন দিয়ে মোল্লা নাসিরকে পেটাতে পটাতে তাড়া করে বাড়ির ভেতর থেকে মফিজুদ্দিন মিয়া

বাইরের প্রাঙ্গণে বের হয়ে আসে। তাড়া এবং মার খাওয়া নাসিরউদ্দিন তখন এক হাতে তার লুঙ্গি তুলে ধরে প্রাঙ্গণে মোরগ কোলে জড়ো হওয়া গ্রামের কৃষক এবং দুলালির সামনে দিয়ে দৌড় দেয় এবং ভিটা থেকে নেমে প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটে সুহাসিনীর গভীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুহাসিনীর সেইসব কৃষক, যারা সেদিন মিয়াবাড়ির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল, পরবর্তী সময়ে তাদের মনে পড়ে যে, মারমুখো মফিজুদ্দিন মিয়ার আগে আগে ছুটে বেরিয়ে আসা মোল্লা নাসিরউদ্দিনের লুঙ্গি উঁচিয়ে দৌড়ে পালানোর দৃশ্য দেখে তাদের হাসি পেয়েছিল; কিন্তু নাসিরউদ্দিনের চিৎকার শুনে দুলালি কাঁদতে শুরু করে। গ্রামের এই কৃষকেরা ভাবে যে, হৈ চৈ এবং মারামারি দেখে মেয়েটি হয়তো ভয় পেয়ে যায়, তখন তারা যখন তার কান্নার হেতু জানতে চায়, কি রে তুই ক্যা কান্দিস, তখন দুলালি বলে, এমনি কান্দি, এবং তারপর সে তার মোরগের বাচ্চাটা বুকে চেপে ধরে ধীরপায়ে ভিটা থেকে নেমে যায়। সেদিন সুহাসিনীর লোকেরা মোল্লা নাসিরউদ্দিনের বিদ্রোহের কথা জানতে পারে; তারা জানতে পারে যে, নাসিরউদ্দিন পিতার অনুমতি ছাড়াই মাদ্রাসা ত্যাগ করে সিরাজগঞ্জ শহরে বি. এল. স্কুলে ভর্তি হয় এবং খবরটা গোপন করে রাখে। তারপর একদিন, বালিকা দুলালির ঊনষাট দিন অপেক্ষার পর, বাড়ি ফিরে সকালবেলা সে যখন এই কথা প্রকাশ করে যে এতদিন সে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে নাই, দাখিল পরীক্ষার বদলে বি. এল. স্কুল থেকে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে এল, তখন তার পিতা, পৌঢ় এবং একরোখা মফিজুদ্দিন কথাটা বুঝতে পারামাত্র বেড়ার সঙ্গে গুঁজে রাখা গরুর পাচন তুলে নিয়ে তাকে প্রহার শুরু করে এবং সুহাসিনীর তেরোজন কৃষকের সম্মুখ দিয়ে নাসিরউদ্দিন চিৎকার করতে করতে ছুটে পালায়, আর দুলালি কালো মোরগের ছানাটি বুকে চেপে ধরে কাঁদতে শুরু করে; এবং সুহাসিনীর লোকেরা পরবর্তীকালে বলে যে, দুলালির এই কান্না যেন আর শেষ হয় না, তার এই কান্না যেন তার মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পরদিন সকালে মিয়াবাড়ির ভিটায় দুলালিকে পুনরায় উঠে আসতে দেখা যায়, নাসিরউদ্দিন উঠোনে জড়ো হওয়া কৃষকদের মোরগের মুষ্ক ছেদন করলে তারা চলে যায়, তখন দুলালি তার মোরগটি বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। নাসিরউদ্দিন দুলালির মোরগের গায়ে হাত দেয় না, সে তার চোখের দৃষ্টি নিষ্ঠুরের মতো কঠিন করে এনে বলে, তর মোরগ নিয়া বাড়িত যা ছেমড়ি, এবং মোরগ খাসি করার সরঞ্জামাদি একটি কাপড়ে জড়িয়ে বাঁধে; তখন নাসিরউদ্দিনের এই আচরণে দুলালির চোখ পানিতে ভরে আসে, সে তার আঁচলের খুঁট খুলে বেঁধে রাখা চিরকুটটা নাসিরউদ্দিনকে লক্ষ করে ছুড়ে মারে, তারপর ছুটে পালিয়ে যায়। নাসিরউদ্দিন দুলালির ছুড়ে দেয়া, ভাঁজ করা কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে, তোমাক দেইখপার ইচ্ছা কইরতাছে নাসির ভাই, এবং কাগজের টুকরোটি ছিঁড়ে দূরে ফেলে দেয়; তাকে বাঁশের লাঠি নিয়ে তাড়া করে পুকুরের পানিতে ফেলার জন্য দুলালির বাপের অপরাধের কথা সে ভুলতে পারে না। সেবার সুহাসিনীতে নাসিরউদ্দিন দুমাস থাকে, সে

মিয়াবাড়ির উঠোনে প্রতিদিন সকালে জড়ো হওয়া লোকদের মোরগের বিচি কেটে বের করে, কিন্তু দুলালির কালো মোরগের পেট অকর্তিত থেকে যায়। প্রতিদিন ভীরু পায়ে এসে দুলালি একটু দূরে দাঁড়ায়, নাসিরউদ্দিন যখন সব কাজ শেষ করে ফেলে কিন্তু তার দিকে তাকায় না তখন তার চোখে প্লাবন আসে এবং প্রতিদিন সে তার শাড়ির আঁচলের খুঁট খুলে একটি চার ভাঁজ করা কাগজ নাসিরউদ্দিনের মুখের ওপর ছুড়ে মেরে পালিয়ে যায়; নাসিরউদ্দিন প্রতিদিন একই বাক্য লেখা এক লাইনের একটি করে চিরকুট পড়ে এবং ভালোমতো কিছু না বুঝে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। নাসিরউদ্দিন যদিও একষট্টি দিন গ্রামে থাকে, সাতান্ন দিন পর দুলালি মনে হয় যেন তার প্রান্ত সীমায় পৌঁছায়; এদিনও নাসিরউদ্দিন যখন দুলালির মোরগ স্পর্শ করতে অস্বীকার করে, দুলালির চোখ পুনরায় পানিতে ভরে ওঠে এবং সে তার শেষ চিরকুটটা ছুড়ে মেরে পালিয়ে যায়। নাসিরউদ্দিন দুলালির লেখা এই সাতান্নতম চিরকুটটিতে একটি ভিন্ন বাক্য দেখতে পায়, কাঠপেন্সিল দিয়ে দুলালি লেখে, হারামযাদা তুমি আমাক মোরগের বিচি খাওয়াও নাই! তখন, এতদিন পর যেন মোল্লা নাসিরউদ্দিনের সম্বিৎ ফিরে আসে, তার চোখের আলো নরম এবং চপল হয়ে ওঠে, ঠোঁটে চাপা হাসি স্ফুরিত হয় এবং তারপর পূর্বের মতো সে চিরকুটটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু নাসিরউদ্দিন জানতে পারে নাই যে, তার হৃদয় যখন হেসে ওঠে তখন বালিকা দুলালি তার দুঃসাহস এবং লজ্জার প্রান্তে পৌঁছে ছিল; পরদিন সকালে নাসিরউদ্দিন তাদের উঠোনে দুলালিকে দেখতে পায় না, এবং সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, পরবর্তী কয়েক দিন নাসিরউদ্দিনের কাতর চোখ তাদের প্রাঙ্গণের ওপর মোরগের বাচ্চা কোলে দুলালিকে খুঁজে ফেরে; কারণ, তারা বলে যে, এই সময় মোল্লা নাসিরউদ্দিনের ভেতর একধরনের অস্থিরতা এবং অন্যমনস্কতা দেখা যায়, যার ফলে এই কয়েক দিন পেটের ভেতর আঙুল দিয়ে ছেঁড়ার সময় তিনটি মোরগের বিচি গলে যায় এবং একটি মোরগের বিচির সঙ্গে সে নাড়ি টেনে বার করে আনে, যা এর আগে তারা একবারও ঘটতে দেখে নাই; গ্রামের লোকদের এই কথা এবং অনুমান হয়তো সত্য ছিল, যদিও প্রথমে মনে হয়েছিল যে, তা সত্য নয়। মোল্লা নাসিরউদ্দিন এক বৃহস্পতিবার সুহাসিনী ত্যাগ করে সিরাজগঞ্জ গিয়ে কলেজে ভর্তি হয় এবং পরবর্তী একটি বছর সে, মাত্র এগারো মাইল দূরে নিজ গ্রামে ফেরে না। পরবর্তী বর্ষায় সে যখন ফেরে, হেঁটে না এসে, ট্রেনে করে উল্লাপাড়া এবং সেখান থেকে বাসে করে সে রায়গঞ্জ এসে নামে, তারপর দুমাইল পথ পায়ে হেঁটে সে যখন সুহাসিনীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভরা খালের পাড়ে এসে দাঁড়ায়, দুলালিকে ঘাড়ে তুলে খাল পার করার কথা তার মনে পড়ে এবং তখন তার মনে পড়ে দুলালির ছুড়ে দেয়া সাতান্নটি চিরকুটের কথা। তখন কলার ভুরার দড়ি টেনে খাল পার হয়ে সে দুলালিদের বাড়ির পথের ধারে একটা ঝোপের পাশে বসে থাকে, এভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর যখন দুপুরের সূর্য হেলে পড়তে থাকে, দুলালিকে দেখা যায় বুকের ওপর স্কুলের বই চেপে ধরে হেঁটে আসতে।

তখন মোল্লা নাসিরউদ্দিন কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ায় এবং দুলালি নিকটে আসার পর সে ঝোপের আড়াল থেকে ছোট একটা লাফ দিয়ে অকস্মাৎ দুলালির সামনে এসে পড়ে এবং সে দেখে, ভয় পেয়ে যাওয়া দুলালির খয়েরি রঙের মুখটা এক মুহূর্তের জন্য আতঙ্ক এবং বিস্ময়ে নীলাভ হয়ে ওঠে; তখন নাসিরউদ্দিন দুলালির মাথার ওপর দিয়ে দূরে রৌহার ঝিলমিলে পানির ওপর দৃষ্টি রেখে বলে, কাইল বিয়ানে আসিস। পরদিন সতেরো জন কৃষক তাদের মোরগের বাচ্চা নিয়ে মিয়াবাড়ির উঠোনে হাজির হয় এবং মোল্লা নাসিরউদ্দিন যখন প্রথম মোরগটির পেট কেটে উন্মুক্ত করে তখন সে দেখে, পুবের মেঠো পথ বেয়ে ভোরের নরম আলোর ভেতর থেকে দুলালি একটি উজ্জ্বল বর্ণের মোরগের বাচ্চা বুকে চেপে ধরে তাদের ভিটায় উঠে আসে। এই দিন নাসিরউদ্দিন দ্রুত কাজ করে, কত দ্রুত বলতে না পারলেও সুহাসিনীর লোকেরা বলে, খুব তাড়াতাড়ি; এমন জলদি এত্তগুলান মোরগের বিচি কাইট্যা আমাগোরে বিদায় কইর‍্যা দিল নাসিরদ্দি, থাইকলো খালি দুলালি। সুহাসিনীর কৃষকেরা বিদায় হয়ে যাওয়ার পর সেদিন নাসিউদ্দিনের সম্মুখে দুলালি মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে তার মোরগের বাচ্চাটা চিৎ করে ধরে, এবং নাসিরউদ্দিন যখন মোরগটার তলপেটের পালক খসাতে থাকে তখন সে বলে, তোমার মোচ হইছে, তখন নাসিরউদ্দিন ভূমিমুখী দৃষ্টি উঠিয়ে তার মুখের কাছে উঁচু হয়ে থাকা বালিকার মুখের ওপর স্থাপন করে এবং সে তখন সেই মুখে কি দেখে, তা আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারে না, সেই কালো বালিকার মুখে কি আলোর বর্ণ অথবা স্বপ্নের ঘোর ছিল, নাসিরউদ্দিন পুরোপুরি তা বুঝতে পারে না; সে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে এবং বলে, মোচ আমার হইব না তো কি তর হইব! তারপর সে ঈষৎ গোলাপি রঙের দুটো বিচি বের করে সামনে সরার ওপর রাখে এবং পেট সেলাই করে চুন মেশানো বাটা হলুদ লাগিয়ে দিয়ে মোরগের বাচ্চাটা দুলালির হাতে তুলে দেয়। দুলালি মাটির ওপর হাঁটু ভেঙে রেখে শরীর সোজা করে, আঁচলের গিঁট থেকে ভাঁজ করা চৌকো এক টুকরো কাগজ খুলে নিয়ে সরার ওপর মোরগের ছত্রিশটি ছিন্ন অণ্ডকোষের পাশে রাখে, তারপর উঠে নাসিরউদ্দিনের দৃষ্টিরেখার ওপর দিয়ে ভিটার বাইরে প্রান্তরের প্রকাশিত রোদের ভেতর নেমে যায়। নাসিরউদ্দিন মাটির সরার ওপর থেকে তার সেদিনকার উপার্জন সতরোটি এক আনার মুদ্রা এবং চারকোণা করে ভাঁজ করা কাগজের টুকরাটা তুলে নেয়, পয়সাগুলো পকেটে রাখে এবং একটু সন্তর্পণে কাগজের টুকরাটা ভাঁজ খুলে মেলে ধরে; সেই চিরকুটে কাঠপেন্সিল দিয়ে একটি বাক্য লেখা ছিল, কেমন আছ তুমি নাসির ভাই। নাসিরউদ্দিন এবার চিরকুটটা ছিঁড়ে ফেলে না, সে সেটা ঘরে নিয়ে তার কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগের ভেতর রেখে দেয় এবং এভাবে তার জীবনে চিরকুট সংগ্রহ শুরু হয়। পরদিন মুষ্ক ছেদন করা আর একটি মোরগের বাচ্চা বুকে চেপে ধরে সম্মুখে স্থাপিত মাটির সরার ওপর পূর্বদিনের মতো একটি ভাঁজ করা ছোট্টো চৌকো কাগজ রেখে দুলালি চলে যায়

এবং নাসিরউদ্দিন সেটা চোখের সামনে মেলে ধরে দেখে যে, দুলালি একই কাঠপেন্সিল দিয়ে, একই খাতার পাতা ছিঁড়ে, একই বাক্য রচনা করেছে, তুমি কেমন আছ নাসির ভাই। নারিউদ্দিন এবার সাত দিন সুহাসিনীতে থাকে, ছয় দিন দুলালি তাকে ছটি চিরকুট দেয়, তাতে একটি বাক্যই সে ক্রমাগতভাবে লিখে যায়, তুমি কেমন আছ, কেমন আছ তুমি, আছ কেমন তুমি! সপ্তম দিন সকালে পাঁচ জন কৃষক তাদের মোরগ নিয়ে ফিরে যাওয়ার পর দুলালির দিকে তাকিয়ে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ নাসিরউদ্দিনের মন বিষণ্ণতায় ভরে যায়, তার কাজ শেষ হলে দুলালি সরার ওপর পরিচিত আকারের কাগজের টুকরোটি রাখে, এবং তখন ধুলোর ওপর হাঁটু গেড়ে শরীর সোজা করে রাখা দুলালির কোলে, বাহুর ভেতর খোজা মোরগটার দিকে তাকিয়ে মোল্লা নাসিরউদ্দিন শুকনো কণ্ঠে বলে, আমি ভালো নাই দুলালি। তারপর দুলালি চলে যায় এবং সেদিন নাসিরউদ্দিন হয়তো ক্লান্ত ছিল, বিরক্ত অথবা বিভ্রান্ত ছিল, ফলে এই দিন ভাঁজ করা চৌকো কাগজটা সে আর খোলে না, ঘরে গিয়ে তার ঝোলা ব্যাগের ভেতর একই আকারের অন্য ছটি চিরকুটের সঙ্গে রেখে দেয়। নাসিরউদ্দিন পুনরায় আরো এক বছর বাড়ি ফেরে না, ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষার পড়াশোনা নিয়ে সিরাজগঞ্জে ব্যস্ত হয়ে থাকে; সেখানে তার টিনের ট্রাঙ্কের একটি পকেটে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের পুরিয়ার মতো সাতটি ভাঁজ করা চৌকো কাগজের টুকরো প্রহর গোনে এবং সুহাসিনীতে প্রহর গোনে বালিকা দুলালি এবং মোরগের বাচ্চা খাসি করতে আগ্রহী কৃষকেরা। পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর মোল্লা নাসিরউদ্দিন পুনরায় বাড়ি ফিরলে গ্রামের লোকেরা সে খবর জানতে পারে এবং সকালবেলা কৃষকেরা মোরগ হাতে করে মিয়াবাড়ির ভিটায় এসে জড়ো হতে থাকে; মোল্লা নাসিরউদ্দিনের হলুদ এবং চুন রাখা সরার ওপর একটি করে এক আনার মুদ্রা রেখে দিয়ে তারা তাদের খোজা করা মোরগের বাচ্চা নিয়ে চলে যায়। কিন্তু দুলালি আসে না। মোল্লা নাসিরউদ্দিন বুঝতে পারে না কেন সে আসে না, সে এবার দেড় মাস গ্রামে থাকে, কিন্তু যে দুলালি ক্রমাগতভাবে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কেমন আছ, সে সকালবেলার মোরগের বিচি কাটার আয়োজনে ক্রমাগতভাবে অনুপস্থিত থাকে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিন যেমন দুলালিকে এক বছর প্রতীক্ষায় রাখে, সে-ও তাকে তেমনি করে; নাসিরউদ্দিনকে গ্রামে ফেরার পর সতেরো দিন অপেক্ষা করতে হয়, অষ্টাদশতম দিনে সে একটি পায়ের আওয়াজ পায় এবং বুঝতে পারে, এটা দুলালি; তার চোখ তখন নিবদ্ধ ছিল সামনে চিৎ করে ধরা একটি খয়েরি রঙের মোরগের বাচ্চার পালক তোলা তলপেটের ওপর, আঙুল ছিল উন্মুক্ত কাটা ছিদ্রের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানো এবং চেতনা নিয়োজিত ছিল আঙুলের ডগায় মোরগের পেটের ভেতর নরম গুটির মতো একজোড়া বিচি অনুভব করায়; তখন, এই অবস্থার ভেতরও, সে মাটিতে খসে পড়া পাতার শব্দের মতো পদপাতের নরম ধ্বনি এগিয়ে আসতে শোনে। সেদিন তাদের প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া সব গ্রামবাসী চলে যাওয়ার পর নাসিরউদ্দিন দুলালির দিকে

তাকায়, বালিকার শ্যামল মুখের নিচে, শাড়ির আঁচলের তলায় সে নবীন স্তনের ক্ষীণ স্ফীতি দেখে। নাসিরউদ্দিন দুলালির মোরগের পেট সেলাই করে হলুদ এবং চুন লাগিয়ে দেয়ার পর দুলালি যখন তার মোরগ নিয়ে চলে যায় তখন নাসিরউদ্দিন তার রেখে যাওয়া চিরকুটটা খোলে এবং কাঠপেন্সিলে লেখা একটি নূতন বাক্য দেখতে পায়, দুলালি এবার জানতে চায়, মোল্লা নাসির কেন কোনো কিছু বলে না; এবং পরবর্তী তেরো দিনে আরো তেরোটি চিরকুট পায় সে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, এই চিরকুট চালাচালির বলি হিসেবে ছমিরুন্নেছার মোরগগুলোর একাধিকবার খোজা হওয়ার অবস্থা এসে যায়; এ সময় প্রথম দু'দিন দুলালি দুটো মোরগের বাচ্চা নিয়ে আসে, কিন্তু তারপর এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, নাসিরউদ্দিন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয় দিন দুলালি একটি বড় তাগড়া মোরগ হাতে করে নিয়ে আসে, মোরগটি এত বড় এবং তেজী ছিল যে, দুলালির পক্ষে সেটাকে চিৎ করে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন নাসিরউদ্দিন রশি দিয়ে মোরগটির পা এবং পাখা বেঁধে দিলে দুলালি সেটাকে চিৎ করে রাখে এবং সে মোরগের তলপেট কেটে আঙুল প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তার অভিজ্ঞ আঙুল অনেক চেষ্টা করেও মোরগের পেটের ভেতর অণ্ডকোষের সন্ধান করতে পারে না। দীর্ঘক্ষণ প্রচেষ্টার ফলে যখন তার নাকের ডগায় পরিশ্রম এবং উত্তেজনার ঘাম জমে ওঠে, সে এই পণ্ডশ্রম ত্যাগ করে এবং হতাশ হয়ে বলে, এই মোরগাটা আসলে মোরগ না, এইটা হিজড়া, তখন এই কথা শুনে দুলালি মুখের ভেতর আঁচল গুঁজে দিয়ে হাসে এবং সরার ওপর চিরকুট রেখে দিয়ে চলে যায়; নাসিরউদ্দিন সেটা খুলে দেখে তাতে লেখা, কিছু কও না কেন তুমি? পরবর্তী কয়েক দিন নাসিরউদ্দিন হিজড়া মোরগের পেটের ভেতর অনুপস্থিত বিচি খুঁজে ক্লান্ত এবং দুলালির চিরকুটে 'তুমি কিছু কও না কেন' পড়ে পড়ে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। চতুর্দশতম দিনে দুলালি তার চিরকুটটা সরার ওপর রেখে দিলে নাসিরউদ্দিন তার মুখের দিকে তাকায় এবং বলে, তুইও তো কিছু কইস না; নাসিরউদ্দিনের কণ্ঠ যেন সেদিন হাহাকার করে এবং তার এই কথা শুনে দুলালির শরীর কেঁপে ওঠে এবং কান্নার প্রান্ত থেকে চাপা ও তীব্র কণ্ঠে সে বলে, মিথ্যুক! দুলালি এরপর কয়েক দিন আর আসে না এবং নাসিরউদ্দিন যদিও বুঝতে পারে না দুলালি কেন আসে না, সে নূতন চৌদ্দটি চিরকুট, সাতটি পুরানো চিরকুটের সঙ্গে একত্রে টিনের ট্রাঙ্কের পকেটে রেখে দেয়।

মফিজুদ্দিনের ছেলেরা তার কোনো শখ এবং স্বপ্নই পূরণ করে নাই, তারা সারা জীবন তাদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পথ চলে; সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিন তার কথামতো মাদ্রাসার শিক্ষা গ্রহণ করে না, তারপর একদিন, তার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে সে তার শতরঞ্জি জড়িয়ে বিছানা বেঁধে এবং টিনের ট্রাঙ্ক গুছিয়ে তৈরি হয়। তখন সে মফিজুদ্দিনের দ্বিতীয় অনুরোধটি

প্রত্যাখ্যান করে; সে ঢাকা চলে গিয়ে সিরাজগঞ্জ কলেজে তার সহপাঠী আব্দুল বাকীর সঙ্গে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়। মফিজুদ্দিনের এই অনুরোধটি তার পরবর্তী ছেলে আবুবকর সিদ্দিকও রাখে না, সেও তার অগ্রজের মতো ব্যক্তিগত স্বপ্ন নির্মাণে জীবন ব্যয় করে। এই ঘটনার শুরু হয় মোল্লা নাসিরউদ্দিন ইন্টারমিডিয়েট পাস করার এক বছর আগে, যখন মফিজুদ্দিনের দশ নম্বর ছেলে আব্দুল আজিজ বিএ পাস করে; তখন সুরধ্বনি গ্রামের আফজাল খাঁর বড় ছেলে ইলয়াস খাঁর মিলিটারিতে চাকরি নেয়ার খবর গ্রামের লোকেরা জানতে পারে, এবং তখন মফিজুদ্দিন তার বিএ পাস ছেলেকে বলে, তুমি বাপু মিলিটারিত যাও। আব্দুল আজিজ প্রথমে তার পিতার এই আকাঙ্ক্ষার কারণ বুঝতে পারে না, এবং যদিও মিলিটারিতে চাকরি নেয়ার জন্য ইন্টারমিডিয়েট পাস হলেই চলে, সে তার পিতার কথা মেনে নিয়ে বগুড়া শহরে গিয়ে একদিন সেনাবাহিনীর প্রাথমিক নির্বাচন কমিটির সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু সে প্রথম শারীরিক পরীক্ষাতেই অযোগ্য প্রমাণিত হয়; গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিনের হয়তো একধরনের দূরদৃষ্টি ছিল অথবা নিছক প্রবৃত্তির দ্বারা সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার বাল্যের প্রিয় বন্ধু করিম খাঁর বড় নাতি ইলিয়াস খাঁর মতো তার একটি ছেলেরও মিলিটারিতে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু মফিজুদ্দিনের এই ইচ্ছায় কোনো কাজ হয় না, আব্দুল আজিজ সেনাবাহিনীতে ঢুকতে ব্যর্থ হয় এবং তার অন্য ছেলেরা তা করতে অস্বীকার করে। আব্দুল আজিজ যেদিন বগুড়ায় আর্মি রিক্রুটমেন্ট কেন্দ্র থেকে হাঁটুবিষয়ক জটিলতার কারণে ব্যর্থ হয়ে গ্রামে ফিরে আসে, সেদিন সকল কথা শুনে মফিজুদ্দিন খুব চিলিত হয়ে পড়ে এবং বিকেলের মরা আলোয় মিয়াবাড়ির ভেতরের উঠোনের ওপর লুঙ্গি কাছা দিয়ে উপরে তুলে সে যখন দুপায়ের গোড়ালি একত্র করে দাঁড়ায়, সে তার এত অহঙ্কারের এই জীবনের ভেতরকার তুচ্ছতা অনুভব করতে পারে; কারণ, সে দেখতে পায় যে, তার নিজের দুপায়ের হাঁটুর ভেতরের দিক পরস্পরের সঙ্গে লেগে আছে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, এই প্রাথমিক হতাশার ভেতরও মফিজুদ্দিন তার বুদ্ধি হারায় না, সে সেই বিকেলেই তার ছেলেদের ডেকে এনে উঠোনে দাঁড় করায় এবং বাড়ির মেয়েরা দেখে যে, ছেলেরা লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে পায়ের গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি সন্নিবেশ করে দাঁড়ালে মফিজুদ্দিন একটি খাতার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আসে এবং তা উঠোনে দাঁড়ানো প্রত্যেকের দুপায়ের ফাঁকের মাঝখানে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ওপর দিকে টেনে নেয়। এভাবে সেদিনকার ব্যর্থতা এবং হতাশার ভেতর সে তার ছেলেদের ভেতর থেকে তাদেরকে বেছে বার করে, যারা যোগ্য হাঁটুর অধিকারী; এবং সে আনন্দের সঙ্গে দেখে যে, তার তরুণতম দুটো ছেলে, মোল্লা নাসিরউদ্দিন এবং আবুবকর সিদ্দিকের হাঁটু পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে যায় না। কিন্তু মফিজুদ্দিনের এই আনন্দ স্থায়ী হয় না, তার আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগতভাবে অপূর্ণ থাকে; নাসিরউদ্দিন তার অনুরোধ রক্ষা করে না এবং তার অনুজ আবুকর সিদ্দিক তার চাইতেও বড় দুঃখ দেয় মফিজুদ্দিনকে; সে

সিরাজগঞ্জের লেখাপড়া শেষ করে ঢাকা গিয়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়, সেখানে সে নগ্ন নারীর ছবি আঁকা শেখে এবং মিলিটারিতে একটি ছেলেকে ঢোকানোর মফিজুদ্দিনের পরিকল্পনা অবাস্তবায়িত থেকে যায়। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, প্রবল গোয়ার্তুমি সত্ত্বেও তার মনের কোনো এক গভীর স্তরে একধরনের শঙ্কা হয়তো ছিল, এবং ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা রাতের বিহ্বলকর ঘটনার পর ক্রমান্বয়ে তাদের মনে হয় যে, মফিজুদ্দিন এবং আফজাল খাঁর পরিবারের বিরোধ জারি ছিল বহুদিন থেকে। রায়গঞ্জ থেকে পূর্ব দিকে আসা রাস্তাটিকে মফিজুদ্দিন তার জীবদ্দশায় খাল পার হয়ে আসতে দেয় নাই, কিন্তু মফিজুদ্দিনের মৃত্যুর পর সিরাজগঞ্জ শহরের জেলে ছয় মাস আটক থাকার পর রায়গঞ্জের উপজেলা চেয়ারম্যান ইদ্রিস খাঁ ছাড়া পায় এবং গ্রামে ফিরে সকলের আগে এই রাস্তাটি নির্মাণের কাজে হাত দেয়; তখন খাঁদের সঙ্গে মফিজুদ্দিনের বিরোধের দীর্ঘ এবং গোপন প্রকৃতির বিষয়টি গ্রামের লোকেরা পুনরায় অনুধাবন করে। সুরধ্বনি গ্রামের জন্য এই রাস্তাটি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল, এবং সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, এই রাস্তাটির খুবই প্রয়োজন ছিল খাঁ পরিবারের; কারণ, এই রাস্তাটি না থাকায় দু'বার দুটো মোটরগাড়ি আটকা পড়ে যায় এবং গ্রামের লোকদের তামাশা দেখার অসাধারণ সুযোগের সৃষ্টি করে। সুরধ্বনি গ্রামের খাঁয়েরা মিলিটারি এবং মোটরগাড়ির অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে মফিজুদ্দিনের পরিবারের চাইতে এগিয়ে থাকে এবং সুহাসিনীর লোকদের মনে হয় যে, মফিজুদ্দিন এই অবস্থার সুরাহা করার চেষ্টা করে তার কোনো একটি ছেলেকে মিলিটারিতে ঢুকিয়ে এবং সুরধ্বনি গ্রাম পর্যন্ত রায়গঞ্জ থেকে আসা রাস্তাটিকে এগিয়ে যেতে না দিয়ে, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই সে ব্যর্থ হয়; তার ছেলেদের মিলিটারির বিষয়ে উৎসাহ দেখা যায় না, তারা ইঞ্জিনিয়ার হয়, চিত্রকর হয়, এবং লাল বই পড়া কম্যুনিস্ট হয়; অন্যদিকে রাস্তা না থাকলেও খাঁবাড়ির ভিটায় মোটরগাড়ি মফিজুদ্দিনের জীবদ্দশাতেই গিয়ে পৌঁছয়। মোটরগাড়ির বিষয়ে সুরধ্বনি গ্রামের খাঁয়েরা এগিয়ে যায় যখন চান্দাইকোনায় মোটরগাড়ির হেলপারের কাজ করা, বেলায়েত হোসেন নামে ভিনদেশী এক লোকের সঙ্গে আফজাল খাঁ নিজের ছোটো বোনের বিয়ে দেয় এবং বেলায়েত সুরধ্বনিতে খাঁদের বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করে। সুহাসিনীর লোকেরা, সুরধ্বনি এবং রৌহার লোকেরা, খাঁবাড়ির জামাই বেলায়েতের কথা যখন জানতে পারে তাদের প্রথমে এই কথা ভেবে ঈর্ষা হতে থাকে যে, বেলায়েত সকাল থেকে রাত অব্দি গাড়ি চড়ে বেড়ায় এবং এজন্য তার একটি পয়সাও খরচ হয় না বরং বাস মালিক উল্টো তাকেই বেতন দেয়। বেলায়েতকে গ্রামের কেউ কেউ হয়তো এই সব কথা বলে, অথবা এমনও হতে পারে যে, নিজের জীবিকার ঈর্ষণীয়তার বিষয়টি হয়তো সে নিজেই বুঝতে পারে; এবং এই বুঝতে পারাটা তার নিজের জন্য ঝামেলা এবং এই এলাকার লোকের জন্য ক্ষণিক মজা নিয়ে আসে, যখন সে কোনো এক অবসরের দিনে তার বাসের ড্রাইভারকে বলেকয়ে রাজি করায় এবং একটি বড় হাতির মতো পেট মোটা এবং মন্থর

বাহনটিকে তার শ্বশুরবাড়ির দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। করতোয়া নদীতে তখন গরুগাড়ি পার করার জন্য জোড়া নৌকোর যে ফেরিটি ছিল তাতে এই বাসটি উঠতে পারবে না বুঝতে পেরে বেলায়েত হয়তো ভেবেছিল যে, শুকনো দিনের হাঁটুপানির করতোয়া ফেরি ছাড়াই পার হওয়া যাবে। কিন্তু তার এই হিসেবে ভুল ছিল, ধানঘড়ার পশ্চিম পাশের গ্রামের লোকেরা দেখেছিল বাসটিকে কিনারার বালি এবং কাদার ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে পানির ভেতর নাক ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে। এরপর সেদিন বাসটিকে টেনে তোলার জন্য মোটা কাছি বেঁধে পঞ্চাশ জন লোক লাগাতে হয়; এক সার পিঁপড়ের মতো মালকোঁচা মারা গ্রামের লোকেরা মনে হয় যেন বাসটিকে লেজ ধরে পেছন দিকে টেনে নদীগর্ভের বাইরে নিয়ে আসে এবং পুনরায় রাস্তার ওপর ওঠায়। আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা এই খবর বিশদ জানতে পারার আগেই এই কাজের জন্য বেলায়েত হোসেন তার চাকরি হারায় এবং সুহাসিনীতে মফিজুদ্দিন মিয়া একদিন বিকেলে দুটো খবর একসঙ্গে শোনে এবং সে এতে একদম আমোদিত বোধ করে না, সে তার কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, ছাগল একখান! কিন্তু বেলায়েত হোসেন প্রমাণ করে যে, যে লোক একবার বিনে পয়সায় গাড়ি চড়ার সুযোগ পায়, সে সেই নেশা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না; বাসের হেলপারের চাকরি চলে যাওয়ার ঘটনায় জীবিকা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তার হয়তো একধরনের লজ্জা এবং জেদ হয়। সে সুরধ্বনিতে শ্বশুরবাড়িতে বৌ ফেলে রেখে ঢাকা চলে গিয়ে মোটরগাড়ির ড্রাইভিং শেখে তারপর এটা-ওটা চালাতে চালাতে এক বিদেশী দূতাবাসে ড্রাইভারের চাকরি নেয় এবং তখন দেখা যায় যে, শ্বশুরবাড়ির গ্রামের বিস্মিত এবং বিহ্বল কৃষকদের সামনে দিয়ে মোটরগাড়ি চালিয়ে যাওয়ার তার অল্প বয়সের স্বপ্ন অম্লান রয়ে গেছে; কিন্তু একই সঙ্গে দেখা যায় যে, দশ বছর আগে চাকরি হারানোর গ্লানির কথা সে বিস্মৃত হয় নাই, সে তার কালো রঙের চার দরজার ঝকঝকে কারটা এবার জোড়া নৌকোর ফেরিতে তুলে করতোয়া নদী পার করে ধানঘড়া হাটের ওপর এনে ওঠায়। কিন্তু দশ বছর লেগে থাকার পর তার সাফল্য এটুকুর ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে যে, স্মরণকালের ভেতর তার গাড়িই ধানঘড়া হাটের ওপর দিয়ে এসে এক পাশে দাঁড়ায়। বেলায়েত হোসেনের বাকি স্বপ্নটুকু অপূর্ণ থাকে, গাড়ি নিয়ে ধুলো উড়িয়ে সুরধ্বনির দিকে এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না; ভাঙা রাস্তার চেহারা দেখে সে অবস্থাটা বুঝতে পারে, তখন হাটের বাইরে একটি গাছের নিচে গাড়ি রেখে সে পায়ে হেঁটে রওনা হয়। শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোকদের সামনা-সামনি গাড়ি দেখাতে না পারলেও, বেলায়েত হোসেনের কালো রঙের এই ঝকঝকে গাড়িটির কথা চারদিকের গ্রামের লোকেরা পুনরায় জানতে পারে; যারা ধানঘড়া হাটে এসে এই গাড়ি দেখে তারা বিস্ময় এবং উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে থাকে এবং বলে, এই গাড়ির চাইরডো দরজা। বেলায়েত হোসেনের এই নূতন গাড়ির কথা যখন সুহাসিনীর লোকেরা জানতে পারে তখন তা মফিজুদ্দিন মিয়াও শোনে এবং ভ্রু

কুঁচকে অন্য কোনো রকম মন্তব্য ছাড়া বিড়বিড় করে সে শুধু বলে, আদেখলা! সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিনের মনে কি ছিল তা তাদের জানা নাই, তবে রাস্তা বানাতে না দিয়ে সে সুরধ্বনির খাঁদের মোটরগাড়ির অগ্রযাত্রা আটকাতে সক্ষম হয় না; খাঁয়েরা যেন পণ করে বিষয়টার পেছনে লাগে। বেলায়েত হোসেনের চার দরজার কালো ফিঙে পাখির মতো ছিমছাম গাড়িটি প্রথম যেদিন ধানঘড়া হাটখোলার ওপর এসে ওঠে এবং আর এগোনোর রাস্তা না পেয়ে এক ধারে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে, এই এলাকার লোকেরা উত্তেজিতভাবে এই গাড়ির গল্প করে, তারপর তারা এই গাড়ির কথা ভুলে যায় এবং নিত্যদিনের কাজে লাগে। বেলায়েত হোসেনের এই গাড়িটির ধানঘড়ায় আগমনের পর, কতদিন পর তা গ্রামের লোকেরা বলতে পারে না, মফিজুদ্দিনের অঘোষিত প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে, এবং একদিন গ্রামের লোকেরা একটা বিশাল জন্তুর গোঙানোর মতো শব্দ শোনে এবং দৌড়ে বের হয়ে এসে, ধীর অথচ জেদি ভঙ্গিতে এগোনো ষাঁড়ের মতো, একটি খাকি রঙের জিপ গাড়ি দেখতে পায়; মেজর ইলিয়াস খাঁর এই গাড়ি সেদিন ধুলো উড়িয়ে ভাঙা রাস্তার ওপর দিয়ে এগোয়, কোনো কিছুই এর গতিরোধ করতে পারে না; সুহাসিনীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় খালের হাঁটুপানির ভেতর দিয়ে পার হয়ে চাষের জমির ওপর দিয়ে সুরধ্বনির খাঁ-বাড়ির বাইরের উঠোনে জামতলায় গিয়ে থামে। সুহাসিনীতে মোটরগাড়ি আসার আগেই সুরধ্বনির কৃষক এবং তাদের রমণীরা একটি আসল এবং আস্ত মোটর গাড়ির অধিকারী হয়, তারা এই যানটিকে একদল মাছির মতো সর্বক্ষণ ঘিরে রাখে এবং ছুঁয়ে দেখে। তখন একদিন ধানঘড়া থেকে রায়গঞ্জ হয়ে একদল লোক মাটির কাঁচা রাস্তার ওপর নূতন মাটি ফেলে মেরামত করতে করতে সুহাসিনীর দিকে এগিয়ে আসে এবং খালের সেই জায়গায় এসে থামে, যেখানে একদিন মোল্লা নাসিরউদ্দিন বালিকা দুলালিকে পানির কিনারায় অপেক্ষা করতে দেখে। সুহাসিনীর লোকদের কাছে অনেক কিছু এবং জায়গার ভেতর, খালপাড়ের এই মাথাভাঙা রাস্তার প্রান্তের সঙ্গে দুলালির স্মৃতির প্রসঙ্গ বহুদিন পূর্ব থেকে জট পাকিয়ে যায়। আইউব খানের ওয়ার্কস প্রোগ্রামের আমলে রায়গঞ্জ, রৌহা ও সুরধ্বনির কর্মহীন কৃষকেরা যখন গমের বিনিময়ে মাটি কেটে একটি রাস্তা বানিয়ে রায়গঞ্জের দিক থেকে এগিয়ে আসে এবং মফিজুদ্দিনের গোয়ার্তুমির কারণে তা খাল পার হয়ে সুহাসিনীতে এসে সুরধ্বনির দিকে এগিয়ে যেতে পারে না, তখন সুহাসিনীর লোকদের দুলালির কথা মনে পড়ে। মফিজুদ্দিন মিয়ার অনেক কিছুর মতো, এই রাস্তাটি পূর্ণরূপে নির্মিত না হওয়ার বিষয়ে তার ইচ্ছের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুহাসিনীর লোকেরা বিভ্রান্ত বোধ করে, তাদের বহুদিন এ রকম মনে হয় যে, সুরধ্বনির খাঁয়েরা যাতে আরাম করে তাদের মোটরগাড়ি চালিয়ে গ্রামে আসতে না পারে, মফিজুদ্দিন সে জন্যই এই রাস্তাটিকে এগিয়ে আসতে দেয় না। ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের বৃদ্ধ চেয়ারম্যান মফিজুদ্দিন রায়গঞ্জ থানার সিও সাহেবকে মুখের ওপর এই কথা বলে যে, এই রাস্তা খালের এ পাড়ে

সুহাসিনীতে আসবে না, সুহাসিনীর লোকেরা মাটি কাটার বদলে রিলিফের এই সব গম খায় না। কিন্তু সুহাসিনীর অনেকের তখন এই রাস্তাটিকে এগিয়ে না আসতে দেয়ার অন্য সম্ভাব্য কারণটির কথা মনে পড়ে, তাদের অনেকে বলে যে, এই রাস্তাটি আশপাশের খালের কারণে কেবল একটি জায়গার ওপর দিয়ে সুরধ্বনি গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে পারতো, এটা এগিয়ে যেতে পারতো কেবল মোবারক আলির পতিত ভিটার ওপর দিয়ে। মফিজুদ্দিন যে কথা কোনোদিন বলে নাই, গ্রামের লোকেরা সেই কথা বলে, তারা মফিজুদ্দিনের হৃদয়ে এক গোপন এবং গভীর ক্ষতের বিষয়ে নিশ্চিত হয় এবং বলে যে, একটি কবর রক্ষা করার জন্য মফিজুদ্দিন এত কিছু করে; মোবারক আলির পোড়ো ভিটার ওপর দিয়ে এই রাস্তা সে যেতে দেয় না, কারণ, এই জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওপর একটি জামগাছ তলায় ছিল দুলালির কবর।

গ্রামের লোকদের মনে তখন অবিস্মরণীয় সেই স্মৃতি জাগরিত হয়। সুহাসিনীর লোকেরা জানতে পারে যে, যখন একের পর এক চৌদ্দটি চিরকুটে 'তুমি কিছু কও না কেন' লেখা পড়ার পর বিভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত মোল্লা নাসিরউদ্দিন দমকা বাতাসে কেঁপে যাওয়া পাতার শব্দের মতো উচ্চারণ করে, তুইও তো কিছু কইস না; তখন, সেদিন, দুলালির হৃদয়টি চাপ খেয়ে থেঁতলে যায়। তারপর দুদিন মোল্লা নাসিরউদ্দিন সুহাসিনীতে থাকে, কিন্তু দুলালি আসে না এবং তখন নাসিরউদ্দিন দুলালিকে আর না দেখেই ঢাকা রওনা হয়। দুলালির এই কথাটি জানা ছিল না যে, দুদিন পরে নাসিরউদ্দিন চলে যাবে, এবং নাসিরউদ্দিনও কোনো এক ধরনের অভিমান অথবা বেখেয়ালে দুলালির খোঁজ করে না; এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, এই ভুলের আর কোনো সংশোধন থাকে না, নাসিরউদ্দিন এবং দুলালির আর দেখা হয় না; দুলালির মৃত্যুর পর সে গ্রামে ফিরে এসে সাদা কাফনের ভেতর তার বিবর্ণ শীতল মুখে দেখে। সুহাসিনীর লোকেরা এই প্রক্রিয়াটি অবলোকন করে এবং তারা যখন এ বিষয়ে কথা বলে তাদের শুধুই বিষণ্নতা হয়, তারা বলে যে, চৌদ্দটি চিরকুট ছুড়ে দেয়ার পর দুলালি আর আসে না; কিন্তু নাসিরউদ্দিন চলে যাওয়ার পর দিন সে কোলের ভেতর দুবার পেট কাটা একটি মোরগ নিয়ে এসে মিয়াবাড়ির ভিটায় প্রাঙ্গণের ওপর দাঁড়ায়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মিয়াবাড়ির চাকরেরা তখন গরুর পরিচর্যা এবং জাবনা দেয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল, সে সময় তারা বিষণ্ন ছায়ার মতো বালিকাকে দেখতে পায়, তাদের কাছ থেকে গ্রামের লোকেরা পরে বিশদ জানতে পারে। মিয়াবাড়ির এই কামলারা গ্রামের লোকদের বলে যে, তারা যখন দুলালিকে এই খবরটি দেয় যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিন আগের দিন রাতে ঢাকা চলে গেছে তার নিষ্কম্প পুকুরের মতো চোখ দুটো তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তারপর বড় নীরব চরণে সে সেই প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে যায়। মিয়াবাড়ির এই চাকরেরা বলে যে, বিষয়টি তারা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারে নাই, তারা মনে করে যে, এটা একটি সাধারণ

ঘটনা; মোল্লা নাসিরউদ্দিনের গ্রাম ত্যাগের খবর জানা না থাকায় দুলালি হয়তো ভুল করে প্রথম দিন মোরগ নিয়ে আসে। কিন্তু মোল্লা নাসিরের ঢাকা চলে যাওয়ার কথা বলার পরও দ্বিতীয় দিন সকালে দুলালি যখন মোরগ কোলে এসে দাঁড়ায় তখন মিয়াবাড়ির চাকরেরা বিস্মিত হয়, তারা এই ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিনের ঢাকা চলে যাওয়ার খবর তারা এই মেয়েটিকে আদৌ বলেছিল কি না এবং তখন তারা পুনরায় দুলালিকে খবরটি দেয় এবং দুলালি তাদের দিকে কিছুক্ষণ নিস্পলকভাবে তাকিয়ে থেকে শুকনো মুখে চলে যায়। মিয়াবাড়ির চাকরেরা বলে যে, বিভ্রান্তিটা যে তাদের নয় দুলালির, দুলালি যে চেতন এবং অচেতনের মধ্য রেখায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা তারা বুঝতে পারে যখন তৃতীয় দিন সকালে তারা দুলালিকে মোরগ কোলে করে এসে দাঁড়াতে দেখে। কারণ, এই দিন এ জিনিসটি তারা নিশ্চিতরূপে মনে করতে পারে যে, তারা মোল্লা নাসিরউদ্দিনের ঢাকা চলে যাওয়ার কথা আগের দিন এই বালিকাটিকে বলেছিল। তারা তৃতীয়বার দুলালিকে খবরটা দেয় এবং তখন দুলালি ধীরপায়ে মিয়াবাড়ির ভিটার ওপর থেকে মাঠের ধূসর সকালের ভেতর নেমে গেলে, এই অপসৃয়মাণ বালিকার দিকে তাকিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসে চির ধরে এবং বিভ্রান্তি পুনরায় উঁকি দেয় এবং তাদের এই সন্দেহ হতে থাকে যে, নাসিরউদ্দিনের ঢাকা চলে যাওয়ার খবরটি তারা দুলালিকে ঠিক দিয়েছিল কি না। তারা তখন বিপর্যস্ত বোধ করলে নিজেরাই নিজেদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না যে, তারা কথাগুলো বলেছিল, এবং তখন তাদের একজন গোয়ালঘরের পাশে গজানো খোকসা গাছের একটি পাতা ছিঁড়ে এনে সকলের সামনে তুলে ধরে বলে, এই যে দেহ, এই, নাসিরদ্দি ঢাহা চইল্যা গেছে; এবং এই কথা বলে সে খোকসার পাতাটি সকলের সামনে গোয়ালঘরের পাটখাড়ির বেড়ার ফাঁকে গুঁজে রাখে। পরদিন চতুর্থবারের মতো তারা যখন দুলালিকে দেখে, তারা পুনরায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের গোয়ালঘরের বেড়ার সঙ্গে গুঁজে রাখা খোকসার পাতার কথা মনে পড়ে এবং নীরবে অপেক্ষমাণ বালিকার দিকে তাকিয়ে, বমাল চোর ধরতে পারার মতো সাফল্যের আনন্দে তারা হেসে ওঠে; তাদের একজন গোয়ালঘরের বেড়ার গা থেকে পাতাটা খুলে নিয়ে দুলালির সামনে উঁচু করে ধরে বলে, এই যে দেহ খোকসার পাতা, তোমাক তো কইছি যে নাসিরদ্দি ঢাহা চইল্যা গেছে। তখন দুলালি খোকসার পাতাটি নিয়ে শোঁকে এবং নাকে ও গালে এই খসখসে পাতার ঘর্ষণে তার শরীর শিরশির করে ওঠে এবং মনে হয় যেন নাসিরউদ্দিনের গ্রাম ত্যাগের বিষয়টি হাতের মুঠোয় খোকসার পাতা চেপে ধরার পর সে উপলব্ধি করতে পারে; তার শুকনো পুকুরের মতো চোখে শোকেরা জেগে ওঠে এবং তার দুগাল বেয়ে হেমন্ত রাতের শিশিরের মতো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামে। মিয়াবাড়ির কাজের লোকেরা এই সব কথা তখন, অথবা পরবর্তী কোনো এক সময়, গ্রামের লোকদের বিশদভাবে বলে এবং সুহাসিনীর লোকদের এই কথা মনে পড়ে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিনের অদর্শনে এই মাটির

মতো ধূসর গ্রাম্য বালিকাটির জীবন অন্তঃসলিলহীন হয়ে পড়ে এবং তার চেহারা খরাপীড়িত বিদীর্ণ কাননের মতো বিধস্ত হয়। সেদিন মিয়াবাড়ির প্রাঙ্গণে দুলালি খোকসার পাতা গালে ঘষলে তার চোখে পানি আসে এবং সে বিড়বিড় করে বলে, তুমি ক্যান চইলা গেলা; তারপর এই কথা যখন গ্রামে প্রচারিত হয় তখন সুহাসিনীর লোকেরা দেখতে পায় যে, মোবারক আলির চতুর্দশ বর্ষীয়া কন্যাটি দিনে দিনে ম্লান হয়ে আসে এবং কোনো এক উদ্ভিদের পাতার সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলে। সুহাসিনীর এই লোকেরা বলে যে, তারা অনেক দিন অনেক জায়গায় কাছ থেকে দুলালিকে পাতার সঙ্গে কথা বলতে শোনে এবং তারা বলে যে, দুলালি এই সময় সর্বক্ষণ একটি কথাই ক্রমাগতভাবে বলে, এবং কেবল মৃত্যুতে তার এই আহাজারি থামে। দুলালি খোকসার পাতা হাতে করে মিয়াবাড়ির ভিটা থেকে নেমে যাওয়ার পর থেকে গ্রামের লোকেরা মিয়াবাড়ির আশপাশে ছোটো ছোটো কাগজের টুকরো কুড়িয়ে পেতে শুরু করে এবং তাদের ভেতর যারা পড়তে পারে তারা দেখে যে, এইসব কাগজের টুকরোয় একই হস্তাক্ষরে একটি মাত্র বাক্য লেখা হয়েছে, যে বাক্যটি একটি খসখসে খোকসার পাতা গালে ঘষে ঘষে মোবারক আলির মেয়ে দুলালিকে গ্রামের লোকেরা বহুবার আওড়াতে শুনেছে। দুলালির এই উন্মাদনা সম্পর্কে প্রায় সমগ্র গ্রাম জেনে যাওয়ার পরও বিষয়টি একমাত্র মফিজুদ্দিনের অজানা থাকে; গ্রামের লোকেরা তাকে এ কথা বলে না, কারণ, তারা তাদের ঔচিত্যের সীমা সম্পর্কে সংশয়ে ভোগে এবং ভাবে যে, এইসব কথা মফিজুদ্দিন নিজেই শীঘ্র জানতে পারবে; মিয়াবাড়ির চাকরদেরও কিছু বলার সাহস হয় না, আর চন্দ্রভান সব জেনেও অপেক্ষা করে মোল্লা নাসিরের প্রত্যাবর্তনের পর এ সম্পর্কে তার কথা শোনার জন্য। কিন্তু চন্দ্রভানের এই প্রতীক্ষায় লাভ হয় না, কারণ, নাসিরউদ্দিনের শীঘ্র গ্রামে ফেরার আশা দেখা যায় না এবং এই সময় এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, চন্দ্রভানকে মফিজুদ্দিনের কাছে বিষয়টি খুলে বলতে হয়। তখন কোনো একদিন, গ্রামের লোকেরা বলতে পারে না কতদিন পর কোনদিন, তারা জানতে পারে যে, দুলালির বিষয়টি মফিজুদ্দিন জেনেছে; তারা এরকম শুনতে পায় যে, অন্য কোনো একদিন, সকালে অথবা সন্ধের আগ দিয়ে মফিজুদ্দিন তার ভিটার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের নামায় একখণ্ড নিচু পতিত জমির ওপর পায়চারি করছিল, তখন ঘাস ও আগাছা ছাওয়া এই ভূমিখণ্ডের ওপর শালুক ফুলের মতো ফুটেছিল এক টুকরো সাদা কাগজ। পায়চারি করতে করতে মফিজুদ্দিন কাগজের টুকরোটির বিষয়ে সচেতন হয় এবং তারও কিছুক্ষণ পর অর্থহীন কৌতূহলের কারণে সে টুকরোটি হাতে তুলে নিয়ে সেই বাক্যটির দিকে তাকায়, যে বাক্যটি সুহাসিনীর কিছু লোক এ ধরনের কুড়িয়ে পাওয়া চিরকুটে ইতোমধ্যে পাঠ করেছে এবং সুহাসিনীর সব লোক তা জেনেছে; কিন্তু মফিজুদ্দিন মিয়া পড়তে না পারায় কিছুই বুঝতে পারে না, সে কাঠপেন্সিলে বাঁকাচোরা অক্ষরে লেখা বাক্যটির দিকে একনজর দেখে বিষয়টি গুরুত্বহীন ভেবে

কাগজের টুকরোটি দলা পাকিয়ে একটু দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু নিরীহ কাগজের টুকরোয় লেখা বাক্যটি পড়ে মানে না বুঝতে পারলেও মফিজুদ্দিনের ইন্দ্রিয় শীঘ্রই সচকিত হয়ে ওঠে, প্রথম দিনের পর সে তার বাড়ির আশপাশে ক্রমাগতভাবে টুকরো কাগজের চিরকুট পড়ে থাকতে দেখতে পায় এবং সে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ে, এটা আর গুরুত্বহীন মনে হয় না। পরবর্তী দুদিনে সে নিজের বাড়ির ভিটা, সামনের সবজির বাগান ও পতিত জমি এবং নিকটের রাস্তার পাশ থেকে একই আকারের সাতটি কাগজের টুকরো সংগ্রহ করে এবং যদিও এই চিরকুট পড়তে পারে না, সে দেখে যে, কাঠপেন্সিল দিয়ে যা লেখা হয়েছে তা প্রতিটি টুকুরোয় একই রকম দেখতে এবং তখন সে বুঝতে পারে যে, সবগুলো কাগজের টুকরোয় একই কথা লেখা হয়েছে। তখন তার মনে হয় যে, কাগজের টুকরোগুলোয় একই লোক একই কথা বারবার লিখে তার বাড়ির ভিটার চারপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং এ ধরনের সন্দেহ হওয়ায় সে বিচলিত হয়ে পড়ে, সে কাগজের টুকরোগুলো ঘরে এনে লুকিয়ে রাখে। পরবর্তী দুদিনে সে আরো তিনটি কাগজের টুকরো পায় এবং তখন সে ভয় পেয়ে যায়, তার মনে হয় যে, কেউ কি তার পেছনে লেগেছে, কোনো দুষ্ট মানুষ কি তার বাড়ি বন্ধ করার জন্য কোনো কিছু করছে, অথবা এসব কি কোনো দুষ্ট জিনের কাণ্ড? তখন মফিজুদ্দিনের মনে পড়ে চন্দ্রভানের জিনের কথা এবং অবস্থাদৃষ্টে সে নিশ্চিত হয় যে, এটা চন্দ্রভানের সেই পুরনো দুষ্ট জিনেরই কাজ; সে বুঝতে পারে যে, তাকে এই বিপদের প্রতিকারের জন্য পুনরায় চান্দাইকোণা যেতে হবে, ইয়াকুব মৌলবির ছেলে ইয়াসিন মৌলবির কাছে। সুহাসিনীর লোকেরা এই সব ঘটনার কথা পরে জানতে পারে, তারা বলে যে, সে রাতে বিচলিত নিরক্ষর মফিজুদ্দিন বিষয়টি সম্পর্কে চন্দ্রভানের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়, সে তার স্ত্রীর কাছে তাদের ভিটার চতুর্দিকে মন্ত্র লেখা কাগজের টুকরো ছড়িয়ে দেয়ার ঘটনার কথা বলে এবং চন্দ্রভানকে ভয়াবহ কাগজের টুকরোগুলো বের করে দেখায়। অল্পশিক্ষিত চন্দ্রভান খাতার পাতা ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলোতে কাঠপেন্সিলে লেখা হৃদয় ছিন্ন করা হাহাকারের মতো বাক্যটি পড়ে সব বুঝতে পারে। সম্ভবত সেই মুহূর্তে বালিকা দুলালির জন্য চন্দ্রভানের হৃদয় বিগলিত হয়, সে চিরকুটগুলো হাতে নিয়ে নিরুত্তর হয়ে থাকলে মফিজুদ্দিন প্রথমে বিভ্রান্ত বোধ করে, তারপর তার মনে হয় যে, চন্দ্রভানও তার মতো ভয় পেয়েছে; তখন সে তার হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে বেড়ার ধারে কাঠের তাকের ওপর রেখে স্ত্রীকে সাহস দেয়ার জন্য বলে, ভয় পায়ো না, কাইলই চান্দাইকোনা যামু, ইয়াকুব মৌলবির ছাওয়াল ইয়াসিন মৌলবির কাছে। মফিজুদ্দিনের এই কথা শুনে প্রৌঢ়া চন্দ্রভান তার দিকে নীরবে তাকায় এবং নিম্ন কণ্ঠে বলে যে এই সবগুলো কাগজের টুকরায় কেবলমাত্র একটি কথা লেখা আছে, তুমি কেন চইল্যা গেলা। এই কথা শুনে মফিজুদ্দিনের ভয় বেড়ে যায়, সে পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, এটা চন্দ্রভানকে লিখেছে বদমাশ জিন; কিন্তু বাক্যটি পড়ার পর চন্দ্রভানের অস্বাভাবিক নীরব

এবং বিষণ্ন আচরণে মফিজুদ্দিন বিভ্রান্ত এবং বিচলিত বোধ করে, তার মনে হয় যে, জিনের লেখা এই চিঠি চন্দ্রভানকে দেখানো তার উচিত হয় নাই। তখন মফিজুদ্দিনের বিচলিত এবং ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রভান বলে যে, এই চিরকুটগুলো মোবারক আলির মেয়ে দুলালি লেখে এবং সুহাসিনীর প্রান্তরের ওপর ছড়িয়ে দেয়। চন্দ্রভানের কথা শুনে মফিজুদ্দিনের জিনের ভয় কেটে যায়, কিন্তু তার বিভ্রান্তি কাটে না; তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রভান বিড়বিড় করে বলে যে, এই চিরকুটগুলো দুলালি মোল্লা নাসিরকে লেখে, দুলালির মাথা ঠিক নাই। তখন বিচলিত এবং বিভ্রান্ত মফিজুদ্দিন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তার বুদ্ধি, বিবেচনাবোধ এবং একই সঙ্গে ক্রোধ ফিরে আসে; সুহাসিনীর লোকেরা সব জানতে পারে, তারা জানতে পারে যে, ক্রমাগতভাবে সুহাসিনীর মানুষের জীবনের গতিপথ নির্ধারণকারী মফিজুদ্দিন সে রাতে তার স্ত্রীর নিকট থেকে সকল বৃত্তান্ত শোনার পর সেই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে, যার দ্বারা, লোকেরা বলে যে, উন্মাদিনী দুলালি এবং পলাতক মোল্লা নাসিরউদ্দিনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়; তাকের ওপর থেকে চিরকুটগুলো নিয়ে দলামোচড়া করে জানালা দিয়ে ঘরের পেছনে ফেলে দিয়ে পৌঢ়া চন্দ্রভানের নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে সে, আকালুর ছেলে মফিজুদ্দিন বলে যে, কোনো জোলার মেয়ের সঙ্গে সে তার ছেলের বিয়ে দেবে না। সুহাসিনীর লোকেরা এই কথা শুনতে পায় এবং পরবর্তী সময়ে তারা মনে করতে পারে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া তার জীবৎকালে সব চূড়ান্ত বাক্যাশ্রিত সিদ্ধান্তাবলি উচ্চারণ করে চলে, এবং মোবারক আলির মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের বিয়ে না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দশ বছর পর যখন এক দল লোক মাটি কেটে একটি রাস্তা নির্মাণ করতে করতে খাল পার হয়ে মোবারক আলির ভিটার ওপর এসে পড়তে চায় তখন ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের বৃদ্ধ চেয়ারম্যান সফেদ পাঞ্জাবি পরে এসে দাঁড়ায় এবং বলে যে, খাল পার হয়ে এই রাস্তা সুহাসিনীতে প্রবেশ করবে না; থানার সিও সাহেবের অনুরোধ ও হুমকি এবং রংপুর ক্যান্টনমেন্টের মেজরের প্রভাব, কোনো কিছুই তার উচ্চারিত বাক্যটিকে বদলাতে সক্ষম হয় না। সুহাসিনীর লোকেরা সব শোনে এবং দেখে, এবং তারা এ সম্পর্কে গল্প করতে থাকে; তারা বলে যে, সুহাসিনীর খাল অতিক্রম করে এই রাস্তাকে এগিয়ে আসতে না দেয়ায় তাদের প্রথমে মনে হয়েছিল যে, মফিজুদ্দিন মিয়া সুরধ্বনির খাঁদের জব্দ করতে চায়। কিন্তু তারপর তারা এর রকম ভাবতে থাকে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার বুকের গভীরে একটি ক্ষত ছিল, যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল দুলালির জন্য মোল্লা নাসিরউদ্দিনের সংসার-বিবাগী হয়ে যাওয়ার কারণে এবং, তারা বলে যে, একটি সময়ের পর প্রবল জেদের ভেতরও পাগলিনী দুলালির জন্য তার হৃদয় আপ্লুত হয়েছিল। গ্রামের লোকেরা বলে যে, স্বীকার না করলেও, কারণ, নিজের ভুল স্বীকার করতে পারার মতো মানসিক গঠন মফিজুদ্দিনের ছিল না। তার মনের ভেতর একধরনের অপরাধবোধ এবং বেদনা ছিল, যে বেদনার ভার তার জীবনের

ভয়ঙ্কর পূর্ণিমা রাত পর্যন্ত অটুট ছিল; কারণ, গ্রামের লোকেরা এই সত্য ভুলতে পারে না যে, মফিজুদ্দিনের হত্যাকাণ্ডের পরেই কেবল এই রাস্তা এগিয়ে এসে মোবারক আলির পোড়ো ভিটার ওপরকার ছটি কবর গুঁড়িয়ে দিয়ে সুরধ্বনি গ্রামের দিকে অগ্রসর হয় এবং সুহাসিনীর লোকেরা এই খবরটি পায়, এবং তারা সেদিন, তখন, অগ্রসরমাণ কোদালের তল থেকে তাদের স্মৃতির কুমারীর দেহাস্থি সংগ্রহ করে। তাদের মনে পড়ে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিন গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মিয়াবাড়ির চাকরেরা দুলালির হাতের ভেতর একটি খসখসে খোকসা পাতা গুঁজে দিয়ে যখন বলে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিন ঢাকা চলে গেছে, তখন দুলালির চোখে কান্না নামে এবং তখন সে চেতন ও অচেতনের মাঝখানের রেখাটি অতিক্রম করে, তার জীবনে বাস্তব এবং অবাস্তবের প্রভেদ অবলুপ্ত হয় এবং সুহাসিনীর লোকেরা মনে করতে পারে, গ্রামের কাঁচা রাস্তা এবং ফসলের ক্ষেতের ওপর ছিন্ন নক্ষত্রের মতো কাগজের টুকরো ছড়াতে ছড়াতে বালিকাটি কেমন ছায়ার মতো হালকা অবয়বহীন হয়ে ওঠে। তখন একদিন সকালে মোবারক আলি তার এই অল্প বয়সে পীড়িত এবং বিপর্যস্ত বালিকা কন্যাকে নিয়ে মিয়াবাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ায়, গ্রামের লোকেরা বলে যে, তাকে দেখে মিয়াবাড়ির চাকরেরা ভীত হয়ে পড়ে; কারণ, তারা সঠিকভাবেই একটি বিপর্যয়ের আশঙ্কা করে, তারা কেউ মোবারক আলির নিকটে এগিয়ে না এসে দূরে সরে থেকে কাজের ব্যস্ততার ভান করে, কিন্তু কি ঘটে তা দেখার জন্য একই সঙ্গে তারা দৃষ্টি এবং শ্রুতি সীমার ভেতরে থাকে। সেদিন মিয়াবাড়ির উঠোনে উপস্থিত লোকেরা দেখে যে, বৈঠকখানার সামনে রোদের ভেতর দাঁড়ানো মোবারক আলি তার দুবাহুর ভেতর ম্লান বালিকা দুলালিকে এবং এই ম্লান বালিকা তার দুবাহুর ভেতর একটি কালো মোরগ ধারণ করে আছে, এবং তখন, কিছুক্ষণ পর মফিজুদ্দিন মিয়াবাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসে। সেই সময় মিয়াবাড়ির প্রাঙ্গণে উপস্থিত লোকদের নিকট থেকে গ্রামের লোকেরা এই গল্প শোনে এবং সুহাসিনীর এইসব প্রবীণ লোক এখন বলে যে, সেটা মফিজুদ্দিন মিয়ার এক বড় সংকট ছিল; তার ভালোমতো জানা ছিল না এর সমাধান সে কিভাবে করবে, কতটুকু বিবেচনা সে দেখাবে, অথবা প্রশ্রয় দেবে কতটুকু ক্রোধের; সেদিন মাটির দিকে মুখ করে বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে এসে সে মোবারক আলির সামনে দাঁড়ায়, তখন, গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন কেবল একবার মোরগ কোলে দাঁড়ানো বালিকার শুকনো চোখের দহনের ভেতর নিজের চোখ রাখে এবং তখন, সেই একটি মুহূর্তের ভেতর, তার হৃদয়ে চিরস্থায়ী ক্ষতটির সৃষ্টি হয়; কিন্তু তারা বলে যে, মফিজুদ্দিন চিরজীবন মফিজুদ্দিনই ছিল, সে এক মুহূর্তেই তার চোখ সরিয়ে নেয় এবং দ্বিতীয়বার বালিকার মুখের দিকে তাকায় না, এবং মেয়েটির যন্ত্রণার তীব্রতার উপলব্ধি তার হৃদয়কে দ্রবীভূত করতে চাইলে সে তার ক্রোধকে মুক্ত করে; সে নির্মমতার সঙ্গে তার সিদ্ধান্ত নেয়, মোবারক আলি কেন এসেছে তা সে জানতে চায় না, তাকে সে একটি কথা বলারও

সুযোগ না দিয়ে সেই কথাটি বলে, যে কথা কয়েক দিন আগে রাত্তের বেলা সে চন্দ্রভানের সামনে উচ্চারণ করেছিল। তখন তার কথা শুনে মোবারক আলির রাগ হয়, না লজ্জা হয়, না দুঃখ হয়, তা গ্রামের লোকেরা বলতে পারে না; তারা বলে যে, এই বৃদ্ধ, মফিজুদ্দিনের দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তারপর এক হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে মিয়াবাড়ির উঠোন থেকে নেমে যায়; সেদিন মোবারক আলির মেয়েকে সঙ্গে করে নিজের ভিটায় ফিরে যাওয়ার পর গ্রামের মানুষ দুলালিকে আর দেখতে পায় না। তখন একবার কয়েক দিন ধরে একটানা বৃষ্টি পড়তে শুরু করে, সূর্যের মুখ কেউ দেখতে পায় না, গ্রামের লোকেরা পাঁচ দিন ঘরের ভেতর আটকা পড়ে থাকে; পাঁচ দিন পর বৃষ্টি একটু কমে আসে কিন্তু আকাশের ঘন মেঘ পরিষ্কার হয় না এবং এরপর পুনরায় প্রবল হয়ে বর্ষণ নামে, এই বারিপাত পরবর্তী সাত দিন ধরে চলে। শ্রাবণের এইসব দিনে সুহাসিনীতে সেই ঘটনাটি ঘটে যার স্মৃতি কালোত্তীর্ণ হয়ে গ্রামের লোকদের মনে জেগে থাকে; তারা বলে যে, কোনো এক দিন ভোরে অথবা দুপুরে মোবারক আলি যখন মিয়াবাড়ির ভিটার ওপর তার পীড়িত কন্যাকে বাহুর ভেতর নিয়ে দাঁড়ায় এবং মফিজুদ্দিন মিয়া ক্ষিপ্ত চাপা গলায় বলে যে, তন্তবায় জোলার মেয়ের সঙ্গে সে তার ছেলের বিয়ে দিতে পারে না, তখন বেদনাক্লিষ্ট এবং লজ্জিত পিতা মেয়েকে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে যায় এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, দুলালিকে এরপর আর গ্রামের পথ এবং কৃষিভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখা যায় না। মোবারক আলি দুলালির বেদনা এবং লজ্জাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে চাপা দেয়, সে তার একটি লম্বা টিনের ঘরের মাঝখানের সব পার্টিশন-বেড়া সরিয়ে ঘরটিকে বড় করে এবং দুলালিকে ঘরের ভেতরে রেখে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে রাখে। দুলালি এই ঘরের ভেতর খাঁচায় আটকানো হরিণীর মতো হেঁটে বেড়ায়, বিছানায় শুয়ে নিজে নিজে কথা বলে, অথবা খাতার পাতা ছিঁড়ে সেই একটি বাক্য রচনা করে। ঘরের ভেতরটায় বিড়বিড় করে বলা তার কথার অনুচ্চধ্বনি এবং মাটির কাঁচা মেঝের ওপর চিরকুটের স্তূপ জমে ওঠে; এই সময় শ্রাবণের ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে যায় এবং সুহাসিনীর প্রান্তরের ওপর ক্রমাগত বৃষ্টি পড়তে থাকে। গ্রামের লোকেরা একটি ঘরের ভেতর দুলালির আটক হওয়ার খবর পায় এবং তারা যখন সবকিছু জানতে পারে, তারা এই জিনিসটি বুঝতে পারে না যে, দুলালি কতটুকু পাগল হয়েছিল; কারণ, বন্ধ ঘরের ভেতর আটকা থাকার সময়, জগৎ-সংসার সম্পর্কে বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হওয়ার পর সে এমন দুটো কাজ করে, যাতে মনে হয় যেন তার স্বাভাবিক শরীরবৃত্তিক অনুভূতি এবং পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সম্বিৎ রয়ে গেছে। ক্রমাগত বৃষ্টি এবং মেঘাচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার বিষয়টি মনে হয় যেন ঘরের ভেতর আটকা থাকা সত্ত্বেও তার চেতনায় ধরা পড়ে; একটানা বৃষ্টির দরুন সূর্যের আলোর অভাবে সুহাসিনীর মানুষদের যখন বিরক্তি এবং কষ্ট হতে থাকে তখন, মনে হয় যেন, দুলালির মনের ভেতরও আলোর অভাব বোধ

জেগে ওঠে এবং সে এই বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে যে, সূর্যের আলোর রঙ হচ্ছে হলুদ– নীল কিংবা সুবজ নয়। এই ক্রমাগত বৃষ্টির সময় মোবারক আলির তাঁতঘরে জায়গার সমস্যা দেখা দেয়, তখন তার বড় ছেলে আব্দুল জলিল একটি সাধারণ ভুল করে, যেটা অসাধারণ এবং ভয়ানক হয়ে ওঠে এবং যার আর কোনো প্রতিকার থাকে না। কারখানা ঘরের টিনের চালের ভেতর দিয়ে একদিন পানি পড়তে থাকলে স্থানাভাবের কারণে সুতো ভেজানো তিনটে রঙের ড্রাম সে দুলালির ঘরে স্থানান্তর করে; এই ড্রামগুলোর একটিতে গোলানো তরল সবুজ রঙ ছিল, অন্য একটায় ছিল নীল রঙ এবং হলুদ রঙ ছিল তৃতীয়টায়; লম্বা ঘরের ভেতর হাঁটাচলা, নিজে নিজে ক্রমাগত কথা বলা এবং খাতার পাতা ছিঁড়ে চিরকুট লিখে ছড়িয়ে দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে কোনো এক সময় দুলালি এই ড্রাম এবং ভেতরকার রঙ পরখ করে দেখে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, তখন, চেতনার সেই বিভ্রান্তির ভেতর দুলালির মনে হয় যে, বহুদিন সে সূর্যের আলো দেখে না, এবং মোল্লা নাসিরউদ্দিনের মতো সূর্যের আলোর স্পর্শের জন্যও তার বুকের ভেতরটা ছটফট করে ওঠে। তখন কোনো এক সময় ড্রামের হলুদ রঙের তরলের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় যে, তার জন্য এক ড্রাম উষ্ণ সূর্যের আলো ধরে রাখা হয়েছে এবং সে আঁজলা ভরে এই রাসায়নিক তরল ক্রমাগতভাবে পান করতে থাকে এবং তার বিষক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে বিষয়টি কারো নজরে আসে না, কারণ, দুলালির শারীরিক নিরাপত্তার বিষয়ে সকলের একধরনের নিশ্চিন্ততা ছিল। কিন্তু ঘরের ভেতর আটকে রাখা মেয়েটির বিষয়ে তাদের নিশ্চিন্ততার ভুল শীঘ্র ভাঙে; সেদিন বিকেলে ছমিরুন্নেছা বাইরে থেকে লাগানো দরজার শেকল খুলে ঘরে ঢুকে দুলালিকে একটি ছিন্ন লতার মতো ভূমিতে লুণ্ঠিত অবস্থায় দেখে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, ছমিরুন্নেছা প্রথমে কিছু বুঝতে পারে না, সে ভাবে যে এটা হয়তো পাগল মেয়ের খেয়াল, তারপর সে যখন মেঝের ওপর দুলালির বমি দেখে তখন সে কিছুটা শঙ্কিত বোধ করলেও বিষয়টা বুঝতে পারে না। সে যখন দুলালিকে ভূমি থেকে তুলে বিছানায় আনে দুলালির তখন জ্ঞানরহিত হয় নাই, তাকে দেখে তার মা এবং পরিবারের অন্যরা ভাবে যে, উন্মাদনার ঘোরের কারণে সে হয়তো মূর্ছা গিয়েছিল; তখন দুলালি বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়ার জন্যই যেন বলে যে, সে রঙের ড্রামের ভেতর থেকে রোদের আলো পান করেছে। কিন্তু ড্রামের ভেতর থেকে রোদের আলো পান করার বিষয়টি দুলালির পরিবারের সদস্যদের বুঝতে তার পরেও সময় লেগে যায়, তারা যখন বুঝতে পারে যে, দুলালি ড্রামে রাখা রঙ গোলানো পানি খেয়েছে, তখন দুলালির মুখ দিয়ে লালা গড়ানো এবং শরীরে খিঁচুনি শুরু হয়ে যায়। মোবারক আলি এবং তার সাত ছেলে বৃষ্টির ভেতর ছোটাছুটি করতে থাকে, তারা বুঝতে পারে না তারা কি করবে অথবা গ্রামের কে তাদেরকে এই বিপদে সাহায্য করতে পারবে; অবশেষে তারা জুম্মা মসজিদের ইমাম নইমুদ্দিন সরকারকে ডেকে আনে এবং তার পরামর্শে সেই বৃষ্টির ভেতর ধানঘড়ায়

ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁশ কেটে একটি খাটিয়া বানিয়ে দুলালিকে তাতে ওঠায়, তখন তার বুকের ওপর কান চেপে ধরে রোরুদ্যমান ছমিরুন্নেছা আর্ত চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহ্ কিংবা মোল্লা নাসিরউদ্দিনের নাম উচ্চারণ ছাড়াই অচেতন বালিকার মৃত্যু হয় এবং তখন জুমা মসজিদের ইমাম নইমুদ্দিন সরকার এবং সেখানে উপস্থিত গ্রামের কৃষকদের চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসে এবং তাদের কান্না-ভেজা নরম কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যদিও, পরদিন দুলালির পরিবার এবং সুহাসিনীর লোকেরা বুঝতে পারে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিনের নাম দুলালির সঙ্গে সর্বদাই ছিল, তখন ঘটনাপ্রবাহ এক অবিস্মরণীয় বাঁক নেয়; লজ্জিত, অপমানিত, ভীরু এবং বেদনাবিদীর্ণ মোবারক আলি এমন এক ধর্মদ্রোহী এবং খ্যাপা কর্মকাণ্ড শুরু করে, যার ফলে সুহাসিনীর লোকদের মনে হয় যে, মফিজুদ্দিন মিয়া তার জীবনে প্রথমবারের মতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সুহাসিনীর লোকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে একটি জিনিস লক্ষ করে যে, দুলালির মৃত্যুর সঙ্গে বৃষ্টি থেমে যায় এবং তারা বলে যে এই অঝোর বৃষ্টি হয়তো ছিল দুলালির শেষ কান্নার মতো; তার মৃত্যুতে এই কান্না থামে এবং পরদিন সকালে সুহাসিনীর লোকেরা ঝকঝকে রোদ উঠতে দেখে এবং তারা শুনতে পায় যে, মোবারক আলির কিশোরী কন্যা দুলালি তার যন্ত্রণা এবং লজ্জার জীবন অতিক্রম করে গেছে; বৃষ্টির অন্ধকার এবং ভেজা দিনে ড্রামে গুলিয়ে রাখা হলুদ রঙ সে রোদের আলো মনে করে পান করেছিল। তারা বলে যে, সুতো ভেজানো এই রঙ, অথবা তরল রোদ খেয়ে নেয়ায় দুলালির দেহের ভেতর রঙ অথবা আলোর ক্রিয়ার ফলে তার দেহের সকল কোষকলা তাদের পার্থিব অবস্থা এবং অবয়ব হারিয়ে স্ফটিকের মতো হয়ে ওঠে; এবং বহুদিন পর সুহাসিনীর প্রবীণ লোকেরা, যারা এই সব ঘটনা চাক্ষুষ করেছিল, যখন এই কথা বলে, তখন তাদের শ্রোতারা তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারে না; কিন্তু এইসব বিভ্রান্ত এবং সংশয়বাদী শ্রোতার মুখের দিকে তাকিয়ে তারা বলে, গপ্পো না, হাচা কই; তারা বলে যে, সে দিন সকালে দুলালির মৃত্যুর খবর শুনে এতদিন বৃষ্টির পর ঝকঝকে রোদ ওঠার আনন্দ তাদের শেষ হয়ে যায়, তারা শোকার্ত এবং নীরব পাখির ঝাঁকের মতো মোবারক আলির উঠোনে এসে জড়ো হয়। দুলালির মৃতদেহ তখন দক্ষিণদুয়ারি লম্বা ঘরের চৌকির ওপর রাখা ছিল, এই সময় মৃত দুলালির পরনের শাড়ির আঁচলের খুঁটে বাঁধা এটি চিরকুট আবিষ্কৃত হয়, এই চিরকুটে সে লেখে, তুমি কোনে নাসির ভাই; এবং তখন, দুলালি যে ঘরে রঙ গোলানো পানি পান করে, সেই ঘরের মেঝেতে দুলালির লেখা অসংখ্য চিরকুট ছড়িয়ে থাকলেও, তার আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখা চিরকুটটি পাওয়ার পর মোবারক আলি প্রথমে একেবারে ভেঙে পড়ে, সে মৃত মেয়ের লাশ জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, এই সময় চোখের পানিতে মোবারক আলির লজ্জা এবং ভীরুতার গ্লানি মুছে যায়; চরম রিক্ততার শোকের ভেতর তার জীবনের প্রথম সাহস এবং জেদ দেখা দেয়, সে দুলালির মৃতদেহ

ছেড়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় এবং মিয়াবাড়ির দিকে রওনা হয়; তখন সেখানে উপস্থিত সুহাসিনীর লোকেরা বুঝতে পারে, মোবারক আলি কোথায় যায় এবং তারা তার পেছনে একটি মিছিল করে আসে। মোবারক আলি এবং তার পেছনে সুহাসিনীর লোকেরা যখন মিছিল করে আসে তারা মফিজুদ্দিন মিয়াকে বাড়ির বাইরের উঠোনে গাবগাছ তলার ছায়ায় একটি চেয়ারে একা উপবিষ্ট দেখতে পায়; মোবারক আলি তখন রাস্তা থেকে ভিটার ওপর উঠে আসে, কিন্তু মিছিল করে আসা গ্রামের লোকেরা ভিটার ওপর ওঠে না, দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। মোবারক আলি, মফিজুদ্দিনের সামনে দাঁড়িয়ে ফোঁপায় এবং দুলালির মৃত্যুর খবর বলে এবং জানায় যে দুলালির শেষ ইচ্ছে ছিল মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দেখার। মফিজুদ্দিন নির্বাক এবং নিশ্চল মূর্তির মতো বসে থেকে মোবারক আলির কথা শোনে এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিনকে তাদের চেনা ছিল, তার সামনে মোবারক আলির কান্নার শব্দ এবং কথা শুনে তারা বিস্ফোরণের জন্য প্রতীক্ষা করে এবং শীঘ্রই সেটা ঘটে। মোবারক আলি দুলালির শেষ ইচ্ছের কথা বলার পর মফিজুদ্দিনকে অনুরোধ করে একটা খবর পাঠিয়ে মোল্লা নাসিরকে ডেকে আনার জন্য; তখন মফিজুদ্দিনের দেহে মনে হয় যেন প্রাণ ফিরে আসে, চেয়ারের হাতলের ওপর নিষ্প্রাণভাবে পড়ে থাকা হাত দুটো সক্রিয় হয় এবং মুঠোর ভেতর হাতল চেপে ধরে, তারপর চাপা কিন্তু ক্ষিপ্ত কণ্ঠে সে মোবারক আলিকে জোলার ছেলে জোলা বলে গাল দেয় এবং তারপর চেয়ার ছেড়ে ভিটার নিচে অবস্থানরত সুহাসিনীর লোকদের দিকে হাত উঁচিয়ে চিৎকার করে তেড়ে আসে, হারামযাদা, তরা এইখানে খাড়ায়া খাড়ায়া কি দেহিস! সুহাসিনীর লোকেরা সেদিন তাড়া খেয়ে ছুটে পালায় এবং তারপর তারা মোবারক আলিকে ধীর এবং ভীরু পায়ে চোখ মুছতে মুছতে মিয়াবাড়ির ভিটা থেকে নেমে আসতে দেখে; তারা বলে যে, তারা মনে করেছিল বিষয়টির এখানেই শেষ, কিন্তু তারা একই সঙ্গে বলে যে, এই একটি বার তারা মোবারক আলিকে বুঝতে পারে নাই এবং এই একটিবার তারা দেখতে পায় যে, মফিজুদ্দিনের সকল জিদ অভঙ্গুর নয়; দুলালির মৃত্যুর পর মফিজুদ্দিন মিয়া এবং মোবারক আলির ভেতর এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যার পরিণতিতে মফিজুদ্দিন তার জীবনে প্রথম এবং সম্ভবত শেষ বারের মতো পরাজয় মেনে নেয়। মফিজুদ্দিনের ভিটা থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর দুলালির লাশ ঘরের ভেতর থেকে বের করে একটি গাছের ছায়ায় চৌকির ওপর রাখা হয়, কাপড় দিয়ে এই চৌকিটার চারদিক ঘিরে দিয়ে পর্দা তৈরি করার পর বরই গাছের পাতা ডোবানো অল্প গরম পানি দিয়ে ছমিরুন্নেছা এবং অপর একজন রমণী তাকে শেষ গোসল করায় এবং, এই পর্দার ঘেরের বাইরে দাঁড়ানো জুমা মসজিদের ইমাম নইমুদ্দিন সরকারের নির্দেশানুযায়ী, সাদা মার্কিন কাপড়ের বিভিন্ন আকারের তিন প্রস্থ কাফনের কাপড়ে মৃত দুলালির দেহ জড়িয়ে দেয়। কাফন পরানোর পর পর্দা সরিয়ে নেয়া হয়, তখন কদু ফুলের সাদা পাপড়ির মতো কাফনের বাঁধন খুলে মোবারক আলি যখন মেয়ের

মুদিত চোখ এবং নির্লিপ্ত বিষণ্ণ মৃত মুখ দেখে, তার বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠে; তখন মৃত বালিকার আঁচলে বাঁধা চিরকুটটির কথা তার পুনরায় মনে পড়ে এবং তার মনে হয় যে, এই দুঃখিনী মেয়েটিকে এভাবে কবর দেয়া যায় না; সে লাশ রাখা খাটিয়ার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং মলিন পাঞ্জাবির আস্তিনে চোখ মুছে বলে যে, সে তার মেয়েকে কবরস্থ করবে না, আমার ম্যায়াক আমি কবর দিমু না; একধরনের খ্যাপামির সঙ্গে সে বলে যে, দুলালির লাশ গলে পচে পোকা ধরুক, সুহাসিনী লাশের গন্ধে ভরে যাক গ্রাম এবং পৃথিবী রসাতলে ডুবুক, তবু মোল্লা নাসিরউদ্দিন গ্রামে না ফেরা পর্যন্ত সে তার মেয়েকে কবরে নামাবে না। মোবারক আলির কথা শুনে গ্রামের মুসলমান কৃষকেরা শিহরিত হয়, তারা তাদের জীবনে এমন কথা শোনে নাই; তারা বলে যে, এটা ধর্মবিরোধী কাজ, মুর্দা নিয়ে খেলা করা অনুচিত, মুর্দাকে কবর দিতে যত দেরি করা হবে মুর্দার গোর আজাব তত বৃদ্ধি পাবে। গ্রামের লোকেরা তখন নইমুদ্দিন সরকারকে খুঁজে বের করে এবং তার পরামর্শানুযায়ী লাশ দাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তৎপর হয়; মোবারক আলির প্রাঙ্গণ থেকে গ্রামের লোকেরা দুলালির লাশ রাখা খাটিয়া বহন করে মিয়াবাড়ির ভিটার উত্তর-পূর্ব পাশে টিনের ছাপড়া মসজিদের সামনে এনে রাখে, তখন নইমুদ্দিন সরকার একটি পুরনো পাঞ্জাবি এবং টুপি পরে এসে সুহাসিনীর লোকদের জানাজার নামাজে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, এই পুরো সময়টাই মফিজুদ্দিনের জিদ এবং অহমের জন্য ছিল বিপর্যয়কর; জানাজার নামাজের সময় এই কথাটি তাদের মনে হয় যে, মফিজুদ্দিন এখন কি করবে, সে কি এই নামাজে শরিক হবে, নাকি হবে না; গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে না, তবে তারা এটা বুঝতে পারে যে, সে যা-ই করুক না কেন কোনোটাই তার জন্য সহজ সিদ্ধান্ত হবে না। সেদিন মসজিদের সামনের খালি জায়গাটা যখন গ্রামের মানুষের পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তারা সাদা কাপড়ের গোল টুপি মাথায় মফিজুদ্দিন মিয়াকে এগিয়ে আসতে দেখে এবং তারা বুঝতে পারে যে, মফিজুদ্দিন গ্রামের লোকদের সামনে থেকে লুকিয়ে থাকার মানুষ নয়। তখন গ্রামের লোকেরা বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে, তারা নীরবে সম্মুখের সারির মাঝখানে মফিজুদ্দিনের জন্য জায়গা করে দেয়; কিন্তু সে সোজা হেঁটে গিয়ে একেবারে পেছনের সারিতে দাঁড়ায়। নামাজের পর গ্রামের লোকেরা লাশ নিয়ে মোবারক আলির ভিটায় ফেরে এবং সেখানে ইতোমধ্যে খনন করা কবরের পাশে, জামগাছ তলার ছায়ায় খাটিয়া নামায়; কিন্তু লাশ দাফন করা তাদের হয় না, তারা দেখে যে, জানাজার নামাজের পর খানিকটা সুস্থির হয়ে এলেও মোবারক আলির খ্যাপামি যায় না। মোবারক আলি এই সময় তার পূর্বে বলা কথাগুলো যখন পুনরায় বলে, আমার ম্যায়াক আমি কবর দিমু না, গ্রামের লোকেরা তার কথা শুনতে চায় না, তার সাত ছেলে তাকে বোঝায়। দুলালির ব্যাপারে মফিজুদ্দিন মিয়ার হৃদয়হীনতায় ক্ষুব্ধ হলেও সুহাসিনীর লোকদের কাছে লাশ দাফন না করে ফেলে রাখার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য

হয় না, বিশেষ করে তারা যখন পরিষ্কার বুঝতে পারে পারে যে, মফিজুদ্দিনের জিদের কথা বাদ দিলেও, এই লাশ পচে গলে উবে যাওয়ার আগে মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে সুহাসিনীতে এনে হাজির করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তারা যখন কবরে লাশ নামানোর প্রস্তুতি নেয় তখন মোবারক আলি তার ছেলেদের হাতের বাঁধন ছিন্ন করে উন্মুক্ত কবরের ভেতর লাফিয়ে নেমে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে এবং ফোঁপাতে থাকে, আমাকও তোমরা কবর দেও! সুহাসিনীর লোকেরা তখন নিরস্ত হয়, মোবারক আলির কান্নায় মনে হয় যেন তাদের কোনো সহানুভূতি জাগে না, তার এই আচরণে তারা ক্লান্ত, বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, এবং তারা কবরের ভেতরে শায়িত মোবারক আলি এবং উপরে জামগাছের ছায়ায় দুলালির লাশ রেখে নিজেদের বাড়ির দিকে ফিরে যায় এবং বিষয়টি ভুলে যাওয়ার অথবা ভুলে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামের এই সব বিষয় থেকে গ্রামের লোকদের পক্ষে দীর্ঘক্ষণ দূরে সরে থাকা সম্ভবপর হয় না, রাগ এবং বিরক্তি নিয়ে দিনের বেলাটা কাটিয়ে দিলেও সন্ধের পর থেকে তাদের ঔৎসুক্য বাড়তে থাকে, কি অবস্থা অবশেষে দাঁড়াল জানার জন্য; এবং তখন গভীর রাতে যারা কোনো কারণে জেগে থাকে, তাদের জন্য অপেক্ষা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। অবশেষে খুব সকালে গ্রামের লোকেরা মোবারক আলির বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়, তারা দেখে যে, জামগাছ তলায় খাটিয়ার ওপর সাদা কাফন জড়ানো দুলালির লাশ পড়ে আছে; তারা সারা দিন মোবারক আলির উঠোনে এবং বাড়ির পেছনে কবরের কাছে ভিড় করে থাকে, তাদের মনে হয় যে, দুই রাত এক দিন পর কাফনের ভেতর নিশ্চয়ই দুলালির লাশ পচতে শুরু করেছে এবং এখনই তারা গন্ধ পেতে শুরু করবে, কিন্তু তারা কোনো গন্ধ পায় না। রাতের বেলা গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফিরে যায় এবং কোনোরকমে রাত কাটিয়ে সকালে পুনরায় ফিরে আসে, তারা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে যে, একটি শোকাবহ এবং ধর্মবিরোধী বিষয় যুগপৎ তামাশার বস্তু হয়ে উঠেছে, কিন্তু তারা ঘটনাপ্রবাহ এবং নিজেদের আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। এদিন সকালে মোবারক আলির ভিটায় এসে হাজির হওয়ার পর তারা দেখে যে, জামগাছ তলায় খাটিয়ার ওপর একটি চাদর রশি দিয়ে চার কোনায় বেঁধে চাঁদোয়ার মতো টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে; তারা লাশের কাছে ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু ক্রমাগতভাবে জ্বালানো লোবানের গন্ধ ছাড়া পচা মাংসের কোনো গন্ধ তাদের নাকে আসে না। গ্রামের লোকেরা হিসাব করে দেখে যে, দুলালির মৃত্যুর পর তিন রাত এবং দুই দিন অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তারা তবু কোনো গন্ধ পায় না. লাশে পচনের কোনো লক্ষণ দেয়া যায় না; তারা ভাবে যে এটা কি সম্ভব যে, শুধুমাত্র কয়েকটি লোবান কাঠির মৃদু ঘ্রাণের নিচে তিন দিনের পচা লাশের গন্ধ ঢাকা পড়ে যাবে; তারা তখন কাফনের মাথার দিকের বাঁধন খুলে ষাট ঘণ্টা পূর্বে মৃত বালিকার মুখ অনাবৃত করে। সুহাসিনীর প্রবীণ লোকেরা পরবর্তী সময়ে বছরের পর বছর এই গল্প সেই সব লোকের কাছে বলে, যারা এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় ছোটো ছিল এবং

সব ভুলে গিয়েছিল অথবা যারা এই সময় জন্মই নেয়নি। তারা বলে, এই রহম ব্যাপার আর কোনোদিন দেখমু না; তারা মুর্দা নিয়ে এই কাণ্ড করায় মোবারক আলির নিন্দা করে, কিন্তু লাশ পচে না যাওয়ার প্রসঙ্গে এসে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, এবং বলে যে, এটা ছিল আল্লাহর এক কুদরত। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, দুলালির মৃত্যুর পর তৃতীয় দিন সকালে লাশের কাফনের গিঁট খুলে তারা যখন তাকায় তখন মৃত দুলালির মুখ সাদা মেঘের কোলে ফুটে থাকা পূর্ণচন্দ্রের মতো লাগে, হলুদ বর্ণপ্রাপ্ত মুখটি চিনেমাটির তৈজসের মতো চকচক করে। মৃত বালিকার মুখ দেখে গ্রামের লোকেরা তখন এই বিষয়টি বুঝতে পারে যে, এই শব ক্ষয় হতে দেরি হবে এবং মোবারক আলি অথবা মফিজুদ্দিন মিয়ার একজন যদি আপস না করে, তাহলে এই লাশ হয়তো অনন্তকাল ধরে মাটির ওপরেই থেকে যাবে, কবর দেয়া হবে না। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মোবারক আলির ওপর বিরক্ত হলেও বিষণ্ন বালিকা দুলালির জন্য তাদের হৃদয় বেদনা এবং মমতায় পূর্ণ হয়ে ছিল; তারা যখন বুঝতে পারে যে, এই লাশে পচন শুরু হতে দেরি হবে, তারা মোবারক আলিকে আর চাপ না দিয়ে, মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে যাতে ডেকে আনার ব্যবস্থা করা হয়, সে উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা বলে যে, বিষয়টিতে জড়িত না হয়ে তাদের উপায় ছিল না, অবস্থাটা বিশদ অনুধাবন করতে পারার পর বয়স্ক গ্রামবাসীদের কয়েকজন মিলে পরামর্শ করে এবং একদল যুবককে পাঠায় গ্রামের ভেতর থেকে কয়েকটি বেওয়ারিশ কুকুর মেরে আনার জন্য; তারা বলে যে, এটা ছিল গর্তের ভেতর থেকে বাঘকে খুঁচিয়ে বের করে আনার মতো ব্যাপার। এই যুবকেরা, সেদিন দুটো মর্দা এবং একটি মাদি, মোট তিনটি কুকুর মেরে বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে আসে। গ্রামের লোকেরা তখন মোবারক আলির ভিটা ত্যাগ করে উন্মুক্ত কৃষি জমির ওপর এসে দাঁড়ায়, মুঠোয় করে ধুলো নিয়ে আকাশের দিকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে তারা দেখে যে, তাদের ছুড়ে দেয়া এই গুঁড়ো মাটি মফিজুদ্দিন মিয়ার বাড়ির দিকে না গিয়ে, মোবারক আলির বাড়ির দিকেই উড়ে যায়। গ্রামের লোকেরা তখন তিনটি মরা কুকুর সঙ্গে নিয়ে বাতাসের দিক পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে এবং দুপুর পর্যন্ত একাধিকবার ধুলো ছুড়ে পরীক্ষা করার পর তারা অনুকূল বায়ু পায়, তাদের ছুড়ে দেয়া ধুলো মিয়াবাড়ির দিকে যেতে থাকে। গ্রামের লোকেরা তখন তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে লাগে, তারা খোলা মাঠ ত্যাগ করে মিয়াবাড়ি এবং মোবারক আলির ভিটার মাঝামাঝি জায়গায় একটি জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো ভিটায় মৃত কুকুরগুলো নিয়ে আসে। তারা তখন কিছু খড়ি জোগাড় করে একটি অগ্নিকুণ্ড বানায় এবং একটি মৃত কুকুরের শব এই আগুনে নিক্ষেপ করে আস্তে আস্তে পোড়াতে থাকে এবং তখন, এই পোড়ো ভিটার উত্তর পাশের পুরো গ্রাম তীব্র কটু পোড়া গন্ধে ভরে যায়। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, পুরো অবস্থা বিবেচনায়, এই উৎপাত সহ্য না করে তাদের উপায় ছিল না; তারা নাকে গামছা বেঁধে অপেক্ষা করে এবং সবকিছু জেনেশুনেও বলে, পচা

লাশের গন্ধ পাওয়া যায়। গ্রামের লোকদের কেউ কেউ তখন ইচ্ছাকৃতভাবে মফিজুদ্দিন মিয়ার ভিটার আশপাশে হাঁটাহাটি শুরু করে এবং এদের অনেকে মিয়াবাড়ির চাকরদের সঙ্গে গল্প করার ছলে বলে যে, এই গন্ধ মোবারক আলির মেয়ে দুলালির লাশের এবং মোবারক আলি বলেছে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে না দেখিয়ে সে তার মেয়ের লাশ দাফন করবে না। গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে না তাদের এই সব কায়দা-কৌশল কাজ দেয় কি না, তাদের দেয়া খবর চাকরদের কাছ থেকে মিয়াবাড়ির ভেতরে প্রচারিত হয় কি না; তখন, তাদের কুকুরের মৃতদেহ পুড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না, পরে তারা বলে যে, তারা এমন কাণ্ড করেছিল এটা ভাবলে তাদের এখন হাসি পায়; সেদিন মরা কুকুর পোড়াতে পোড়াতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় তারপর বিকেল গড়াতে থাকে পল পল করে, তখন দ্বিতীয় কুকুরটি পুড়ে একেবারে ভস্ম হয়ে গেলে গ্রামের লোকেরা অগ্নিকুণ্ডে আরো খড়ি যোগ করে তাতে তৃতীয় ককুরটিকে নিক্ষেপ করে। মরা মাদি কুকুরটি যখন পুড়তে থাকে তখন, গ্রামের লোকেরা বলে যে, তারা যে ব্যাপারটিকে পরিণতিতে অসম্ভব বলে মনে করছিল, সেই ঘটনা ঘটে; অপরাহ্নের ম্লান আলোয় একটি কিশোর এবং একজন কামলার সঙ্গে ঘোমটা দেয়া একটি স্ত্রীলোক মিয়াবাড়ির ভিটা থেকে রাস্তায় নেমে আসে, সুহাসিনীর কৃষকেরা বহুদিন পর আলি আসগর মিয়ার মেয়ে চন্দ্রভানের মুখ দেখে। সেদিন চন্দ্রভান যখন তার ছোটো ছেলে আবুবকর সিদ্দিককে সঙ্গে নিয়ে মোবারক আলির বাড়িতে গিয়ে ওঠে, তখন গোটা সুহাসিনীর লোক সেখানে গিয়ে জড়ো হয়; তারা বলে যে, মফিজুদ্দিনের স্ত্রী মোবারক আলির বাড়িতে লাশের কোনো গন্ধ পায় না, সে জামগাছ তলায় গিয়ে লাশের মাথার দিকের কাফনের কাপড় ফাঁক করে দুলালির মুখ দেখে এবং তখন তার কালো দুটো চোখ পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। মোবারক আলির এক ছেলে একটি নিচু টুল এনে দিলে চন্দ্রভান লাশের কাছে বসে এবং গ্রামের লোকেরা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তার বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে, অবস্থা আসলে কি দাঁড়াল; তারা বলে যে, মোবারক আলির ভিটায় চন্দ্রভানের আগমনের ঘটনার দ্বারা মফিজুদ্দিনের জিদের পরাজয় সূচিত হলেও তাতে মৃত বালিকা দুলালির আর কোনো লাভ হয় না, সে কাফন জড়ানো অবস্থায় জামগাছ তলায় পড়ে থাকে। সেদিন দুলালির মৃত মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রভানের, এই নারী এবং বালিকার জন্য শোক হয়, তখন মোবারক আলির স্ত্রী ছমিরুন্নেছা মৃত্যুকালে দুলালির পরনের শাড়িটি নিয়ে আসে এবং শাড়ির আঁচলের খুঁট খুলে সেই চিরকুটটি চন্দ্রভানের হাতে তুলে দেয় এবং সেটা পড়ে ইতোমধ্যে বিচলিত চন্দ্রভানের হৃদয় দৃশ্যত ভেঙে পড়ে; তার চোখ পুনরায় পানিতে ভরে গিয়ে গড়িয়ে নামে এবং তার ডান হাতের করতল মৃত বালিকার মুখ স্পর্শ করে একটি গাছের কম্পিত শাখার মতো সঞ্চরমাণ হয়। সে বিকেলে মোবারক আলির বাড়ি থেকে চন্দ্রভান ফিরে যাওয়ার পর গ্রামের লোকেরা দুটো ঘটনা ঘটতে দেখে, প্রথমে তারা দেখে যে, মফিজুদ্দিনের ছোটো ছেলে আবুবকর

সিদ্দিক কাঁধে কাপড়ের একটি ঝোলা-ব্যাগ ফেলে মিয়াবাড়ি থেকে বের হয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে হেঁটে যায়, তারা তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং বলে, ঢাহা যায়। প্রায় একই সময়, মফিজুদ্দিনের চারজন কামলা চান্দাইকোনা গিয়ে চটে জড়ানো দুই চাঙড় বরফ, এক বস্তা কাঠের গুঁড়ো এবং পাঁচ সের চা-পাতা কিনে নিয়ে আসে। রাত একটু গভীর হওয়ার পর মিয়াবাড়ির এই কামলারা তাদের কেনা দ্রব্যাদি এনে মিয়াবাড়ির উঠোনে রাখে। পরবর্তী সময়ে সুহাসিনীর কৃষকেরা বলে যে, যাদের বাড়ি এই পথের ধারে পড়ে এবং তপ্ত রাতের কারণে যারা ঘুমোতে না গিয়ে জেগে ছিল, তারা সেদিন দেখেছিল মফিজুদ্দিন মিয়ার চাকরেরা বাঁশের ভারে ঝুলিয়ে কিসব বোঝা যেন নিয়ে যায়। সুহাসিনীর এইসব লোক তাদের স্মৃতির ভেতর থেকে এইসব কথা তুলে আনে; কত দিন পর তা তারা নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না, দিনের হিসাব তারা ভুলে যায়, তারা বলে যে, দুলালির মৃত্যুর পর তৃতীয়, চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিনের রাতে মফিজুদ্দিনের নয় নম্বর ছেলে বড় বাক্সের আকারের দুই চাঙড় বরফ, কাঠের গুঁড়ো আর চা-পাতাসহ মোবারক আলির বাড়িতে আসে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মোবারক আলি মেয়ের মৃত্যুর শোক সত্ত্বেও বিষয়টি সম্পর্কে মফিজুদ্দিনের নমমনীয়তায় সন্তুষ্ট বোধ করে, সে মিয়াবাড়ি থেকে প্রেরিত এই সব সামগ্রী গ্রহণ করে, ফরিদ হোসেনকে সমাদর করে একটি নিচু কাঠের টুলে বসতে দেয় এবং একটি কাজের মেয়ে তাল পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করে; মনে হয় যেন ফরিদ হোসেন আসলে দুলালির জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছে। মফিজুদ্দিন মিয়ার পাঠানো চা-পাতা এবং কাঠের গুঁড়ো দিয়ে খাটিয়ার ওপর শোয়ানো দুলালির লাশ ঢেকে দেয়া হয়, খাটিয়ার দুপাশ ঘেঁষে রাখা হয় বরফের দুটো টুকরো। গ্রামের লোকেরা বলে যে, এই লাশ এমনিতেও হয়তো পচত না, কারণ, তারা দেখেছিল যে, দুলালির লাশে পচনের কোনো লক্ষণ নাই, তা কেমন চিনামাটির মতো অথবা স্ফটিক কাচের মতো হয়ে উঠেছিল; তখন কোনো এক সময় চা পাতা ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং কাছে রাখা হয় বরফ। পরদিন সকালে মিয়াবাড়ির চারজন কামলা পুনরায় চান্দাইকোনা যায় এবং চার চাঙড় বরফ এনে মোবারক আলির বাড়িতে পৌঁছে দেয়; এভাবে কতদিন মফিজুদ্দিন মিয়ার পয়সায় কেনা বরফে দুলালির লাশ সংরক্ষণ করা হয় গ্রামের লোকেরা তা বলতে পারে না, তারা শুধু বিস্ময়ের সঙ্গে এই পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করতে থাকে। তারা বলে যে, মফিজুদ্দিনের নিজেরই মনের পরিবর্তন হয়েছিল, কারণ, প্রথম দিন মোবারক আলির বাহুর ভেতর দুলালির চোখের দিকে তাকিয়েই তার হৃদয়ে অনপনেয় ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং এই বালিকার মৃত্যুতে সে অন্তর্গতভাবে ভেঙে পড়ে, এবং সে যখন কুকুর পোড়া গন্ধ পায় তখন সে বিষয়টা মেনে নেয় এবং চন্দ্রভানকে মোবারক আলির বাড়িতে পাঠায়। কিন্তু সুহাসিনীর লোকেরা এই ব্যাপারটি সম্পর্কে তার পরেও নিশ্চিত হতে পারে না, তারা পুনরায় বলে যে, ভেতরে ভেতরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও মফিজুদ্দিনের পক্ষে তার নিজের জিদ থেকে নিজেকে মুক্ত

করা সম্ভবপর ছিল না, তার স্ত্রী চন্দ্রভান সেদিন তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করে; কুকুর পোড়া গন্ধ পাওয়ার পর চন্দ্রভান যখন বুঝতে পারে যে, দুলালির লাশ পচতে শুরু করেছে, সে কাঠের সিন্দুক খুলে একটা ভালো কাপড় বের করে পরে এবং চাদর জড়িয়ে তৈরি হয়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন সেদিন নীরবে তার স্ত্রীর এই সাজসজ্জা দেখে এবং চন্দ্রভান যখন ছোট ছেলে আবুবকর সিদ্দিক এবং একজন কামলাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয় তখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারে, চন্দ্রভান কোথায় যায়, এবং তা বুঝতে পেরেও সে কিছু বলে না।

মফিজুদ্দিনের গোয়ার্তুমির ওপর চন্দ্রভানের হস্তক্ষেপ-ক্ষমতা সম্পর্কে সুহাসিনীর লোকেরা প্রথম জানতে পারে দুলালির মৃত্যুর পর এবং এতে তাদের একধরনের বিস্ময় ও আরাম বোধ হয়, তারা বলে যে, চন্দ্রভান আর মাত্র একবার, পূর্ণিমা রাতে তাদের মৃত্যুর কিছু দিন আগে, এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। গ্রামের কৃষকেরা এই এলাকার ভাষায় বলে যে, সুহাসিনীতে ধূসর দিন এবং অন্ধকারময় রাতের ভেতর, গ্রামের চার কোনায় লাগানো চারটি তালগাছের দীর্ঘ ছায়ার মতো মফিজুদ্দিনের অস্তিত্ব টিকে থাকে; কিন্তু তারা বলে, তাইলেও দিন তো বইস্যা থাহে না বাপু, দিন বদলায়া যায়, মানুষও বদলায়া যায়, যদিও মনে হয় যে কিছুই বদলায় নাই। তারা বলে যে, মফিজুদ্দিনের অজর অস্তিত্ব সত্ত্বেও পরিবর্তন এসেছিল, সময় পাল্টে গিয়েছিল বোধহয়; কারণ, পরবর্তী সময়ে তারা যখন এই সময়ের দিকে তাকায়, তারা দেখতে পায় যে, সুরধ্বনি গ্রামের খাঁয়েরা তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে ক্রমান্বয়ে সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে, এবং তারা মফিজুদ্দিন মিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পূর্বেকার দ্বিধা এবং একধরনের ভয়ের প্রবণতার বাইরে এসে দাঁড়ায়। সুহাসিনীর লোকেরা এইসব পরিবর্তন নীরবে অবলোকন করে, মফিজুদ্দিন এবং তার পরিবারের সদস্যরা যে দিন নিহত হয় তার কিছুদিন আগে রায়গঞ্জকে উপজেলায় রূপান্তর করার হয় এবং গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, উপজেলা পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান অধিষ্ঠিত হবে এবং সেই চেয়ারম্যান অন্যান্য ক্ষমতা ও অধিকারের ভেতর সেই জিপটির দখল পাবে, যে জিপে চড়ে পরবর্তী সময়ে একদিন উপজেলার নির্বাহী অফিসারের কন্যা জান্নাত আরা ধানঘড়া স্কুলের ছাত্রদের সামনে ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। সে সময়, যখন উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন এবং মফিজুদ্দিনের এই চেয়ারম্যান হওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা গ্রামের লোকেরা শোনে, তারা বুঝতে পারে যে, মফিজুদ্দিনই চেয়ারম্যান হবে; তখন জিনিসটি জটিল হয়ে ওঠে এবং তারা যখন এই খবরটি ক্রমাগতভাবে জানতে পারে যে, খাঁ বাড়ির ইদ্রিস খাঁও এই নির্বাচনে দাঁড়াবে, তারা এই সমস্যাটির সমাধান বুঝতে পারে না; তবে তারা এ রকম ভাবে যে, ইদ্রিস খাঁর ব্যাপারে মফিজুদ্দিন একটা বিহিত নিশ্চয়ই করবে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, সময়ের বদলের বিষয়ে সচেতন হলেও, মফিজুদ্দিন

বদলাতে পারে, এ কথা তারা কখনো ভাবতে পারে নাই। উপজেলা পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে খাঁদের পুরনো জড়তা কেটে যাওয়ার ঘটনা নীরবে অবলোকন করার সময় তারা একধরনের প্রতীক্ষার ভেতর ছিল; তারা ভেবেছিল যে, মফিজুদ্দিনকে পুনরায় পুরনো চেহারায় দেখা যাবে এবং সময়ের পরিবর্তন সত্ত্বেও অনেক বছর আগের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, যখন সত্তর দশকের প্রথম দিকে গ্রামের লোকেরা একবার শুনতে পেয়েছিল যে, সুরধ্বনি গ্রামের আফজাল খাঁ, ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হতে চায় এবং তখন একদিন পরিচিত পুরনো মফিজুদ্দিন মিয়া প্রকাশিত হয়; বিকেলের আলোয় গ্রামের লোকেরা তাকে লুঙ্গির ওপর সাদা পাঞ্জাবি পরে, লাঠি হাতে সুরধ্বনি গ্রামের দিকে যেতে দেখে। সেদিন মফিজুদ্দিন কিছুদূর যাওয়ার পর যখন বুঝতে পারে যে, তার নাতি ফৈজুদ্দিন তার পেছনে আসছে, সে খেপে গিয়ে প্রথমে ফৈজুদ্দিনকে তাড়া করে বিতাড়ন করে তারপর একা খাঁদের ভিটায় গিয়ে ওঠে। সুহাসিনীর লোকেরা এই সব বিবরণ পরে বিস্তারিত জানতে পারে; তারা বলে যে, মফিজুদ্দিন যখন আফজাল খাঁর বাড়িতে যায়, তাকে দেখে আফজাল খাঁ খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে এবং তাকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, সে তার বাপের বন্ধু, তার এবং গ্রামের সকলের সম্মানের পাত্র, সে বেঁচে থাকতে তার ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হওয়ার কোনো চিন্তাই হয় না, সে মেম্বার হয়েই খুশি। তারপর সেদিন মফিজুদ্দিন যখন সুরধ্বনি থেকে ফেরে তখন রাত নেমে যায় এবং সে সময় সুহাসিনীতে যারা তাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে এবং পথের ধারে ছিল তারা দেখেছিল যে, হারিকেন হাতে আলো দেখিয়ে জরাজীর্ণ মফিজুদ্দিন মিয়াকে আফজাল খাঁ মিয়াবাড়ির ভিটার গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সে রাতে সুহাসিনীর এই প্রত্যক্ষদর্শী কৃষকেরা দীর্ঘক্ষণ জেগে থেকে থেলো হুঁকোয় তামাক সেবন করে এবং তাদের গল্পের ভেতর এ রকম বলতে থাকে যে, এই ভূখণ্ডে কেউ ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হতে চাইলে তাকে মফিজুদ্দিনের বয়স এক শ এগার বছর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে; শালার ব্যাটার যে খাঁই, আর যে জিদ, তারা বলে, এবং তারা এই সব আচরণ দর্শনে বিহ্বল হয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে সুহাসিনীর কৃষকেরা পুনরায় যখন একধরনের অপেক্ষার ভেতর দিন কাটাচ্ছিল তখন তারা একসময় এ রকম মনে করতে থাকে যে, মফিজুদ্দিনের বদল হোক বা না হোক, সময়ের বদল হয়েছে; এবং তারা দেখে যে আফজার খাঁর ক্ষেত্রে মফিজুদ্দিন যা করেছিল, ইদ্রিস খাঁর ক্ষেত্রে সে তা করতে পারে না। মফিজুদ্দিন এই কথা ঘোষণা করে যে, সে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রার্থী হবে এবং সে এই কথা বলে যে, সে বিশ্বাস করে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই নির্বাচিত হবে; কিন্তু এবার সে বহু বছর পূর্বের মতো লাঠি হাতে সুরধ্বনির খাঁ বাড়ির দিকে তাড়া করে যায় না; গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন তার প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতি পরিবর্তন করলেও তার মূল প্রকৃতি একই থেকে যায়, সে এবার আফজাল খাঁর এবং তার ছেলে ইদ্রিস খাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন না বদলালেও

আসলে হয়তো বদলে ছিল, কারণ, লাঠি হাতে তাড়া করে যাওয়ার বদলে বৈঠকে বসা একটি পৃথক জিনিস ছিল; তখন গ্রামের লোকেরা মিয়াবাড়ি এবং খাঁবাড়ির বৈঠকখানায় আলোচনা হতে দেখে. কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলে যে, কথাবার্তা বলতে চাওয়ার দ্বারা মফিজুদ্দিন মূলত নিজের কথাটিই পরিষ্কার করে জানিয়ে দিতে চেয়েছিল, ফলে তা প্রায় একতরফা হয়ে যায়; এইসব বৈঠকের সময় সে তার একরোখামি ধরে রাখে এবং ইদ্রিস খাঁকে বলে যে, সে উপজেলা চেয়ারম্যান হবেই, এবং ইদ্রিস খাঁ চাইলে পরে এমপি হতে পারে, আমি বাপু উপজেলা চিয়্যারম্যান হমুই, সে বলে, তুমি নমিনেশন দিয়ো না, দিলে শান্তি পাইব্যা না; এবং সে একই সঙ্গে নয়নতারা হাটের পুরনো কড়ুইগাছ তলায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং চারদিকের লোকদের প্রতি হাত প্রসারিত করে দিয়ে তার দিকে ডেকে আনে এবং বলে, আমি কি এই গেরাম আর এই রায়গঞ্জের নেইগা আমার সারাটা জীবন খরচ করি নাই? সুহাসিনীর লোকেরা বুঝতে পারে যে, উত্তর পাওয়ার জন্য মফিজুদ্দিন তাদেরকে এই প্রশ্ন করে না, তারা বুঝতে পারে যে, এই প্রশ্নের উত্তর তাদের জানাও নাই; তাখন তাদের ফাঁকা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মফিজুদ্দিন বলে, সারা জীবন তোমাগোরে সঙ্গে আছি, সারা জীবনই থাকমু। কিন্তু আফজাল খাঁর ছেলে ইদ্রিস খাঁ, পিতার মতো দ্রুত আত্মসমর্পণ করে না, বস্তুত সে কখনোই আত্মসমর্পণ করে না এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়াই পরিশেষে হার মানে তাও না, পূর্ণিমার রাতে হয়তো কোনো রকম অনুতাপ ছাড়াই সে ধ্বংস হয়ে যায়। নির্বাচনের বিষয়টি যখন খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন ইদ্রিস খাঁর পরিবার মফিজুদ্দিনের নিরক্ষরতার বিষয়টিকে বড় করে তোলে, মফিজুদ্দিন তখন তার ছেলেদের তলব করে ডেকে বাড়ির ভেতর পরামর্শ সভায় বসে এবং সুহাসিনীর লোকেরা জানতে পারে যে, নিজের ছেলে এবং নাতিদের সঙ্গে এই পরামর্শের সময় মফিজুদ্দিন জায়গা ছেড়ে দেয়ার মৌলিক প্রশ্নটির মুখোমুখি হয়; কারণ, সময় বদলের বিষয়টি তার নিজের পরিবারের ভেতর থেকে তখন তার সামনে আসে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার পরিবারের ভেতর, তার দশ নম্বর ছেলে আব্দুল আজিজ তার উত্তরসূরি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ক্রমাগতভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সুরধ্বনির খাঁদের সঙ্গে যখন সংকট দানা বাঁধে এবং মফিজুদ্দিনের নিরক্ষরতার বিষয়টি নির্বাচনী প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে, তখন বাপের সঙ্গে পরামর্শ সভায় বসে, চান্দাইকোনা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক আব্দুল আজিজের মনে হয় যে, মফিজুদ্দিনের বয়স এক শ এগারো বছর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার মানে হয় না। সে তখন এই প্রস্তাব করে যে, তার পিতার উচিত এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো এবং তার বদলে পারিবার থেকে এমন একজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত যে হবে ইদ্রিস খাঁর সমকক্ষ অথবা তার চাইতে যোগ্য। আব্দুল আজিজ নিজের নাম নিজে না বললেও ব্যাপারটা বুঝতে পার যায় এবং এই প্রস্তাবে মফিজুদ্দিন ভয়ানক ক্ষিপ্ত এবং তার ছেলেরা বিভ্রান্ত ও বিভক্ত হয়ে

পড়ে। মিয়াবাড়ির অভ্যন্তরীণ বিভেদ ক্রমাগতভাবে প্রলম্বিত হলে চন্দ্রভানের সবচাইতে বেশি সংকট হয় এবং এই বিপদের নবম দিনে মিয়াবাড়ির ভেতর যখন একাধিক রান্নাঘর তৈরি শুরু হয় তখন চন্দ্রভান শাঁখের করাতের দুধারি টানে দ্বিখণ্ডিত হতে থাকে, তার কথা তার স্বামী এবং সন্তানেরা শোনে না; সে সারা দিন যখন না খেয়ে থাকে তাতেও কেউ বিচলিত হয় না, তখন অভুক্ত এবং মর্মপীড়িত চন্দ্রভানের অস্তিত্ব পুরাতন বিভ্রান্তিতে ফিরে যায়। পরদিন সকালে খালের কিনারায় যখন অজ্ঞান এবং নগ্নাবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকা চন্দ্রভানকে আবিষ্কার করা হয় তখন মফিজুদ্দিন তার ছেলেদের পুনরায় ডেকে জড়ো করে এবং গ্রামের লোকেরা এই বিষয়টি জানতে পারে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া পুত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এই ঘটনার দুদিন পর মিয়াবাড়ির বৈঠকখানায় পুনরায় এক সভা হয়, আফজাল খাঁ এবং তার ছেলে ইদ্রিস খাঁ সেদিন রাতে মফিজুদ্দিন এবং তার ছেলেদের সঙ্গে খাবার গ্রহণ করে এবং তারপর তারা এক আলোচনায় বসে; এই আলোচনার সময় মফিজুদ্দিন মিয়া আফজাল খাঁকে বলে যে, সে তাদের এই দাবি মেনে নিচ্ছে যে, সে উপজেলা চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য দাঁড়াবে না; এবং এরপর সে দুটো প্রস্তাব দেয়, এক, তার ছেলে আব্দুল আজিজ উপজেলা চেয়ারম্যান হবে, এবং দুই, এই এলাকার এমপি নির্বাচন যখন আসবে তখন ইদ্রিস খাঁ এমপি হবে। আফজাল খাঁ এবং ইদ্রিস খাঁ এই প্রস্তাব বিবেচনা করার কথা বলে শেষ পানের খিলি মুখে পুরে চলে যায়। কিন্তু তাদের উত্তর দেয়ার কোনো খবর সুহাসিনীর লোকেরা শুনতে পায় না, তারা যখন রুদ্ধশ্বাস হয়ে অপেক্ষা করে এবং বলে যে, ইদ্রিস খাঁর আর কিছু করার নেই, মফিজুদ্দিন মিয়ার কথা এবার তাকে শুনতেই হবে, তখন, মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের এক সপ্তাহ আগে মফিজুদ্দিন এবং তার পরিবারের সকলে অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে নিহত হলে সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, এবার সম্ভবত তারা ভোট দিতে পারবে। কিন্তু কালক্রমে তারা দেখতে পায় যে, সুহাসিনীতে এবং রায়গঞ্জে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন অব্যাহত থাকে, ইদ্রিস খাঁ উপজেলা চেয়ারম্যান হয় এবং তার বৃদ্ধ পিতা আফজাল খাঁ হয় ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তারপর তারা সুহাসিনীর প্রাইমারি স্কুলের মাঠে একদিন বিরাট সভা করে, সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, গ্রামের ভেতর এ রকম কাণ্ড তারা এর আগে আর হতে দেখে নাই; এই সভায়, বড় আকারের চৌকির ওপর ছোটো চৌকি পেতে উঁচু করে মঞ্চ বানানো হয় এবং এই মঞ্চের ওপর চড়ে বসে বৃদ্ধ আফজাল খাঁ এবং তার দুই ছেলে ইদ্রিস খাঁ এবং রংপুর ক্যান্টনমেন্টের ব্রিগেডিয়ার ইলিয়াস খাঁ। সুহাসিনীর যারা তামাশা দেখার জন্য সেদিন বিছানার চাদর দিয়ে ঢাকা মঞ্চের সামনে বসেছিল তারা বলে যে, আফজাল খাঁ এবং তার দুই ছেলে ক্রমাগতভাবে খালি মফিজুদ্দিনের কথাই বলে; তারা গ্রামের লোকদের এই কথা বলে যে, মফিজুদ্দিনের অত্যাচারের দিন এখন শেষ হয়ে গেছে এবং এখন সুহাসিনীতে, ব্রহ্মগাছায় এবং রায়গঞ্জে শুরু হয়েছে নূতন যুগের। সুহাসিনীর লোকদের

তখন সিরাজগঞ্জ জেল থেকে বের হওয়ার পর ইদ্রিস খাঁ যখন প্রথম সুহাসিনীতে আসে সেই দিনটির কথা মনে পড়ে, সেদিন নয়নতারা হাটের কড়ুইগাছ তলায় দাঁড়িয়ে ইদ্রিস খাঁ একই কথা বলেছিল; সেদিন সে ক্রমাগতভাবে বলেছিল যে, পুরনো দিন এখন আর নাই এখন নূতন সময়ের শুরু হবে, এবং সে ক্রমাগত মফিজুদ্দিনের অনাচারের বর্ণনা দেয় এবং বলে যে, নয়নতারা হাটের নাম হবে রসুলপুরের হাট; কিন্তু আশপাশের কোনো গাঁয়ের নাম রসুলপুর না হওয়ায় তাকে ঘিরে দাঁড়ানো গ্রামের লোকদের বিভ্রান্তি হয় এবং হাটের নাম নয়নতারার হাটই থেকে যায়। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলে যে, ইদ্রিস খাঁ নয়নতারা হাটের কথা ভোলে না, পরবর্তী সময়ে সুহাসিনীর প্রাইমারি স্কুলের মাঠে পিতা এবং দুই পুত্র যেদিন সভা করে, সেদিন এই হাটের নামের প্রসঙ্গটি পুনরায় আসে, ইদ্রিস খাঁ পুনরায় বলে যে, একটি গণিকার নামে হাটের নামকরণ ছিল মফিজুদ্দিনের কুরুচির একটি নমুনা; সে বলে যে, এই হাটের নাম হবে রসুলপুরের হাট এবং সুহাসিনীর হাটের নাম রসুলপুরের হাট হতে না পারলে, সুহসিনীর নাম হবে রসুলপুল; তখন গ্রামের লোকেরা অনুভব করে যে একটা অচেনা অদেখা মেয়ের নাম কেমন করে একটি গ্রামের অন্তর্গত প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তাদের এই গল্পের কথা মনে পড়ে যে, মফিজুদ্দিন এই হাটের নামকরণের পর বলেছিল, নয়নতারা আমার পীরের নাম, সে আমাক কইছিল, তুমি মুসলমান, না হিন্দু? ভয় পায়ো না, আল্লাহ্ নবির নাম নেও, ভয় পায়ো না ভগবানের নাম নেও; এবং এই কথা মফিজুদ্দিনের মুখে সুহাসিনীর লোকেরা বহুভাবে শুনতে পায়।

একাত্তর সনের মার্চ মাসে জনতা এবং সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সেনাদের আক্রমণের মুখে বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জে পাকিস্তান বাহিনীর প্রাথমিক পতনের পর, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে তারা পুনরায় সংগঠিত হয় এবং নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ক্রমাগতভাবে দক্ষিণ দিকে নেমে আসতে থাকে; এপ্রিলের ২২ তারিখে অগ্রসরমাণ এই বাহিনীর কাছে বগুড়া শহরের পতনের খবর যখন সুহাসিনীতে প্রচারিত হয়, সুহাসিনীর লোকেরা নির্বাক উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে থাকে। মফিজুদ্দিনের তিন ছেলেসহ গ্রামের ১৮ জন যুবক তখন লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে কাঁধের ওপর রাইফেলের মতো একটুকরো বাঁশ নিয়ে প্রাইমারি স্কুলের মাঠে কুচকাওয়াজ করে এবং এই সমূহ হুমকির মুখে তখনো গ্রামের চার কোনার তালগাছের মাথায় লাল সূর্যের ভেতর সোনালি মানচিত্র খচিত সবুজ রঙের পতাকা ওড়ে। বগুড়া থেকে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী সব প্রতিরোধ ভেঙে অতিদ্রুত এগিয়ে আসে এবং এপ্রিলের ২৬ তারিখে তারা ধানঘড়ার উল্টোদিকে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে ঘাঁটি গাড়ে। তখন সুহাসিনীর লোকেরা মোটামুটি কাছ থেকে দেখে এই যুদ্ধের প্রকৃতিটা বুঝতে পারে, তারা বুঝতে পারে যে, এই যুদ্ধ খালি হাত এবং বাঁশের লাঠির যুদ্ধ ছিল না। ধানঘড়ার

এই ঘাঁটি থেকে পাকিস্তানি বাহিনী সারা দিন এবং সারা রাত সিরাজগঞ্জ শহরের দিকে ভারি কামানের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। সেদিন নিক্ষিপ্ত প্রথম গোলাটি যখন সুহাসিনীর ওপর দিয়ে একটি অশুভ শক্তির মতো শিস দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে, তখন সুহাসিনীর লোকেরা মাটি কাটার কোদালের কোপের মতো একটি ভোঁতা শব্দ শোনে, তাদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে ওঠে এবং মাচার ওপর রাখা বাসন-কোসন ঝন ঝন শব্দ করে। জীবনে এই প্রথম পায়ের নিচের নিশ্চিত মাটি কেঁপে উঠলে গ্রামের লোকেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে, তারা ছোটাছুটি করে ঘরের বাইরে ক্ষেতের ওপর নেমে আসে, তারপর যখন ক্ষেত এবং প্রান্তরের মাটিও একইভাবে কাঁপতে থাকে, তখন তারা পুনরায় গিয়ে তাদের ছনের ঘরে ঢোকে; কিন্তু ঘর এবং বার কোথাও নিরাপত্তার সন্ধান করতে না পেরে সারা দিন ক্রমাগত গোলাবর্ষণের শব্দ এবং ঝাঁকানিতে দিশেহার লোকেরা সেই মঙ্গলবার সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারের ভেতর মিয়াবাড়ির ভিটায় এসে জড়ো হয়; তখন মফিজুদ্দিন সাদা পাঞ্জাবি গায় দিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসে, তার পাঞ্জাবির খুঁট সন্ধ্যার অস্থির বাতাসে কাঁপে, এবং বিচলিত গ্রামের লোকেরা যখন তাকে ভয় পাওয়া শিশুর মতো ঘিরে ধরে বলে, এহন কি হবি ম্যাসাব, তখন সে কোনো কথা খুঁজে পায় না; সে সন্ধ্যার অন্ধকারের ভেতর ডুবে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, ভয় পায়ো না, আল্লা-নবির নাম নেও, ভগবানের নাম নেও। তার এই কথা শুনে গ্রামের লোকদের নয়নতারার কথা মনে পড়ে, তাদের নয়নতারা হাটের কথা এবং গ্রামের চার কোনায় লাগানো তালগাছের কথা মনে পড়ে, এবং তাদের তখন প্রবল আতঙ্কের সঙ্গে মনে পড়ে, এই তালগাছের মাথায় ওড়ানো স্বাধীনতার পতাকার কথা। তখন বাঁশের লাঠি হাতে প্রাইমারি স্কুলের মাঠে কুচকাওয়াজকারী ১৮ জন যুবকের ভেতর থেকে ৮ জনকে পাঠানো হয় পতাকাগুলো নামিয়ে আনার জন্য; এক ঘণ্টা পর তারা যখন চারটে পতাকা নিয়ে ফেরে তখনো তারা মিয়াবাড়ির উঠোনে গ্রামের নারী, পুরুষ এবং শিশুদের ভিড় করে বসে থাকতে দেখে। পতাকা চারটি নামিয়ে আনার পর এগুলো কোথায় রাখা হবে সে সমস্যা দেখা দেয়; তখন, যখন এ রকম কথা হতে থাকে যে, পতাকাগুলো এই সময় ঘরে রাখা বিপজ্জনক হতে পারে, এগুলো আপতত পুড়িয়ে ফেলা যাক, মফিজুদ্দিনের চিত্রকর ছেলে, আবুবকর সিদ্দিক বাড়ির ভেতর থেকে একটি পলিথিনের ব্যাগ এবং একটি কোদাল নিয়ে আসে এবং অবিরাম গোলা-বর্ষণের শব্দের ভেতর প্রাইমারি স্কুলের দিকে রওয়ানা হয় এবং লাঠি হাতে কুচকাওয়াজকারী ১৮ জন যুবক নীরব মিছিলের মতো তাকে অনুসরণ করে। সেদিন আবুবকর সিদ্দিক এবং অন্য যুবকেরা পলিথিনের ব্যাগে চারটি পতাকা পুরে প্রাইমারি স্কুলের সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলে। সুহাসিনীর লোকদের আট মাস পর ডিসেম্বর মাসের একুশ তারিখের এক হিমেল মঙ্গলবারের কথা মনে পড়ে; সেদিন সুহাসিনীর ১৬ জন যুবক কাঁধে রাইফেল আর স্টেনগান নিয়ে গ্রাম ফিরে আসে, এদের

সঙ্গে মফিজুদ্দিন মিয়ার ছেলে ফরিদ হোসেন এবং আব্দুল আজিজ ফেরে, ফেরে না শুধু চিত্রকর আবুবকর সিদ্দিক এবং সে ফিরে না আসা পর্যন্ত গ্রামের লোকেরা পলিথিনের ব্যাগের ভেতর মাটিতে পুঁতে রাখা পতাকার কথা ভুলে থাকে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, সুহাসিনী গ্রামে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানোয় আবুবকর সিদ্দিকের ওপর মফিজুদ্দিন অবশেষে খুশি হলেও, বহু বছর পূর্বে সে তার পিতাকে একাধিকবার হতাশ এবং রাগান্বিত করে তোলে। প্রথমে, তার পায়ের পাতা একসঙ্গে করে দাঁড়ালে দুই হাঁটু লেগে না যাওয়ার সুবিধে থাকা সত্ত্বেও সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া সম্পর্কিত তার পিতার ইচ্ছা পূরণ করে না, পরবর্তী সময়ে সে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এসব কিছু হওয়ার চেষ্টা না করে ঢাকায় গিয়ে ছবি আঁকার কলেজে ভর্তি হয়। আবুবকর সিদ্দিক সুহাসিনী ত্যাগ করে ঢাকা চলে যাওয়ার পর দুবছর গাঁয়ের লোকেরা তার সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারে না, তার কথা তারা প্রায় ভুলে যায়; এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, তখন একদিন, হেমন্তের কোনো এক বিকেলে তারা যখন মাঠে ধান কাটায় ব্যস্ত ছিল, তাদের কেউ কেউ লক্ষ্মীকোলার ভেতর দিয়ে চারজন শ্মশ্রুমণ্ডিত যুবককে সুহাসিনীর দিকে হেঁটে আসতে দেখে; তাদের প্রত্যেকের কাঁধ থেকে লম্বা ব্যাগ ঝুলে ছিল এবং হাতে ছিল কতগুলো লাঠির একটি করে বোঝা। আবুবকর সিদ্দিক গ্রামে ফিরে, তার তিন সহপাঠী বন্ধুকে নিয়ে মিয়াবাড়ির কাচারিঘরে আড্ডা দিয়ে এবং ছবি এঁকে কাটায় এবং মফিজুদ্দিন তার ক্রোধ তিনটি শহুরে মেহমানের দিকে তাকিয়ে সংবরণ করে রাখার চেষ্টা করে, যদিও পরিণতিতে সে ব্যর্থ হয়। যদিও গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে না যে, ছবি এঁকে লাভ কি, তারা আবুবকর সিদ্দিক এবং তার বন্ধুদের আঁকা ছবি দেখে চমৎকৃত হয়; তারা এমন কিছু নাই যার ছবি আঁকে না, সুহাসিনীর প্রান্তর, বৃক্ষরাজি, বিল ও হোগলার বন, আকাশ শস্য এবং মানুষের ছবি এঁকে মিয়াবাড়ির কাচারিঘর ভরে তুলতে থাকে। তারা ১৩ জন কৃষক এবং ৯ জন ঘোমটা দেয়া কৃষাণীর মুখ আঁকে; গ্রামের লোকেরা বলে যে, এই কাজে শহরের ছেলেগুলো খুব মজা পেয়ে যায়, কারণ, গ্রামের কৃষকেরা এই আঁকিয়েদের দাওয়াত করে খাওয়াতে শুরু করে। এই সময় গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের হিন্দুপাড়ার লোকদের অনুরোধে তারা দশ বাহুধারী দুর্গার ছবি আঁকে, তারপর মিয়াবাড়ির কাচারিঘরে বসে একটি গাছের গুঁড়ি খোদাই করে চার হাত ওয়ালা, জিভ বের করা কালী মূর্তি গড়ে, এবং সুহাসিনীর লোকেরা কাঁচা মাটি দিয়ে আরো একটি অল্পবয়স্ক নারীর আবক্ষমূর্তি নির্মাণের কথা জানতে পারে। তারা বলে যে, আবুবকর সিদ্দিক এবং তার বন্ধুরা ভালোই ছিল, তখন একদিন মফিজুদ্দিন ঘরের ভেতর জোহরের নামাজ পড়া শেষে যখন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ, বলে বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে সালাম ফেরায়, টিনের বেড়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝোলানো তাকের ওপর ধূসর মাটির তৈরি একটি আবক্ষ মূর্তির মুখের ওপর তার চোখ পড়ে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, এই মূর্তিটি আবুবকর সিদ্দিক নিজে তৈরি করেছিল,

এটা ছিল মোল্লা নাসিরউদ্দিনের মৃত প্রেমিকা দুলালির; চন্দ্রভান একদিন যখন আবুবকর সিদ্দিক এবং তার বন্ধুদের অনুপস্থিতিতে কাচারিঘরে আসে, সে মূর্তিটির বিষণ্ন চোখ দুটো চিনতে পারে এবং সেটা নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখে। তারপর নামাজ পড়ার সময় এই নারীমূর্তির ওপর চোখ পড়ায় মফিজুদ্দিন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, সে একটি কাপড় দিয়ে মূর্তিটি ঢেকে পুনরায় সালাম ফেরায় এবং মোনাজাত শেষে যখন চিৎকার করতে থাকে, তখন চন্দ্রভান এসে বলে যে, এটা সে ঘরে এনেছে। মফিজুদ্দিন তখন তার কাচারিঘরে গিয়ে ছবির স্তূপ এবং মূর্তির লাইন দেখে; সে চার হাত ছড়ানো এবং লম্বা জিভ বের করা কালীমূর্তিটিকে চিনতে পারে এবং সে যখন শোনে যে, এই কালীমূর্তিটি গ্রামের হিন্দুদের জন্য বানানো হয়েছে, সে তার একজন চাকরকে পাঠায় তাদেরকে ডেকে আনার জন্য, তারপর সে এই মূর্তিটা ছাড়া ঘরের অন্য মূর্তিগুলোসহ দুলালির মূর্তিটা চাকর দিয়ে বাড়ির পুকুরে ফেলে দেয়। আবুবকর সিদ্দিক এবং তার বন্ধুরা যখন ফেরে তারা দেখে যে, শূন্য কাচারিঘরে শুধু ছবির স্তূপ পড়ে আছে, তখন তারা সব জানতে পারে এবং তারা এমন ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করে যে, তারা তাদের সব চিত্রকর্ম বের করে মিয়াবাড়ির প্রাঙ্গণের ওপর ফেলে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে দিনের এই বহ্ন্যুৎসব থেকে একটিমাত্র চিত্রকর্ম রক্ষা পায়, যেটা অন্যান্য ছবির সঙ্গে ছিল না, ছিল নয়নতারা হাটের পাশে আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়িতে; এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, এই ছবিটার কারণে একাত্তর সনে আইজ্জল প্রামাণিকের পরিবারে দুর্গতি নেমে আসে। গ্রামের লোকেরা যখন মফিজুদ্দিনের এই সন্তানদের নিয়ে কথা বলে, তারা বলে যে, তাদের এরকম স্বপ্নচারী না হয়ে উপায় ছিল না; কারণ, তাদের বাপ জন্মের প্রথম রাতেই ভাংয়ের নির্যাস খেয়েছিল, আর তাদের মা ছিল নিশিগ্রস্ত; তারা বলে যে, মূর্তি পুকুরে ফেলে দেয়ার জন্য নিজেদের আঁকা ছবি পুড়িয়ে তারা যে প্রতিবাদ করে তাতে মফিজুদ্দিনের কিছুই হয় না; সে হয় বিষয়টা বোঝেই না, না হয়, বুঝলেও তা অগ্রাহ্য করে। এই ঘটনার পর চন্দ্রভানের সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে আবুবকর সিদ্দিক এবং তার বন্ধুরা বাড়ি ত্যাগ করে, তারপর দীর্ঘদিন গ্রামের লোকেরা আবুবকর সিদ্দিকের কথা জানতে পারে না। একাত্তর সনের মার্চ মাসে দেশে যখন রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়, গ্রামের লোকেরা সন্ধের সময় রেডিওতে খবর শোনার জন্য মিয়াবাড়ির কাচারিঘরে এসে জড়ো হতে থাকে। পঁচিশ তারিখে রাত থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর টুকরো টুকরো খবর সুহাসিনীতে এসে পৌঁছাতে শুরু করে, তখন বহু বছর পর, কত বছর পর তা গ্রামের মানুষেরা বলতে পারে না, এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, এপ্রিল মাসের এক তারিখে কাঁধে-ঝোলান ব্যাগ নিয়ে আবুবকর সিদ্দিককে সিরাজগঞ্জের দিক থেকে ব্যাঙনাই গ্রামের ভেতর দিয়ে তারা হেঁটে আসতে দেখে। তাকে দেখে গ্রামের লোকেরা তাকে ঘিরে ধরে এবং বলে, ক্যা বাপু, ঢাহার খবর কি, এবং আবুবকর সিদ্দিক শুধু বলে, ভালো না,

তারপর গ্রামের পথ বেয়ে সে যখন মিয়াবাড়ির ভিটায় এসে ওঠে, গ্রামের লোকেরা যারা তাকে দেখতে পেয়েছিল তারাও তার পেছনে আসে এবং পুনরায় বলে, ঢাহার ব্যাবাক মাইনষেক মাইর‍্যা ফালাইছে নাহি? তুমি আইসল্যা কেমন হইর‍্যা? সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত তারা বিবিসি'র খবর শোনে, তারপর আবুবকর সিদ্দিককে জিজ্ঞেস করে, এহন কি হইব বাপু কও। আবুকর সিদ্দিক ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দেয় এবং বলে, যুদ্ধ শুরু হয়্যা গেছে। তারা যে একটা যুদ্ধের সময়ের ভেতর বাস করছে, গ্রামের লোকেরা তা বুঝতে পারে পরদিন যখন তারা দেখে যে, সুহাসিনী এবং সুরধ্বনি গ্রামের ১৮ জন যুবক ও তরুণ বাঁশঝাড় থেকে বাঁশের লাঠি কেটে এনে কাঁধের ওপর রাইফেলের মতো ফেলে সুহাসিনীর প্রাইমারি স্কুলের মাঠে কুচকাওয়াজ করে; সে সময় তারা যখন তাদেরকে দেখে, তাদের মনে এক ধরনের আশা ফিরে আসে। তখন আবুবকর সিদ্দিক সুহাসিনীতে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানোর ব্যবস্থা করে, সে গ্রামের দুজন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ধানঘড়া যায় এবং লাল গোলকের মাঝখানে সোনালি মানচিত্র আঁকা সবুজ রঙের চারটি পতাকা বানিয়ে আনে। গ্রামের তরুণেরা যখন চারটি পতাকা গাঁয়ের চার কোনার তালগাছের মাথায় বাঁশের লাঠির সঙ্গে বেঁধে উড়িয়ে দেয়, তখন সুহাসিনীর লোকেরা, যে যেখানে ছিল সেখান থেকে, গাছের মাথায় বাতাসে কম্পমান এই পতাকা দেখতে পায়, এবং তারা বলে, দ্যাশ স্বাদীন হয়্যা গেছে, বাপু; কিন্তু তারপর পাকিস্তানি বাহিনী রংপুরের দিক থেকে বগুড়া হয়ে নেমে আসে এবং এপ্রিলের ২৬ তারিখে ধানঘড়ায় ঘাঁটি গেড়ে কামানের গোলা বর্ষণ শুরু করে, সেদিন গ্রামের লোকদের সঙ্গে প্রাইমারি স্কুলের মাঠে লাঠি হাতে কুচকাওয়াজরত তরুণেরা এই যুদ্ধের চেহারাটা সামনাসামনি দেখতে পায়; যদিও তার প্রকৃতি তারা তখনো হয়তো পরিষ্কার বুঝতে পারে নাই। সুহাসিনীর লোকেরা যারা গোলাবর্ষণের আতঙ্কে একবার ঘরে একবার বাইরে দৌড়াদৌড়ি করছিল, তাদের ভেতর যারা খেয়াল করে, তারা দেখে যে, গ্রামের এই তরুণেরা মাঠের ওপর শুয়ে পড়ে বাঁশের লাঠি দুহাতের মাঝখানে বাগিয়ে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে নয়নতারা হাটের পাশে জেলা বোর্ডের রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়। এই তরুণেরা নয়নতারা হাটের ঠিক পশ্চিম পাশে, রাস্তার ভাঙা অংশে পানি পার হওয়ার জন্য কলাগাছের যে তুরা ছিল তা ভেঙে সরিয়ে ফেলে, তারপর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের লোকেরা মফিজুদ্দিনের কাছে যখন আসে গ্রামের সব লোকের মতোই সে ভয় পায় এবং বুঝতে পারে যে, সুহাসিনী গ্রামে বাঁশের লাঠি ব্যর্থ হওয়ার পর আল্লাহ্ ছাড়া আপাতত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না; তার তখন অর্ধশতাব্দী পূর্বে যমুনার বুকে এক নারীর মুখে শোনা কথাগুলো মনে পড়ে এবং সে গ্রামের লোকদের দিকে অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে একইভাবে বলে, ভয় পায়ো না; তার মনে হয় যেন, সেই নারীই তার মুখ গহ্বরের ভেতর থেকে এই বরাভয় সুহাসিনীর লোকদের শোনায়। তার কথা শোনার পর গ্রামের লোকেরা, পালানোর জায়গা না থাকায়, পুনরায়

নিজেদের ভিটায় ফেরে; এবং ক্রমাগত গোলাবর্ষণের শব্দের ভেতর সারা রাত কাটানোর পর প্রত্যুষে তারা মিলিটারির পরবর্তী তৎপরতার কথা জানতে পারে। তারা জানতে পারে যে, আগের দিন সারা দিন এবং সারা রাত ধরে গোলাবর্ষণের পর শেষ রাতের দিকে পাকিস্তানি মিলিটারি ধানঘড়া থেকে পুরনো জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে, সিরাজগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয় এবং ফজরের নামাজের একটু আগ দিয়ে সুহাসিনীর উত্তর সীমানায় নয়নতারা হাটের পাশ দিয়ে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের দিকে যায়; এই সময় কামানের গোলাবর্ষণের ভারি আওয়াজের ভেতর বন্দুকের গুলির বিচ্ছিন্ন ফট ফট শব্দ শোনা যেতে থাকে। গ্রামের লোকেরা পুরো সময়টা যে যার ঘরে বসে কাটায়, তারপর দিনের আলো ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকার পর এই ভয়ের ভেতরও গ্রামে হাঁটাচলা শুরু হয় এবং তখন গ্রামের পাশ দিয়ে মিলিটারি চলে যাওয়ার বিবিধ বর্ণনা তারা শুনতে পায়। তারা জানতে পারে যে, খাকি পোশাক এবং ইস্পাতের টুপি পড়া মিলিটারি, পাঁচ/ছ জনের ছোটো ছোটো দলে, রাইফেল বাগিয়ে ধরে ধীর এবং সন্তর্পণে চারিদিকে লক্ষ করতে করতে এগোয়; তারা বলে যে, কোনো জন্তুর গমনপথ যেমন তার পরিত্যাক্ত বিষ্ঠা দেখে চেনা যায়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেদিন এই পথ দিয়ে যাওয়ার চিহ্ন রেখে যায়। মিলিটারিরা অগ্রসর হয়ে লক্ষ্মীকোলা গ্রামের কাছে এসে রাস্তার দুই ধার দিয়ে লাগানো কলাগাছের ঝোপ দেখে ভয় পেয়ে যায়, তারপর তারা যখন বুঝতে পারে যে, ঝোপ জঙ্গলের ভেতর কোনো বিপদ নাই, তখন তাদের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং এই সব গাছ থেকে কলার ছড়ি ঝুলে থাকতে দেখে। গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, মিলিটারিরা এগোতে এগোতে তখন এই কলার ছড়া থেকে পাকা কলা খুঁজে বার করে খায়; এবং এভাবে তখন মিলিটারিদের প্রথম দলটি সুহাসিনীর উত্তরে, নয়নতারা হাটের নিকট জেলা বোর্ডের পুরনো রাস্তার ভাঙা অংশটির কাছে এসে দাঁড়ায়। সড়কের এই ভাঙা অংশের পানি বিস্তৃত হয়ে, দক্ষিণ দিকে রৌহার বিল এবং উত্তরে, রাস্তার ধার দিয়ে বয়ে আসা খালের সঙ্গে মিশে ছিল, ফলে মিলিটারি এখানে এসে আটকা পড়ে যায় এবং এই পানি পার হওয়ার ভুরা আগের দিন বিকেলে লাঠি নিয়ে কুচকাওয়াজ করা যুবকেরা ধ্বংস করে দেয়ায় মিলিটারি রাস্তার এই ভাঙার নিকটে গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামের লোকেরা প্রথমে এই কথা শুনতে পায় যে, পাকিস্তানি মিলিটারি রাস্তার পাশেই গাছপালায় ঘেরা আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়ির ভিটায় এসে ওঠে এবং বাহির বাড়ির কাচারিঘরে রাত্রি যাপনকারী দুজন কামলাকে ডেকে ওঠায়, অথবা তারা জেগেই ছিল, মিলিটারি তাদের শুধু ডেকে বার করে। বিজাতীয় চিৎকার শুনে দরজা খুলে বের হলে তারা মিলিটারিদের একেবারে সামনে পড়ে যায় ফলে দৌড় দেয়ার সকল ইচ্ছে থাকলেও দৌড় দিতে পারে না, এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, এর ফলে তাদের জীবন রক্ষা হয়; কারণ, দৌড় দিলেই তারা গুলি খেত। আইজ্জল প্রামাণিকের এই দুজন কামলা শেষ রাতের আবছা অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে, মিলিটারিরা যখন

ভাঙা ভাষায় পানি পার এবং নৌকোর কথা বলে তখন তারা তা বুঝতে পারে এবং, নৌকা ওই দিহে, বলে হাত দিয়ে এক দিকে ইশারা করে দেখায় এবং মিলিটারিদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে রৌহার ধারে নৌকোর ঘাটের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। পাকিস্তানি মিলিটারিদের তখন সম্ভবত এই অন্ধকারময় ঝোপঝাড়ের ভেতর অগ্রসর না হয়ে উপায় ছিল না, তারা আইজ্জল প্রামাণিকের কামলা দুজনের পেছনে ধীরে এবং সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। তখন একসময় কামলা দুজন হঠাৎ করে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং তাদের পেছনে আসা মিলিটারিরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই নল খাগড়ার জঙ্গল ঠেলে রৌহার কালো পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। পাকিস্তানি মিলিটারিরা যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারে, তারা আবছা অন্ধকার ঝোপঝাড়ের ওপর এক ঝাঁক গুলি ছুড়ে প্রাঙ্গণে ফিরে এসে পুনরায় হাঁকডাক শুরু করে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, আইজ্জল প্রামাণিক মনে হয় যেন তৈরি হয়েই ছিল; মিলিটারির, কৌন হায়, ডাক শুনে সে লুঙ্গির ওপর পুরনো পাঞ্জাবি এবং মাথায় গোল টুপি পরে, দোয়া ইউনুস পড়তে পড়তে বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসে। তারপর সেদিন পুরোটা শেষ রাত জুড়ে মাথায় সাদা টুপি পরা শ্মশ্রুমণ্ডিত আইজ্জল প্রামাণিক লগি ঠেলে তার নৌকোয় করে, সিরাজগঞ্জ পুনর্দখলের জন্য অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি মিলিটারিকে নয়নতারা হাটের পাশে পানি পার করে। সুহাসিনীর লোকেরা, যারা মিলিটারির এই এলাকা নীরবে পার হয়ে যাওয়ার খবরে অবাক হয় এবং একটু স্বস্তি বোধ করে, তারা লগি হাতে আইজ্জল প্রামাণিকের নৌকো পারাপারের কথা শোনে এবং সে দিন দুপুরের পর থেকে পূর্ব দিকের আকাশ লালচে আভাময় হয়ে ওঠা দেখে তারা বুঝতে পারে যে, পাকিস্তানি মিলিটারি সিরাজগঞ্জ শহরে পৌঁছে শহর পোড়াতে শুরু করেছে। তারপর সেদিন বিকেলে গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, আইজ্জল প্রামাণিকের ভাগ্যের বিড়ম্বনা শুধু লগি ঠেলে মিলিটারিদের পানি পার করার ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল না; তারা বলে যে, প্রয়োজনগত কারণে পাকিস্তানি মিলিটারি যত দ্রুত সম্ভব গ্রামের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেলেও, তারা তাদর অস্তিত্বের চিহ্ন একেবারে না রেখে যায় নাই; তারা চলে যাওয়ার পর লক্ষ্মীকোলার রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকে ভক্ষিত কলার খোসা এবং সুহাসিনীতে এক নারীর দগ্ধ জীবন। গ্রামের লোকেরা যখন আইজ্জল প্রামাণিকের মেয়ে আলেকজানের বিষয়ে কথা বলে, তখন তারা জানতে পারে যে, আলেকজানের জীবনের ওপর এই দুর্গতি একটি ছবিকে কেন্দ্র করে নেমে আসে; কার্টিস কাগজের ওপর ছবিটি আবুবকর সিদ্দিক এঁকেছিল এবং এই ছবিটি আলেকজান রেখে দেয়। গ্রামের লোকদের তখন অনেক বছর আগে এক ফসল কাটার মৌসুমের কথা মনে পড়ে, যখন চিত্রকর আবুবকর সিদ্দিক তিনজন শহুরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে এসে হাজির হয় এবং মানুষ ও নিসর্গের ছবি আঁকতে শুরু করে। আবুবকর সিদ্দিক একটি খাতায় কাঠকয়লা দিয়ে বাইশ জন নারীপুরুষের মুখের স্কেচ আঁকে, গ্রামের লোকেরা বলে যে, এর ভেতর ছিল ভাঙা চোয়ালের হাড় জেগে থাকা ভূমিহীন

বর্গাচাষী একাব্বর আলি, নিরীহ চেহারার কিন্তু কাজলটানা ডাগর চোখের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার রব্বেল, গুটু শেখের অশীতিপর মা, ফরিদ হোসেনের মফস্বল শহরের স্ত্রী এবং আরো অনেকের মুখের ছবি; কিন্তু আবুবকর সিদ্দিক এই খাতায় এক মাসে বাইশটি স্কেচ আঁকলেও এই খাতায় শেষ পর্যন্ত ছবি ছিল একুশটি। একদিন যখন আবুবকর সিদ্দিক এবং তার বন্ধুরা মফিজুদ্দিনের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের আঁকা যাবতীয় ছবি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার পর গ্রাম ত্যাগ করে. তাদের এই ক্রোধের আগুনের হাত থেকে দুটো শিল্পকর্ম রক্ষা পায়, এর একটি ছিল কাঁঠাল কাঠের গুঁড়ি কুঁদে নির্মিত ছিন্ন নরমুণ্ডের মালা গলায় চতুর্ভুজা কালীর মুর্তি এবং অপরটি, আবুবকর সিদ্দিকের স্কেচ খাতার পাতায় কয়লা দিয়ে আঁকা আইজ্জল প্রামাণিকের এগারো বছর বয়সী বালিকা কন্যা আলেকজানের মুখ; এবং গ্রামের লোকেরা বলে যে, পরবর্তী সময়ে তারা দেখতে পায়, এই ছবি কেমন করে আলেকজানের এবং হয়তোবা আবুবকর সিদ্দিকেরও জীবন এক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। সে সময় আবুবকর সিদ্দিক যখন তার স্কেচ বইয়ের পাতা ভরে তুলতে থাকে তখন একদিন সে বালিকা আলেকজানকে দেখতে পায়; সেদিন বিকেলে সুহাসিনীর প্রাথমিক স্কুলের মাঠের পাশে সদ্য কেটে নেয়া আমন ধানের ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে সরষের ক্ষেত হলুদ ফুলে ছেয়ে ছিল, দূরে গ্রামের সীমা ঘেঁষে আকাশে মনে হয় ছিল হালকা সাদা মেঘ আর নীরব প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল মৃদু হিমেল বাতাস। তখন, এই স্কুলের মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে আবুবকর সিদ্দিকের এক বন্ধু যখন উজ্জ্বল জলরঙে আকাশ, প্রান্তর এবং দূরের গ্রামের নিসর্গের ছবি আঁকছিল, তখন সে গ্রামের জীবনের এত নিকটে টিকে থাকা নীরবতার ভেতর বসেছিল; সেই সময় এই উপভোগ্য নীরবতা ছিন্ন করে প্রান্তরের ওপর জীবনের কলধ্বনি বিকশিত হয়, একেবারে শূন্যতার ভেতর থেকে একটি বালক এবং একটি বালিকা হেমন্তের সোনালি রোদে হলুদ সরষে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটে যেতে থাকে। আবুবকর সিদ্দিক এবং তার বন্ধু, খালি গা এবং লুঙ্গি উঁচিয়ে ধরা বালক এবং শাড়ির আঁচল হাতে লুটিয়ে থাকা বালিকার ছুটন্ত অবয়ব দেখে এবং এই বিরল নীরব মুহূর্তে তাদের কলহাস্য, দুই বন্ধুর কাছে প্রকৃতির অবয়বে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। তারা তখন প্রকৃতি অবলোকন ত্যাগ করে গরুর তরুণ বাছুরের মতো নেচে নেচে ছুটে যাওয়া বালিকা আলেকজান এবং তার ভাই আমির হোসেনের দিকে তাকিয়ে থাকে; তারা দেখে যে, দূরে মাঠের ভেতর তখনো কিছু জায়গায় পাকা ধান নুয়ে আছে এবং কালো বিন্দুর মতো কৃষকেরা তা কাটে, এবং প্রান্তরের নীরবতা ভেঙে বালক-বালিকা দুটো প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে সেই দিকে যায়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, সেই বিকেলে স্কেচ আঁকার জন্য মুখের সন্ধানরত চিত্রকর আবুবকর সিদ্দিক একটি কণ্ঠের ধ্বনি খুঁজে পায় এবং সে তার বন্ধুকে স্কুলের মাঠে রেখে সেই ধ্বনি অনুসরণ করে তার পরিণতির দিকে এগোয়। মাঠের মধ্যে কৃষকদের কাছে পৌঁছে সে কামলাদের কাজ তদারকিরত আইজ্জল

প্রামাণিককে দেখে এবং ক্ষেতের আলের ওপর বসে আইজ্জল প্রামণিকের সঙ্গে কথা বলে, কলকি বাগিয়ে ধরে তামাক টানে এবং তাদেরকে ঘিরে ছুটোছুটি করতে থাকা আলেকজান এবং আমির হোসেনের হাসির ধ্বনি শোনে; সে সময় প্রকৃতির বিন্যাসে অনির্বচনীয় এমন কিছু হয়তো ছিল, অথবা ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনের ভেতর এমন কিছু ঘটে যে, তার মনে হয় এমন আনন্দ সে তার জীবনে দেখে নাই। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে আলেকজান এবং আমির হোসেন কেটে রাখা ধানের আঁটির ওপর জিরনোর জন্য বসে, তখন মাটিতে আঁচল ফেলে রাখা উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত বালিকার ফর্সা মুখের সুষমা দেখে তার মনে হয়, এই মুখটি আঁকা যায়। কিন্তু পরদিন সে তার ভুল বুঝতে পারে, সেদিন সকালে আইজ্জল প্রামাণিকের বাহির বাড়ির উঠোনে, কলাগাছের ঝোপের কাছে একটি নিচু টুলে আলেকজানকে বসিয়ে সে যখন তার স্কেচবই খুলে ধরে কয়লার টুকরো তুলে নিয়ে আঁকতে থাকে, তখন গম্ভীর এবং শক্ত হয়ে বসে থাকা বালিকার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারে যে, এই আলেকজানকে সে মাঠের পারে দেখে নাই; তার মনে হয় যে, এই মুখ সুন্দর কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলে যে, আলেকজানের সৌন্দর্য সম্পর্কে আবুবকর সিদ্দিকের মতামত পুনরায় পরিবর্তিত হয়; অনেক বছর পর একাত্তর সনের এপ্রিল মাসে সুহাসিনীর পাশ দিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারি চলে যাওয়ার পর সে যখন যুবতী এবং বিষণ্ন আলেকজানের মুখের দিকে তাকায়, সে সেই চরম দুর্যোগের ভেতরও আলেকজানের সৌন্দর্যের বিষয়ে সচেতন হয় এবং তার মনে হয় যে, এই মুখ সুন্দরের চাইতেও বেশি কিছু। সুহাসিনীর উত্তর প্রান্ত ছুঁয়ে এগিয়ে যাওয়া পুরনো জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরে পাকিস্তানি মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর গ্রামের লোকদের ভেতর কিঞ্চিৎ স্বস্তি ফিরে আসে এবং সেদিন বিকেলে গ্রামের লোকেরা আলেকজানের কথা জানতে পারে। তারা বলে যে, আইজ্জল প্রামাণিকের ভদ্র ব্যবহার এবং মাথার টুপি দেখে মিলিটারিরা তার ওপর খুশিই হয়; ছোটো ছোটো দলে এগিয়ে আসা মিলিটারিদের নৌকোর লগি ঠেলে পার করার পর, শেষ দলটি আসে। সেই দলের চারজন মিলিটারি রাস্তার ভাঙা জায়গাটায় এসে তৃষ্ণার্ত বোধ করে এবং পানি পান করতে চায় এবং গ্রামের লোকেরা যখন এই কথা বলে, তারা এই বিষয়টি নিয়ে আফসোস করতে কখনো ভোলে না যে, কেমন অল্পের জন্য আইজ্জল প্রামাণিকের সেদিন ক্ষতি হয়ে যায়। মিলিটারির শেষ দলটি যখন পানি খেতে চায়, সে হাতের লগি মাটিতে পুঁতে তার সঙ্গে নৌকো বাঁধে এবং পানি আনার জন্য বাড়ির দিকে রওনা হয়, তখন পানির কাছে দাঁড়িয়ে না থেকে মিলিটারি চারজন তার পেছন পেছন আসে। আইজ্জল প্রামাণিক বুঝতে পারে নাই যে, মিলিটারিরা তাকে অনুসরণ করে তার বাড়িতে এসে উঠেছে, সে যখন অ্যালুমিনিয়ামের জগে করে পানি এবং একটি কাচের গ্লাস নিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসে, তখন তার বাইরের উঠোনে ভূত দেখার মতো মিলিটারি দেখতে পায়; দু'জন মিলিটারি তার উঠোনের ওপর দুদিকে মুখ করে

দাঁড়িয়েছিল এবং সে যখন পানির জগ নিয়ে এগিয়ে আসে তখন কাচারিঘরের ভেতর থেকে অন্য দুজন মিলিটারি বের হয়। তারা চারজন তখন গ্লাসে করে আইজ্জল প্রামাণিকের ঢেলে দেয়া পানি খায়, তারপর যে দুজন মিলিটারি টিনের চৌচালা কাচারিঘরে প্রবেশ করেছিল তারা কোনো এক ভাষায়, গ্রামের লোকেরা বলতে পারে না কোন ভাষায় তবে তারা বলে যে, সেটা বাঙলা ছিল না কিন্তু আইজ্জল প্রামাণিক সেই ভাষা বুঝতে পেরেছিল, তার কাচারিঘরে টিনের বেড়ার সঙ্গে ঝোলানো ছবির কথা জানতে চায়। মিলিটারির কথা শুনে তার প্রথমে মনে হয় যে, তারা বোধ হয় তার মৃত ছেলে আওলাদ হোসেনের এনলার্জ করানো ছবিটির কথা বলছে, কিন্তু মিলিটারিরা বলে যে, তারা তার ছেলের কথা বলছে না এবং আইজ্জল প্রামাণিকও তখন বুঝতে পারে না যে তারা কোন ছবির কথা বলে; গ্রামের লোকেরা যখন এ কথা বলে, তখন তারা এই সন্দেহ প্রকাশ করে যে, আইজ্জল প্রামাণিকের প্রথমেই বুঝতে পারার কথা, মিলিটারি কোন ছবিটির কথা বলে; কিন্তু তার পক্ষে ভান করা ছাড়া তখন আর কিছুই করার ছিল না; কিন্তু ভান করে শেষ রক্ষা হয় না, মিলিটারিরা যখন দেখে তারা তাকে বোঝাতে পারছে না, তখন তারা পুনরায় কাচারিঘরের ভেতর প্রবেশ করে এবং সেদিন আইজ্জল প্রামাণিককে চরম মাশুল গুনতে হয় তিনটি পুরনো ভুলের জন্য। এগুলো হচ্ছে, রাস্তার ওপর বাড়ি বানানো, সুন্দরী মেয়ে বিয়ে দিয়েও ঘরে রেখে দেয়া এবং পরিবারের মেয়েদের ছবি কাচারিঘরে টাঙিয়ে রাখা; গ্রামের লোকেরা বলে যে, আইজ্জল প্রামাণিকের উচিত হয় নাই রাস্তার ওপর বাড়ি বানানো, কারণ, এর ফলে রাস্তার যেকোনো অচেনা পথিকও বুঝে ওঠার আগেই তার বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে; তার উচিত হয় নাই লুৎফর রহমানকে ঘরজামাই বানিয়ে মেয়েকে ঘরে রেখে দেয়া, তা না করলে যে দিন মিলিটারি বাড়িতে প্রবেশ করে সেদিন আলেকজান হয়তো এখানে থাকত না; এবং সবশেষে, তার উচিত হয় নাই তার কাচারিঘরে আবুবকর সিদ্দিকের কয়লা দিয়ে আঁকা স্কেচটি বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা, কারণ, তারা বলে যে, এই ছবিটি ছিল চোখে পড়ার মতো; তারা এ রকম স্মরণ করতে পারে যে, আইজ্জল প্রামাণিকের কাচারিঘরে টাঙানো এই ছবি দেখে, তাদের বহুদিন মনে হয়েছে যে, এটা আলেকজানের ছবি নয় এবং তাদের ইচ্ছে হয়েছে যে বলে, এই ম্যায়াডো কেডা বাপু? সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, সেদিন মিলিটারি পানি খাওয়ার পরে আইজ্জল প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে তার কাচারিঘরে প্রবেশ করে কাঠকয়লায় আঁকা থুতনি উঁচিয়ে রাখা বালিকা আলেকজানের ছবিটির দিকে নির্দেশ করে, এটা কার ছবি জানতে চায়। তখন আইজ্জল প্রামাণিক, অনেক বছর আগে সুহাসিনীতে চিত্রকর আবুবকর সিদ্দিকের আঁকা শেষ ছবিটি সংরক্ষণ করার ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু কোনো এক কারণে সেদিন মিলিটারি আলেকজানের জীবন বিপর্যয়ে ঢেকে দিয়ে প্রস্থান করার পরেও আইজ্জল প্রামাণিক ছবিটি ধ্বংস করে দেয় না। আগুনের শিখায় লাল হয়ে থাকা বিধ্বস্ত সিরাজগঞ্জের আকাশের দিকে তাকিয়ে

দেখতে দেখতে, গ্রামের লোকেরা সেদিন সুহাসিনীতে সংঘটিত ঘটনা এবং আইজ্জল প্রামাণিক ও তার মেয়ের বিপর্যয় ও বিষণ্নতাকে বর্ণনা করার মতো তথ্য সন্ধের ভেতর মোটামুটিভাবে পেয়ে যায়। তারা বলে যে, কাচারিঘরের ভেতর মিলিটারিরা যখন আলেকজানের কথা জিজ্ঞেস করে তখন আইজ্জল প্রামাণিকের ভয় বাস্তব হয়ে ওঠে, তার কোনো উপায় থাকে না এবং সে যখন বলে যে, ছবিটি তার মেয়ের তখন মিলিটারিরা আলেকজানকে দেখতে চায়; তারপর কি হয় তা গ্রামের লোকেরা বলতে পারে না, অথবা তারা তা বলে না; তবে গ্রামের যেসব লোক এই দৃশ্য দেখেছিল তা তারও পরের ঘটনার কথা বলে, তারা বলে যে, তারা আইজ্জল প্রামাণিকের কুয়োতলায়, যেখানে ভালোমতো ঘেরা দেয়া নেই, এই মিলিটারিদের একে একে ন্যাংটো হয়ে গোসল করতে দেখে; সেই প্রত্যুষে তারা দেখে যে, দড়ি বাঁধা বালতি হাতে বিস্রস্তবসনা আলেকজান কুয়ো থেকে পানি তুলে দেয় এবং নগ্ন মিলিটারিরা তারা গায়ে ঢালে। এভাবে পালাক্রমে চারজনের গোসল করা শেষ হলে এই মিলিটারিরা আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়ি ত্যাগ করে যায় এবং তখন কুয়োতলার পানি এবং কাদার ভেতর বসে, কুয়োর ওপরের বাঁশের বেড়া আঁকড়ে ধরে আলেকজান বুকচাপা হুম হুম কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং তখন মলিন পাঞ্জাবি এবং সাদা গোল টুপি পরা আইজ্জল প্রামাণিক তার কাচারিঘরের বারান্দায় দুহাতের করতলের ভেতর মাথা রেখে একটি নিচু টুলের ওপর বসে থাকে। আইজ্জল প্রামাণিক কতক্ষণ এভাবে বসে থাকে তা কেউ বলতে পারে না, তবে গ্রামের লোকেরা বলে যে, একসময় কাঠকয়লায় আঁকা ছবিটির কথা তার অবধারিতরূপে মনে পড়ে এবং তখন সে উঠে কাচারিঘরের ভেতরে প্রবেশ করে সকালের সেই নরম আলোয় আলেকজানের ছবিটির দিকে তাকায়, তখন তার চোখ পানিতে ভরে যায়, সাদা দাড়ি বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়ায় এবং সে অস্ফুটে 'মা' ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকে; গ্রামের লোকেরা বলে যে, আইজ্জল প্রামাণিকের চোখের পানিতে হৃদয় প্লাবিত হওয়ার কারণে, আবুবকর সিদ্দিকের আঁকা এই ছবিটি দ্বিতীয় বারের মতো রক্ষা পায়। অনেক বছর পর পূর্ণিমা রাতে মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারে নিহত হওয়ার পরদিন গ্রামের লোকেরা দগ্ধ এবং ভস্মীভূত মিয়াবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ভেতর লাশ খুঁজে বার করার সময় চন্দ্রভানকে জিনের এনে দেওয়া লাল শাড়িটির সন্ধান করে, কিন্তু তারা সেটা খুঁজে পায় না; তখন, তারা যখন আগুনে পুড়ে যাওয়া সিদ্দিক মাষ্টার, তার স্ত্রী এবং পুত্রের লাশ পায়, তাদের মনে পড়ে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা চিত্রকর্মটির কথা। তারা যখন সেটা খুঁজে পায়, তারা দেখে যে, এক কোনা ছাড়া ছবিটার বাকি অংশ পুড়ে গেছে, আলেকজানের কপালের একটা অংশ কেবল মাত্র দেখা যায় এবং তারা যখন ঘরের মেঝের ওপর সিদ্দিক মাষ্টারের বাহুর ভেতর মৃত আলেকজানের দিকে তাকায়, তারা দেখে যে, তার চিবুক এবং ডানদিকের গালের একটা অংশও পোড়া; কিন্তু তার পরও, এই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সেই বিভ্রান্তিকর বিপর্যয়ের ভেতরও তাদের ভালো

লাগে, তারা বুঝতে পারে কি পরিমাণ রূপ ছিল মেয়েটির! অনেক বছর আগে আলেকজানের এই চেহারার স্কেচ করার সময় চিত্রকর আবুবকর সিদ্দিকের মনে হয়েছিল যে, এই মুখ বৈশিষ্ট্যহীনভাবে শুধুই সুন্দর, ফলে খাতায় আঁকা ছবিটার বিষয়ে তার খুব আগ্রহ থাকে না; তখন ছবিটা আঁকা হয়ে গেলে আলেকজান এমন খুশি হয়ে ওঠে যে, তার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, তুই নিবি ছবিটা? এবং খাতার পাতা ছিঁড়ে ছবিটা তাকে দিয়ে দেয়, এভাবে এই ছবিটা অন্যান্য ছবির সঙ্গে ধ্বংস হওয়া থেকে প্রথমবারের মতো রক্ষা পায়। পরবর্তী সময়ে একাত্তর সনের এপ্রিল মাসে গ্রামের পাশ দিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারি চলে যাওয়ার পর সে যখন পুনরায় আলেকজানকে দেখে, তার মনে হয় যে, সুন্দরের চাইতেও বেশি কিছু আছে এই মুখে; এবং সেদিন সন্ধ্যার পর এবং রাতে সুহাসিনীর লোকেরা যখন আলেকজানের জীবনের বিপর্যয় নিয়ে কথা বলে, তারা জানতে পারে যে, এই বিপর্যয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আবুবকর সিদ্দিকের আঁকা ছবিটি। সুহাসিনীর লোকেরা পরে বলে যে, এই কাহিনী গ্রামে প্রচারিত হলে তা আবুবকর সিদ্দিকের কানেও যায়, তখন অনেক বছর পর তার আলেকজানের কথা মনে পড়ে এবং সে খুবই বিচলিত বোধ করে, রাত্রিটি তার অল্প নিদ্রা অথবা নিদ্রাহীনতায় কাটে এবং পরদিন প্রত্যুষে সে আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়িতে যায়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, আগের দিন সকালে উঠে আইজ্জল প্রামাণিক দেখে যে, তার প্রাঙ্গণে বন্দুক হাতে মিলিটারি খাড়া, পরদিন মিলিটারির জায়গায় আসে আবুবকর সিদ্দিক। সে আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়িতে আসার পর সকলের সঙ্গে তার দেখা হয়, আইজ্জল প্রামাণিক, আমির হোসেন, আলেকজান এবং তার স্বামী লুৎফর রহমানের সঙ্গে কথা হয়; কিন্তু তাদেরকে সে জিজ্ঞেস করতে পারে না গ্রামের লোকেরা যা বলে তা সত্য কি না; তবে তার মনে হয় যে, গ্রামের লোকেরা যেমন বলে, আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়ির সর্বত্র যেন এক নীরব বিষণ্নতা ছড়িয়ে আছে; তখন উঠানে দাঁড়িয়ে আমির হোসেনের সঙ্গে কথা বলার সময়, ঘরের দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়ানো নতদৃষ্টি আলেকজানের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বেদনা দেখতে পায়; তার অন্তরের ভেতরটা মোচড় খায় এবং তার মনে হয় যে, এই মুখটার মতো মুখ জীবনে সে দেখে নাই। গ্রামের লোকেরা সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে বিশদ জানতে পারে, তারা বলে যে, আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে ফিরে আসার সময় আবুবকর সিদ্দিক কাচারিঘরে ঢুকে আলেকজানের ছবিটার সামনে দাঁড়ায় এবং সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর আলেকজানকে সে এই ঘরে প্রবেশ করতে দেখে। আবুবকর সিদ্দিকের একধরনের অপরাধবোধ এবং অনুশোচনা হয়তোবা হয়, কারণ, সে তখন এই ছবিটি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু আলেকজান সম্মত হয় না; তখন আবুবকর সিদ্দিক এই যুবতী নারীর দিকে তাকিয়ে মেঘাচ্ছন্ন চাঁদের মতো এক সৌন্দর্য দেখে এবং তার মুখের আর-একটি স্কেচ আঁকার ইচ্ছে ব্যক্ত করে, তখন আলেকজান

পুনরায় নীরবে আবুবকর সিদ্দিকের দিকে তাকায়, এবং সেই দৃষ্টিতে ক্রোধ, না ভর্ৎসনা ছিল, নাকি ছিল শুধুই বিষণ্নতা, গ্রামের লোকেরা তা বলতে পারে না; তারা শুধু বলে যে, আলেকজানের চেহারায় এমন একটা কিছু ফুটে ওঠে, যা দেখে আবুবকর সিদ্দিক পুনরায় বিপর্যস্ত বোধ করে এবং আর একটি কথাও না বলে আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়ি ত্যাগ করে আসে।

এসব ঘটনার কারণে, অনেক বছর পর মফিজুদ্দিন মিয়া যে দিন সপরিবারে নিহত হয়, সেদিন অন্য সকলের সঙ্গে আলেকজানের নিহত হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে যায়; সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, কেবল মাত্র দুলালি এই হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পায়, কারণ, দুলালি তার আগেই মরে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মৃত দুলালির আঁচলে বাঁধা চিরকুটটা পড়ে তার বাপ মোবারক আলি তার লাশ দাফন করতে দেয় না এবং তার মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনের অপরাহ্নে চন্দ্রভান মোবারক আলির ভিটায় আসে এবং তার একটু পর, সেই সন্ধ্যায় আবুবকর সিদ্দিক ঢাকা রওনা হয়। সুহাসিনীর যেসব লোক গ্রামে এই সব ঘটনা ঘটতে দেখেছিল, তারা বলে যে, আবুবকর সিদ্দিক একদিন মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে সঙ্গে করে গ্রামে ফিরে আসে এবং তখন তারা সবকিছু জানতে পারে; সেদিন রাতটা সিরাজগঞ্জ শহরে আত্মীয়বাড়িতে কাটিয়ে সকালবেলা ট্রেনে চেপে আবুবকর সিদ্দিক সন্ধ্যার পর ঢাকা গিয়ে পৌঁছে রেলস্টেশন থেকে রিকশায় চেপে প্রকৌশল কলেজের হোস্টেল যায় এবং মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে পাওয়ার পর তাকে প্রথমে বিভ্রান্ত করার জন্য বলে যে, সে বেড়াতে এসেছে; তারপর রাতের খাবার খাওয়া হলে সে দুলালির মৃত্যুর খবরটি দেয় এবং বলে যে, সে না গেলে এই মেয়ের লাশ দাফন করা যাচ্ছে না। তখন আবুবকর সিদ্দিক দুলালির মৃত্যুর পর আঁচলের খুঁটে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া চিরকুটটা তার পকেট থেকে বের করে দেয় এবং সেটা পড়ে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের চেহার আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে রাতে হোস্টেলের চাপা চৌকিতে দুভাই পাশাপাশি লম্বা হয়ে শোয়, তারপর মোল্লা নাসির যখন নিশ্চিত হয় যে, আবুবকর সিদ্দিক ঘুমিয়েছে, বিছানা ত্যাগ করে উঠে গিয়ে সে বাইরে বারান্দায় দাঁড়ায়। তারপর সে ঘরে ফিরে চৌকির তলা থেকে তার তোরঙ্গটি টেনে বার করে আনে, এই টিনের তোরঙ্গের ভেতর একটি পকেটে রাখা ছিল দুলালির লেখা একুশটি চিরকুট। মোল্লা নাসিরউদ্দিনের জানা ছিল যে, এই সব চিরকুটের সবগুলোই সে পড়েছে এবং সে জানে এগুলোতে কি লেখা আছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলে যে, একটি চিরকুট মোল্লা নাসিরের প্রকৃতপক্ষে পড়া ছিল না; কারণ, একের পর এক 'তুমি কেমন আছ' লেখা চিরকুট পড়ে সে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন সে একদিন একটি চিরকুট আর খুলে না পড়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে অন্য চিরকুটের সঙ্গে রেখে দেয় এবং তারপর থেকে দুলালি যখন ক্রমাগতভাবে ১৪টি চিরকুটে লেখে 'তুমি কিছু কও না কেন' তখন মোল্লা নাসিরউদ্দিন

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সে তার অর্থ বুঝতে পারে না এবং দীর্ঘদিন পর তার কলেজ হোস্টেলে ঘুমন্ত আবুবকর সিদ্দিকের পাশে চৌকির ওপর বসে চিরকুটগুলো সে যখন পুনরায় পড়ে তখনই কেবল তার এই বিভ্রান্তি দূর হয়; সে বুঝতে পারে, দুলালি আসলে কি জানতে চেয়েছিল; কারণ, তখনই কেবল সেই অপঠিত কাগজের টুকরোটিতে লেখা বাণী প্রকাশিত হয়। পরপর ছটি চিরকুটে 'তুমি কেমন আছ' লেখার পর দুলালি বোধ হয় আর পারে না, সপ্তম চিরকুটে সে লেখে, 'তুমি আমাক বিয়া কইরবা?' লজ্জা এবং আকাঙ্ক্ষার এই বাক্যটি কতদিন চাপা পড়ে থাকে গ্রামের লোকেরা তা বলতে পারে না, তারা শুধু বলে যে, শেষে মোল্লা নাসিরউদ্দিন যখন সেটা পড়ে, সেদিন রাতে তার আর ঘুম আসে না, আবুবকর সিদ্দিকের পাশে শুয়ে নিদ্রাহীন রাত কাঠানোর পর ফজরের নামাজ পড়ার সময় রুকুতে গিয়ে সে ভেঙে পড়ে, উবু থেকে সোজা না হয়ে, সেজদায় চলে যায় এবং 'সোবহানা রাব্বুল আলা' পড়তে পড়তে, অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম সুহাসিনীর কালো রঙের বালিকা দুলালির জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কোনো এক সময় অস্পষ্ট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলে আবুবকর সিদ্দিক মেঝেতে বিছানো জায়নামাজের ওপর পশ্চিম মুখে লুটিয়ে থাকা অতি নিম্নস্বরে ক্রন্দনরত মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দেখতে পায় এবং সেদিনের কথা সে কোনোদিন ভুলতে পারে না। কয়েক বছর পর আবুবকর সিদ্দিক ঢাকা গিয়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হয় এবং একবার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সুহাসিনীতে গিয়ে যখন এক মাস থাকে তখন তারা কতগুলো ছবি আঁকে এবং কতগুলো আবক্ষমূর্তি নির্মাণ করে, কিন্তু এই সব ছবি এবং মূর্তির সবগুলো চরিত্র ছিল জীবিত মানুষের, কেবল দুলালিরটি ছাড়া। আবুবকর সিদ্দিক কেন বড় ভাইয়ের মৃত প্রেমিকার আবক্ষমূর্তি গড়ে তা গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে না, তাদের শুধু মনে হয় যে, মিয়াবাড়িতে দুলালির প্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু একদিন তারা ক্রুদ্ধ মফিজুদ্দিন কর্তৃক এই প্রতিমা বিসর্জন দেয়ার খবর শুনতে পায় এবং সেদিন এই ঘটনার পর আবুবকর সিদ্দিক এবং তার বন্ধুরা তাদের সব শিল্পকর্ম ধ্বংস করে সুহাসিনী ত্যাগ করে যায়, শুধুমাত্র হিন্দুপাড়ায় কালীমূর্তি এবং আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়িতে বালিকা আলেকজানের মুখের স্কেচটি থাকে।

আলেকজানের যে স্কেচটি আবুবকর সিদ্দিকের পছন্দ হয় নাই, সেই ছবিটাই টিকে থাকে এবং একাত্তর সনে বাড়ির পাশ দিয়ে মিলিটারি চলে যাওয়ার পর একদিন সকালে যুবতী রমণী আলেকজানের সোনার প্রতিমার মতো মুখের ওপর বেদনার ম্লান ছায়ার দিকে তাকিয়ে যে ছবিটি তার আঁকতে ইচ্ছে করে, তা আর কখনোই আঁকা হয় না। সেদিন আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়ি ত্যাগ করে আসার পর গ্রামের লোকেরা তাকে আর মিয়াবাড়ির বাইরে দেখতে পায় না, তারা বলে যে, সারা দিন সে তাদের বাড়ির ভেতর শুয়ে থেকে কাটিয়ে দেয়। এর কিছু দিন পর গ্রামের লোকেরা ক্রমাগতভাবে গ্রামের ছেলেদের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার খবর পেতে থাকে,

খড়ের বেণির আগুনে কলকি সাজিয়ে তারা তামাক খায় এবং আউসের মাঠে নিরানি দিতে দিতে যুদ্ধের কথা বলে এবং এভাবে তারা খবর পায়, গ্রামের কে কে যুদ্ধে গেল। গ্রামের লোকেরা যেসব ছেলের কথা বলে, তাদের মোট সংখ্যা তারা কখনো গুনে দেখে না, এই প্রসঙ্গে যখন কথা হয় তখন তারা বলে যে, গ্রাম থেকে হয়তো এক কুড়ি ছেলে যুদ্ধে গেছে, কিংবা হয়তো দুই কুড়ি। সে সময় একদিন আলেকজানের স্বামী লুৎফর রহমানের যুদ্ধে যাওয়ার খবর পাওয়া যায় এবং তারপর একদিন গ্রামের লোকেরা জানতে পারে রাতের বেলা এক নৌকো বোঝাই তরুণের নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা; তারা জানতে পারে যে, এই নৌকোয় অনেক লোকের ভেতর ছিল সুরধ্বনি গ্রামের ইদ্রিস খাঁ এবং মফিজুদ্দিন মিয়ার চার ছেলে, শাহজাহান আলি, ফরিদ হোসেন, আব্দুল আজিজ ও আবুবকর সিদ্দিক। গ্রামের লোকেরা তখন বলে যে, একটি নারীর জন্য দু জন যুদ্ধে যায়, এদের একজন লুৎফর রহমান এবং অপরজন আবুবকর সিদ্দিক এবং এদের একজন শহীদ হয়, অন্যজন গাজি হয়ে ফিরে আসে; তারা বলে যে, ঢাকা থেকে সুহাসিনীতে ফিরে স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানো, ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের কথা বিবেচনা করলে বলা যায় যে, আবুকর সিদ্দিক মুক্তিযুদ্ধে যেত, অথবা সে হয়তো যুদ্ধে যেত না, কারণ, মানুষ কি করবে তা সব সময় সঠিকভাবে বুঝে ওঠা কঠিন; কিন্তু তখন সুহাসিনীর পাশ দিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারি চলে যাওয়ার পর আলেকজানের মুখের দিকে তাকিয়ে সে যখন আর-একটি ছবি আঁকতে চায় কিন্তু আলেকজান সম্মত হয় না, তখন নীরব আলেকজানের মুখ এবং সেই মুখের বেদনা তার জন্য অন্য একটি পথই খোলা রাখে, তা হলো মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া। গ্রামের লোকেরা বলে যে, সেদিন সকালে আলেকজান যখন তার দিকে তাকায়, সে বুঝতে পারে না মেয়েটির দৃষ্টি কি বলে, কিন্তু সে সেই দৃষ্টির কথা ভুলতে পারে না; সে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে ঘরের ভেতর শুয়ে থাকে এবং একদিন গভীর রাতে গ্রামের অন্যান্য ছেলের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য গ্রাম ত্যাগ করে। সাত মাস পর ডিসেম্বরের হিমেল দিনে এই তরুণেরা যুদ্ধ শেষে ফিরে আসতে থাকে, তখন একদিন চারজন মুক্তিযোদ্ধা ফিরে আসে এবং তাদের কাছ থেকে লুৎফর রহমানের নিহত হওয়ার খবর পাওযা যায়; হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি গোটানো সেই নগ্নপদ তরুণেরা লক্ষ্মীকোলার ভেতর দিয়ে হেঁটে আসে, সুহাসিনীতে পৌছে তারা প্রথমে আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ায় এবং আলেকজানের স্বামী লুৎফর রহমানের মৃত্যু সংবাদ দেয়, তারা বলে যে, রাজশাহীর কাছে পাকিস্তানি মিলিটারির সঙ্গে এক খণ্ড-যুদ্ধের সময় সে নিহত হয়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, আবুবকর সিদ্দিকের আঁকা একটি ছবির জন্য আইজ্জল প্রামাণিকের দুর্ভাগ্য একের পর এক সংযোজিত হয়; যুদ্ধে প্রিয় কন্যার জামাতার মৃত্যুর খবর শুনে তার চোখ থেকে অশ্রু নেমে আসে, আলেকজানের দুর্ভাগ্যে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কিন্তু এই খবর শুনে আলেকজান কেমন আচরণ করে তা গ্রামের লোকেরা বলতে পারে না, তবে তারা বলে

যে, আলেকজান লুৎফর রহমানের মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করতে পারে না। এরপর এইসব গ্রামে যখন ক্রমাগতভাবে মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের প্রত্যাবর্তনের খবর পাওয়া যেতে থাকে, গ্রামের লোকেরা খবর জানা এবং গল্প শোনার জন্য তাদের বাড়িতে গিয়ে ভিড় করে, এবং এই জনতার ভেতর চার বছরের শিশুকন্যা জয়তুনের হাত ধরে ঘোমটা টানা আলেকজানকে দেখা যায়; সে লুৎফর রহমানের খবর জানার চেষ্টা করে, আমাগোরে জয়তুনের বাপের কোনো খবর জানেন নাহি, সে জিজ্ঞেস করে, এবং দেখা যায় যে, তারা কেউ আলেকজানকে লুৎফর রহমানের বিষয়ে কোনো নূতন খবর দিতে পারে না। তখন একদিন মুক্তিযোদ্ধাদের আর-একটি বড় দল ফিরে আসে, এই দলের সঙ্গে মফিজুদ্দিন মিয়ার দুই ছেলে, ফরিদ হোসেন এবং আব্দুল আজিজ ফেরে এবং তারা তাদের অপর ভাই শাহজাহান আলির মারা যাওয়ার খবর দেয়, কিন্তু আবুবকর সিদ্দিক সম্পর্কে তারা কিছু বলতে পারে না, তখন, তারপর মফিজুদ্দিন মিয়ার বাড়িতে মৃত পুত্রের জন্য শোক এবং নিখোঁজ পুত্রের জন্য প্রতীক্ষা শুরু হয়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, ডিসেম্বরের বিশ তারিখের পর একটি একটি করে দিন যেতে থাকে কিন্তু আর কেউ গ্রামে ফেরে না, তখন ডিসেম্বরের ত্রিশ তারিখে বুধবার সকালের একটু পর লক্ষ্মীকোলার রাস্তার পাশের শীর্ণ খাল বেয়ে একটি ছৈ-তোলা মাঝারি আকারের নৌকো এগিয়ে এসে রৌহার বিলের ভেতর পড়ে এবং মিয়াবাড়ির পেছনের ঘাটের দিকে এগোয়। বস্তুত লক্ষ্মীকোলার কাছে থাকতেই নৌকোটি গ্রামের লোকদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং খবরটি গ্রামের ভেতর দ্রুত প্রচারিত হয়ে যায়, মুক্তিযোদ্ধাগোরে নৌকা আইসত্যাছে; গ্রামের লোকেরা তখন খালের পাড় দিয়ে চিৎকার করে দৌড়াতে থাকে। নৌকোটি যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মিয়াবাড়ির ঘাটে ভেড়ে তখন সেখানে নারী, পুরুষ এবং শিশুর একটি ভিড় গড়ে ওঠে এবং এই ভিড়ের ভেতর, ঘাটের সবচাইতে নিকটে দুটি নারীকে দেখা যায়, এদের একজন চন্দ্রভান এবং অপরজন আইজ্জল প্রামাণিকের মেয়ে আলেকজান। এই নৌকোয় করে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবুবকর সিদ্দিক এবং আশপাশের গ্রামের অন্য ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা ছেলে ফেরে; তারা যখন নৌকো থেকে ঘাটের কাছে মাটির ওপর নেমে আসে, জনতা তাদেরকে ঘিরে ধরে এবং আবুবকর সিদ্দিক এই জনতার ভেতর আলেকজানকে তার শিশুকন্যার হাত ধরে দাঁড়ানো দেখে, তখন তার এমন আনন্দ হয় যে, সে আলেকজানের মুখের বিষণ্ন উৎকণ্ঠা লক্ষ করে না। সে তার কাঁধের বন্দুক ঝাঁকি দিয়ে ঠিক করে, এলোমেলো শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখটা গাছপালার মাথার দিকে উত্থিত করে হেসে ওঠে এবং আলেকজানের দিকে ডান হাত প্রসারিত করে দিয়ে চিৎকার করে, ভালো আছিস তুই, আলেকজান? গ্রামের লোকেরা বলে যে, আবুবকর সিদ্দিকের চিৎকার শুনে তারা আলেকজানের উপস্থিতির বিষয়ে সচেতন হয় এবং মাথার ঘোমটা পড়ে যাওয়া তার মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে তারা তার চোখে বর্ষার পুকুরের মতো অশ্রু উপচে পড়তে দেখে। তারা এই কথাটি বুঝতে পারে না যে,

মিয়াবাড়ির ঘাটে দাঁড়িয়ে আলেকজান কি শুধু লুৎফর রহমান না ফেরার হতাশায় কাঁদে, নাকি আবুবকর সিদ্দিকের প্রত্যাবর্তনের আনন্দেও তার কান্না আসে? আলেকজানের এই অশ্রুর সঙ্গে কতটুকু আনন্দ এবং বেদনা নির্গত হয় তার হিসেবে গ্রামের লোকেরা করতে পারে না; তাদের মনে পড়ে, সেই ক্ষণটি তখন বিষাদ মলিন হয়ে ওঠে, কারণ চন্দ্রভান যুদ্ধে নিহত শাহজাহান আলির জন্য বিলাপ করতে থাকে। আলেকজানের চোখের পানির কারণ আবুবকর সিদ্দিক তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারে না; সুহাসিনীতে যখন তাদের নৌকো প্রথম প্রবেশ করে তখন ছৈয়ের ওপর উড়তে থাকা পতাকার দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়েছিল যে, প্রাইমারি স্কুলের মাঠে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে তারা একদিন প্রাণের ভয়ে স্বাধীনতার পতাকা পুঁতে ফেলেছিল, তারপর মিয়াবাড়ির ঘাটে নৌকো ভেড়ার পর পাড়ে নেমে আলেকজানকে দেখে তার মনে পড়ে আটমাস আগে গ্রামের পাশ দিয়ে মিলিটারি চলে যাওয়ার পর একদিন সকালে আলেকজানের চেহারায় যে ভাষার প্রকাশ ঘটেছিল, যা দেখে, সে আলেকজানের মুখের আর একটি ছবি আঁকার ইচ্ছে ত্যাগ করে আইজ্জল প্রামাণিকের ভিটা ত্যাগ করে আসে। নৌকো থেকে নামার পর তার মা যখন তার প্রত্যাবর্তনের আনন্দে এবং তার ভাইয়ের মৃত্যুর বেদনায় তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, তখন সে তার মাকে ধরে রেখে পুনরায় আলেকজানের মুখের দিকে তাকায় এবং তার চোখে সে অশ্রু টলমল করতে দেখে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, আলেকজানের দিকে তাকিয়ে তখন আবুবকর সিদ্দিক কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু পরে যখন সে সব জানতে পারে তখনো মনে হয় যেন সে গ্রামের লোকদের মতোই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, বুঝে উঠতে পারে না, সেদিন মিয়াবাড়ির পেছনের ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে আলেকজান কেন কেঁদেছিল, সে কি শুধুই বেদনায়? সেদিন চন্দ্রভানকে জড়িয়ে ধরে রেখে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করার পর সে তাকে অনুসরণ করে আসা গ্রামবাসীদেরকে প্রাইমারি স্কুলের মাঠে পুঁতে রাখা পতাকার কথা জিজ্ঞেস করে, পতাকাগুলান খুঁইড়্যা বাইর কইরছ না? তার কথা শোনার পর গ্রামের লোকদের সেই পতাকার কথা মনে পড়ে এবং তারা যখন বলে যে, তাদের পতাকার কথা মনে ছিল না, তখন পিঠে রাইফেল এবং স্টেনগান ঝোলানো সাত জন মুক্তিযোদ্ধার পেছনে কোদাল হাতে একদল গ্রামবাসী সুহাসিনীর প্রাইমারি স্কুলের মাঠের দিকে যায়। তারা এই মাঠের কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় এক জায়গায় খুঁড়ে পলিথিনে ব্যাগে জড়ানো পতাকাগুলো বার করে, তারপর সেদিন কিছুক্ষণ পর গ্রামের চার কোনার তালগাছের মাথার ওপর শীতের নরম রোদের ভেতর পতাকাগুলো পুনরায় উড়তে থাকে এবং তখন মিয়াবাড়ির ভেতর আবুবকর সিদ্দিকের পুনরায় মনে পড়ে তার যুদ্ধে যাওয়ার আগে আলেকজানের মুখের আর-একটি ছবি আঁকার আকাঙ্ক্ষার কথা; তখন সে খুঁজে কিছু সাদা কাগজ বের করে এবং চুলা থেকে সংগ্রহ করে কাঠ কয়লা, এভাবে প্রস্তুত হওয়ার পর দুপুরে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে সে শুনতে পায় আলেকজানের বিধবা হওয়ার খবর। গ্রামের লোকেরা বলে যে, এই

খবর পাওয়ার পর খরায় ফেটে যাওয়া ফসলের জমির মতো আবুবকর সিদ্দিকের হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়, সে গোসল শেষে চুপচাপ ভাত খেয়ে সারা বিকেল কাচারিঘরের টিনের চালের দিকে তাকিয়ে পাটিবিছানো চৌকির ওপর পড়ে থাকে; মুক্তিযুদ্ধ তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়, কারণ, গ্রামের লোকেরা বলে যে, আবুবকর সিদ্দিকের মনে হয় যুদ্ধ জয়ের পরেও বেদনা থেকে আলেকজানের মুক্তি আসে না; এক বেদনার ভেতর এই নারীকে রেখে সে যুদ্ধে যায়, ফিরে এসে তাকে সে পায় আর এক বেদনার ভেতর। পরদিন সকালে সে আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়িতে গিয়ে কাচারিঘরে তার আঁকা ছবিটির সামনে পুনরায় যখন দাঁড়ায়, তখন একসময় অবধারিতরূপে আলেকজান আসে, কিন্তু এই দিনও আলেকজানের সঙ্গে তার একটিও কথা হয় না, বিষণ্ন নির্লিপ্ত এই রমণীর দিকে সে নীরবে তাকায়, তারপর সেই ঘর এবং প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে আসে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, এই সময় হয়তো সে তার জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নেয়; আইজ্জল প্রামাণিকের কাচারিঘর থেকে বের হয়ে আসার পর সে ঢাকা ফিরে না গিয়ে গ্রামে থেকে যায়। এরপর একটি বছর সে এই নারীকে দেখে না; সে তার দাড়ি কেটে ফেলে, ঝোলার ভেতর থেকে রঙতুলি বের করে ফেলে দেয় এবং সুহাসিনীর প্রাইমারি স্কুলে মাষ্টারি শুরু করে। চিত্রকর আবুবকর সিদ্দিক যখন গ্রামের সিদ্দিক মাষ্টার হয়ে ওঠে তখন, এক বছর পর আর-এক হেমন্তের ফসল কাটার মৌসুমে, পাকা ফসলের মাটে কাঁচি হাতে নুয়ে থাকা কৃষকেরা একদিন বিকেলে গায়ে চাদর জড়ানো ঘোমটা দেয়া চন্দ্রভানকে, নাতি ফৈজুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে বহুদিন পর পুনরায় মিয়াবাড়ির ভিটা থেকে নেমে আসতে দেখে, এবং গ্রামের লোকেরা একটি কথাও জিজ্ঞেস না করে বুঝতে পারে, চন্দ্রভান কোথায় যায়।

মোরগ কোলে বালিকা দুলালির কথা তখন গ্রামের লোকদের মনে পড়ে, দুলালির মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনের বিকেলে এ রকম আর একবার তারা ঘোমটা দেয়া চন্দ্রভানকে মিয়াবাড়ির ভিটা থেকে নেমে এসে মোবারক আলির ভিটার দিকে হেঁটে যেতে দেখেছিল এবং সেদিন, তার একটু পর, আবুবকর সিদ্দিক ঢাকা রওনা হয়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, আবুবকর সিদ্দিক এই সময়কার ঘটনাবলি ভুলতে পারে না বলে পরবর্তী সময়ে বড় ভাইয়ের প্রেমিকার আবক্ষমূর্তি গড়ে। তারা বলে যে, ঢাকা পৌঁছার পর সে খবরটা মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দেয় এবং পরদিন সকালে সে দেখে যে, চৌকিতে তার পাশে তার ভাই নাই; তখন সে খুব অস্পষ্ট ফোঁপানোর শব্দ শোনে এবং ঘাড় উঁচু করে নিচে মেঝেতে জায়নামাজের ওপর সেজদায় পড়ে থাকা মোল্লা নাসিরকে দেখে। সেদিন আর একটু পর তারা ট্রেন ধরে রওনা হয়, রাত দশটার সময় তারা সিরাজগঞ্জ শহরের বাহিরগোলা স্টেশনে পৌঁছয় এবং সিরাজগঞ্জে অপেক্ষা না করে মাঝরাতে এসে পৌঁছয় সুহাসিনীতে। পরদিন সকালে গ্রামের লোকেরা মোল্লা নাসিরউদ্দিনের আগমনের কথা

জানতে পারে, জুম্মা ঘরে ফজরের নামাজ পড়ার পর তারা মোবারক আলির বাড়িতে গিয়ে ভিড় করে এবং দুলালিকে কবর দেয়ার শেষ পর্ব অবলোকন করে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, সেদিন সকালে দুলালির দাফনকর্মে শরিক হওয়ার মতোই তাদের প্রবল আগ্রহ হয় মোল্লা নাসিরকে দেখার; কারণ, তারা বলে যে, ঘটনার প্রকৃতি তাদেরকে বড়ই উত্তেজিত করে তোলে, তারা বুঝে উঠতে পারে না, যে পুরুষকে দেখতে পাওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করে একজন নারী মরে যায়, সেই পুরুষটি যখন সব জেনেশুনে সেই নারীর লাশের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সে কেমন ব্যবহার করে! মোবারক আলির বাড়িতে গ্রামের লোকেরা সেদিন মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে একটি নিচু টুলে বসে থাকতে দেখে এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের একধরনের হতাশা হয়, তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, সে নিজেকে ধরে রেখেছে; সকালের ম্লান আলোয় তার চেহারায় কেমন নির্লিপ্ততা লেগে থাকে, সে কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে না, এমনকি গ্রামের লোকেরা যখন বলে, কেমন আছ বাপু, তখনো সে নিরুত্তর থাকে। তাকে দেখে গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে না সে কতটুকু বিষণ্ন, তবে তাদের মনে হয় যে, সে খুব ক্লান্ত হয়ে আছে। তখন নইমুদ্দিন সরকারকে পুনরায় ধরে আনা হয় এবং তার ইমামতিতে মোবারক আলির উঠোনে পুনরায় দুলালির জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং তখন, মৃত্যুর কত দিন পর গ্রামের লোকেরা তা আর বলতে পারে না, মৃত বালিকার লাশ কবরের আশ্রয়ে নামিয়ে দেয়া হয়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, এই সময় তারা মোল্লা নাসিরের সেই সব আচরণ দেখতে পায়, যা দেখবে বলে তারা প্রথম থেকেই আশা করেছিল; গ্রামের লোকেরা যখন দুলালির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত তখন সে নির্লিপ্তের মতো টুলের ওপর চুপ করে বসে থাকে, জানাজার লাইনে দাঁড়ায় না, কবরে লাশ নামানোর পর বাঁশ এবং তালাই দিয়ে কবর ঢেকে দিয়ে গ্রামের লোকেরা যখন কবরের গর্তে মাটি ফেলতে থাকে তখন তারা তাকে, ক্যা বাপু আইসো, দুই মুঠ মাটি দেও, বলে ডাকে; কিন্তু সে তাদের কথায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না, বসে থাকা টুল থেকে উঠে গিয়ে কবরে মাটি ফেলার কাজে হাত লাগায় না। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, দুলালির জন্য মোল্লা নাসিরউদ্দিন আর জীবনে বিয়ে করে না এবং এই ঘটনায় তারা মোটেই অবাক হয় না; কারণ, দুলালির দাফনের দিনই তারা বুঝতে পেরেছিল, মোল্লা নাসিরউদ্দিনের মর্মের কত গভীরে প্রবেশ করেছিল এই বালিকার স্মৃতি এবং মৃত্যুর বেদনা। সেদিন দুলালির দাফন সম্পন্ন হয়ে গেলে গ্রামের লোকেরা ফিরে যাওয়ার পরও মোল্লা নাসিরউদ্দিন বসে থাকে, তখন আবুবকর সিদ্দিক তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর হাত রাখে এবং তার দিকে নীরবে তাকানো মোল্লা নাসিরকে বলে, চল ম্যাবাই, এহন বাড়িত যাই; আবুবকর সিদ্দিকের এই কথা শুনে একটি সুবোধ শিশুর মতো সে উঠে দাঁড়ায় এবং তার সঙ্গে মোবারক আলির ভিটা ত্যাগ করে আসে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মোল্লা নাসিরউদ্দিনের বিপর্যস্ততার বিষয়ে তারা বুঝতে পেরেছিল,

তবু পরদিন সকালে পুরনো অভ্যাবসবশত পাঁচজন কৃষক পাঁচটি মোরগের বাচ্চা নিয়ে মিয়াবাড়ির ভিটায় গিয়ে ওঠে, কিন্তু মোল্লা নাসিরউদ্দিন বাড়ির ভেতর থেকে বের হয় না এবং পাঁচটি মোরগের মুষ্ক অছেদিত থেকে যায়; বস্তুত এর পর মোল্লা নাসিরউদ্দিন সুহাসিনীতে আর কোনো দিন মোরগের বিচি কেটে বার করে না। গ্রামের লোকেরা বলে যে, দুলালির মৃত্যুতে মোল্লা নাসিরের অন্তর্গত ক্ষতির ভয়াবহতার স্বরূপ প্রকাশিত হয় যে দিন সে ঢাকা রওনা হয়; সে তিন দিন গ্রামে থাকে, তৃতীয় দিন দুপুরের পর তার সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে রওনা হয় কিন্তু মিয়াবাড়ির ভিটা থেকে নেমে সিরাজগঞ্জের রাস্তা না ধরে মোবারক আলির বাড়ির দিকে যায়। মোবারক আলির ভিটার পেছনে উত্তর কিনারায় জামগাছের নিচে দুলালির কাঁচা কবরের সামনে সে এসে দাঁড়ায় এবং দুহাত তুলে কবর জিয়ারত করতে থাকে এবং তখন, গ্রামের লোকেরা বলে যে, তার নিজের ওপর ধরে রাখা শেষ নিয়ন্ত্রণটুকু খসে যায়, তার অস্তিত্ব, তার অস্তিত্বের ভেতর থেকে মুক্ত হয়ে এক ঘোরের আবরণে ঢাকা পড়ে; তারা বলে যে, মোবারক আলির পরিবারের লোকেরা দুপুরবেলা বাক্স হাতে মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে দুলালির কবরের দিকে যেতে দেখে এবং একসময় তারা তার কথা ভুলে যায়, কিন্তু অনেকক্ষণ পর সূর্য যখন পশ্চিম দিকে গড়াতে শুরু করে মোবারক আলির বাড়ির লোকেরা মোল্লা নাসিরকে তখনো জামগাছের ঘন হয়ে আসা ছায়ার ভেতর, চোখ বুজে আকাশের দিকে দুহাত মেলে ধরে দুলালির কবরের পাশে দাঁড়ানো দেখতে পায়; মোবারক আলির বাড়ির লোকেরা তখন বিচলিত হয়, কিন্তু বুঝতে পারে না তারা কি করবে। এই কথা যখন গ্রামে প্রচারিত হয় তখন দুলালির কবর এবং জিয়ারতরত মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে ঘিরে একটি জনতা গড়ে ওঠে এবং তারাও হাত তুলে জামগাছের ছায়ার ভেতর দুলালির কবর জিয়ারত করায় দাঁড়িয়ে যায়। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, সেদিন তারা এই বিষয়টিও বুঝতে পারে যে, এই মেয়েটির মৃত্যুতে তাদের অস্তিত্বের ভেতর তারা নিজেরাও কতটা বিপর্যস্ত হয়েছিল; কারণ, তারা বলে যে, মোল্লা নাসিরের সঙ্গে জামগাছের ছায়ায় তারাও সেদিন এক ঘোরের ভেতর ঢুকে যায়। এই খবর যখন মিয়াবাড়িতে পৌঁছয় তখন গ্রামের পশ্চিম দিকে গাছপালার মাথায় হেলে পড়া সূর্য লাল হয়ে উঠেছে এবং তখন আবুবকর সিদ্দিক মোবারক আলির ভিটায় গিয়ে দেখে যে, অপরাহ্নের আধো-অন্ধকারের ভেতর দুলালির কবরকে ঘিরে একদল লোক তাদের দুই করতল আকাশের দিকে উঁচু এবং উন্মুক্ত করে ধরে আছে। সে যখন এই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কাঁধের ওপর আলতো করে তার কর স্থাপন করে, তখন মনে হয় যেন এক স্বপ্নের ভেতর থেকে জেগে উঠে সে চোখ খুলে তাকায় এবং তখন গভীর মমতায় আবুবকর সিদ্দিকের গলার স্বর ভারি হয়ে আসে; সে বলে, চল বাড়িত যাই ম্যাবাই, আইজ আর তর যাওয়া হইব না; এবং তখন মোল্লা নাসিরউদ্দিনের পেছনে সুহাসিনীর লোকেরা দুলালির কবরের পাশ থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপর বের হয়ে আসে। সেদিন গ্রামের লোকেরা দেখে যে,

আবুবকর সিদ্দিক কি এক অসীম মমতায় বড় ভাই নাসিরউদ্দিনকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখে ধীরপায়ে মিয়াবাড়ির দিকে নিয়ে যায় এবং তারা বলে যে, সে নাসিরউদ্দিনের বেদনার কথা ভুলতে পারে না।

একাত্তর সনে সুহাসিনীর পাশ দিয়ে মিলিটারি চলে যাওয়ার এক দিন পর, সকালবেলা আইজ্জল প্রামাণিকের বাইরের কাচারিঘরে সে যখন আলেকজানের মুখের দিকে তাকায়, তখন সে চেহারার ভেতর চোখ রেখে তার মনে হয়, এ রকম বেদনা কি ছিল দুলালির! আলেকজানের মুখের দিকে সেদিন তাকিয়ে তার নিজের যে কষ্ট হয়, সেই কষ্টের ভেতর মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কথা তার মনে পড়ে; কারণ, আলেকজানের মুখের দিকে তাকিয়ে, কেবল সেদিন, সেই মুহূর্তে, সে অনুধাবন করতে পারে যে, নারীর জন্য পুরুষ মানুষের যে বেদনা হয়, তার বর্ণ এবং প্রকৃতি ব্যাখ্যাযোগ্য হয় না; তখন তার সেই বেদনার ভেতর দাঁড়িয়ে সে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের বহুদিন পূর্বেকার আচরণের অর্থ মনে হয় যেন বুঝতে পারে। সে-বছর শেষ বুধবার সে যখন যুদ্ধ শেষে সুহাসিনীতে ফেরে তখন মিয়াবাড়ির পেছনের ঘাটে নৌকো থেকে নেমে আলেকজানকে সমাগত জনতার ভেতর দেখতে পেয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, কেমন আছিস তুই, তখন আলেকজানের গালের ওপর দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে নামে এবং তারপর আবুবকর সিদ্দিক এমন আচরণ শুরু করে, যার ব্যাখ্যা গ্রামের লোকেরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না; গ্রামের লোকেরা বলে যে, আবুবকর সিদ্দিকের স্মৃতির ভেতর হেমন্তের দুপুরে সরষে ক্ষেতের ওপর এক চপলা বালিকার নৃত্যের মুদ্রা এবং হাসির ধ্বনি রক্ষিত ছিল; পরবর্তী সময়ে আলেকজানের সঙ্গে তার যখন দেখা হয় তার মনে হয় যে, এই মুখ সুন্দরের চাইতে বেশি কিছু, কিন্তু তখন আলেকজানের বিষাদ এবং চোখের পানি ক্রমাগতভাবে সরষেক্ষেতের ভেতরকার সেই চিত্রটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়; গ্রামের লোকেরা বলে যে, তখন কোনো এক সময়, হয়তো যুদ্ধে যাওয়ার আগে অথবা যুদ্ধ থেকে ফেরার পর, সে এই চিত্রটি পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়; এবং সে চমকপ্রদ সব আচরণ করতে শুরু করে, ঢাকায় তার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সে গ্রামে থেকে যায় এবং সুহাসিনীর প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টার হয়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, আবুবকর সিদ্দিক সুহাসিনীতে সিদ্দিক মাষ্টার বলে পরিচিত হয়ে উঠলেও সে আসলে ছিল চিত্রকর, সে বাংলা ক্লাসে ক খ পড়াতে গিয়ে কোকিল এবং খরগোশ আঁকা শেখাতে থাকে এবং এর পরিণতিতে সুহাসিনী এবং এর আশপাশের গ্রামের বাড়িঘরের চেহারা বদলে যেতে থাকে। ঘরের বেড়া এবং মাটির ভিটা, কাঠকয়লা এবং গোলানো চুন দিয়ে শিশুদের আঁকা মাছ, পাখি আর মানুষের চিত্রে ভরে ওঠে এবং তখন একদিন, আর-এক হেমন্তের বিকেলে, চন্দ্রভান গায়ে একটা সাদা চাদর জড়িয়ে, ফৈজুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের উত্তর দিকে হেঁটে যায়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, চন্দ্রভানকে দেখে যদিও তারা বুঝতে পেরেছিল সে কোথায় যায়, তবুও এ

বিষয়ে তাদের একধরনের বিভ্রান্তি হয়, কারণ, সবকিছু জানার পরেও আবুবকর সিদ্দিকের আচরণই তাদেরকে বিভ্রান্ত করে; তারা বলে যে, মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর একদিন সকালে আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়িতে তার আলেকজানের সঙ্গে দেখা হয় এবং তখন তার সঙ্গে একটিও বাক্য বিনিময় না করে সে তাদের বাড়ি ত্যাগ করে আসে এবং তারপর আর একটি বারের জন্যও তাকে আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়িতে দেখা যায় না। সে একটি বছর গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, প্রাইমারি স্কুলে মাষ্টারি করে, বাচ্চাদের ছবি আঁকা শেখায়, আবুবকর সিদ্দিক থেকে সুহাসিনীতে সিদ্দিক মাষ্টার হয়ে ওঠে, কিন্তু এক বারের জন্যও আর এই নারীকে দেখে না। কিন্তু গ্রামের লোকের সকল বিভ্রান্তি এবং সংশয় দ্রুত কাটে, কারণ, আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়িতে চন্দ্রভানের সফরের পর তারা সব জানতে পারে এবং তারা তখন বলে যে, তারা প্রথম থেকেই ব্যাপারটা জানত, তা না হলে আবুবকর সিদ্দিকের গ্রামে থেকে যাওয়ার কোনো কারণ তারা দেখে না; তারা শুধু বুঝতে পারে নাই সে এক বছরের জন্য এ রকম মুখ দেখাদেখি বন্ধ কেন রেখেছিল। গ্রামের লোকেরা বলে যে, কারণ যা-ই হোক, সেই ক্ষণটি আসে এবং চন্দ্রভান বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়; তারা বলে যে, এক বছর না দেখলেও, একদিন আলেকজানের চার বছরের মেয়ে জয়তুনের কারণে আবুবকর সিদ্দিকের এই বিরহপ্রবণতা দূর হয় এবং তার মনে হয় যে, আলেকজানকে দেখা তার বড় প্রয়োজন। গ্রামের লোকেরা পরে বলে যে, হেমন্তের যে বিকেলে চন্দ্রভান তার ছেলে সিদ্দিক মাষ্টারের সঙ্গে আলেকজানের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আইজ্জল প্রামাণিকের বাড়িতে যায়, তার কয়েক দিন আগে ঘটনাটি ঘটে; ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষায় আবুবকর সিদ্দিক বাচ্চাদেরকে যার-যা-খুশি আঁকতে দেয় এবং এই ক্লাসে জয়তুনের আঁকা ছবিটা দেখে আবুকর সিদ্দিকের অজানা সংশয় দূর হয়। সেদিন ক্লাসে ছেলেমেয়েরা তাদের খাতার পাতায় গাছ, পাখি আর মানুষ আঁকে; জয়তুন আঁকে একটি মুখ, চাকার মতো বড় এবং গোল, একটি নারী মুখের মাথার ওপর থেকে ঝাঁটার শলার মতো সরল এবং শক্ত চুল ছড়িয়ে আছে এবং চোখের গহ্বর থেকে চালের দানার মতো গুঁড়ো গুঁড়ো অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আবুবকর সিদ্দিক যখন তার কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে তার ছবি আঁকা দেখে, বালিকাটি একমুহূর্ত থেমে মুখটা তার দিকে তুলে বলে, এইট্যা আমার মা; এই কথা শুনে আবুবকর সিদ্দিকের হৃদয়ে আলোর তরঙ্গের মতো ঢেউ প্রবাহিত হয় এবং সে যখন জানতে চায় ছবিটার চোখের নিচে এগুলো কী, তখন জয়তুন ছবির চুলের ওপর পেন্সিল ঘষে গাঢ় করে তুলতে তুলতে বলে, পানি, এইগুলান পানি, মা খালি কান্দে, এবং এই কথা শুনে আবুবকর সিদ্দিকের হৃদয়ে প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিষণ্ন বাতাসের মতো হাহাকার জেগে ওঠে। সেদিন আবুবকর সিদ্দিক জয়তুনের আঁকা ছবিটি খাতা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ি ফেরে এবং দুদিন পর গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে, আলেকজানের সঙ্গে সিদ্দিক মাষ্টারের বিয়ে এবং তখন সুহাসিনী এক উৎসবে মেতে ওঠে। সেদিন বিকেলে পাঙ্গাসির ইমাম

সাহেবকে ডেকে আনা হয় বিয়ে পড়ানোর জন্য এবং আইজ্জল প্রমাণিকের বাড়ির ভেতরে রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো একটি ঘরে এক হাজার এক টাকার দেনমোহর নির্ধারণ করে বিয়ে পড়ানোর পর উঠোন ভর্তি কৃষকেরা ইমাম সাহেবের সঙ্গে হাত তুলে মোনাজাত করে, তারপর শেষে একটা করে জিলাপি খেয়ে বাড়ি ফিরে যায়। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মিয়াবাড়িতে নিয়ে আসার পর সেদিন রাতে আলেকজান লম্বা করে ঘোমটা টেনে, দুই বাহুর ভেতর জয়তুনকে নিয়ে তার জীবনের দ্বিতীয় বাসরে প্রবেশ করে, তখন আবুবকর সিদ্দিক এক বছর পর এই নারীর মুখের দিকে তাকায়, এবং এক বছর আগে মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে সুহাসিনীর মাটিতে পা রেখে আলেকজানকে যে কথা জিজ্ঞেস করেছিল, পুনরায় সেই কথা জিজ্ঞেস করে, কেমন আছিস আলেকজান? গ্রামের লোকেরা পরে এই সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করে, তারা বলে যে, আবুবকর সিদ্দিকের কণ্ঠের ধ্বনি শুনে আলেকজানের নমিত মুখ আবুবকর সিদ্দিকের দিকে উত্থিত হয়, তার ঘোমটার আঁচল সরে যায় এবং তখন কেরোসিনের হারিকেনের আলোয় পূর্ণিমার চাঁদের মতো ভরা এবং মধুরঙের মুখটি স্বর্গীয় বিভায় প্রকাশিত হয়। এই সময় তার চেহারায় কোনো বিষণ্নতা অথবা আনন্দ খেলা করে কি না আবুবকর সিদ্দিক তা বুঝতে পারে না, তবে এই সময়, এক বছর আগের মতোই তার বাহুর ভেতর জড়ানো ছিল জয়তুন এবং আবুবকর সিদ্দিকের প্রশ্ন শুনে হারিকেনের আলোয় বিকশিত তার মুখে অশ্রুধারা নেমে আসে। আলেকজানের চোখে বিয়ের রাতে পানি দেখে তার মন খারাপ হয়ে যায়, সে বুঝতে পারে না, আলেকজান কেন এই দিনেও কাঁদে; তখন সে উঠে গিয়ে তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে জয়তুনের আঁকা ছবিটা বের করে এবং ভাঁজ খুলে আলেকজানের সামনে মেলে ধরে বলে, মা খালি কান্দে; গ্রামের লোকেরা বলে যে, তখন আবুবকর সিদ্দিকের অপেক্ষার শেষ হয়, কাকতাড়ুয়ার মতো এই ছবিটার দিকে তাকিয়ে চোখের চিকচিকে অশ্রুর ভেতর আলেকজানের মুখে একটি নীরব হাসি ছড়িয়ে পড়ে এবং আবুবকর সিদ্দিক তার বাসর-রাতে এক বাহুর ভেতর আলেকজান এবং অন্য বাহুর ভেতর জয়তুনকে নিয়ে ঘুমায়। পরবর্তী সময়ে, ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা রাতের পরদিন গ্রামের লোকেরা ঘরের মেঝের ওপর সিদ্দিক মাষ্টার এবং তার দুই দিকে দুই বাহুর ভেতর আলেকজান এবং তাদের ছেলে পরাগের পুড়ে যাওয়া দেহ দেখতে পায়।

পূর্ণিমায় হত্যাকাণ্ডের পরদিন গ্রামের লোকেরা সিদ্দিক মাষ্টারসহ মফিজুদ্দিন এবং তার পরিবারের অন্য সকলকে একটি লম্বা গণকবরে দাফন করে; শুধুমাত্র মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কবরটি বিচ্ছিন্ন একা পড়ে থাকে, যতদিন পর্যন্ত না সুহাসিনীর লোকেরা তার কবরের পাশে মৃত দুলালির দ্বিতীয় কবর রচনা করে। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন জীবনে কখনো স্বীকার না করলেও মৃত দুলালির কারণে তার হৃদয়ে এক ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং মোল্লা নাসিরউদ্দিন সংসারবিবাগী হয়ে গেলে এই ক্ষত চিরস্থায়ী

তার কবরটির বিষয়ে সে বিশেষ সচেতন এবং স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, দুলালির মৃত্যুর কয়েক বছর পর যখন মোবারক আলি এবং তারপর ছমিরুন্নেছা মারা যায় তখন দুলালির ভাইয়েরা এই গ্রাম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা সিরাজগঞ্জের বাহিরগোলা স্টেশনের.কাছে শিয়ালকোল গ্রামে জায়গা কিনে সুহাসিনীর ঘর ভেঙে নিয়ে গিয়ে সেখানে ওঠায়। সে সময় মফিজুদ্দিন মিয়া যখন কথাটা শোনে, সে খুব বিচলিত হয়ে পড়ে; তখন সে মোবারক আলির বড় ছেলে আব্দুল জলিলকে একদিন ডেকে পাঠায় এবং সে এলে পরে মিয়াবাড়ির বৈঠকখানায় বসে তাদের ভিটা কেনার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, অন্য ক্ষেত্রে যা-ই হোক, এ ক্ষেত্রে মফিজুদ্দিন মিয়া মোবারক আলির বাড়ির ভিটা কিনতে চায় দুলালির কবরটার জন্যই; কিন্তু আব্দুল জলিল তা বুঝতে পারে না, তার বরং অতীতে মফিজুদ্দিনের সব আচরণের কথা মনে পড়ে এবং সে পরিষ্কার বলে দেয় যে, তাদের বাপ-মায়ের কবরসহ এই ভিটা তারা কোনো অবস্থায়ই মফিজুদ্দিনের কাছে বিক্রি করবে না। গ্রামের লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন তখন তার পুরনো পরিচয়ে প্রকাশিত হয় এবং আব্দুল জলিলকে বলে যে, জোলা মোবারক আলির এই ভিটা যদি তারা বেচতে চায় তবে তা তার কাছেই বেচতে হবে, এই গ্রামের অথবা অন্য কোনো গ্রামের কেউ এই ভিটা কিনবে না। সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মোবারক আলির এই ভিটা কিনতে পারা সুরধ্বনির খাঁদের জন্য খুবই জরুরি ছিল, কিন্তু মফিজুদ্দিনের কারণে এই জমি তাদের কেনা হয় না, এবং মফিজুদ্দিন যেমন বলেছিল এই ভিটা তেমনি অবিক্রীত পড়ে থাকে; তখন কয়েক বছর পর মোবারক আলির ছেলেরা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে এবং মফিজুদ্দিনের কাছে তাদের জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো ভিটা শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে। গ্রামের লোকেরা বলে যে, দুলালির কবর সংরক্ষণ এবং রায়গঞ্জ থেকে আসা রাস্তাকে সুরধ্বনি গ্রামের দিকে যেতে না দেয়া, এর ভেতর মফিজুদ্দিনের কোন ইচ্ছেটা ছিল আসল, তা তারা বলতে পারে না; তবে তাদের মনে হয় যে, মফিজুদ্দিন এই সময় এই দুটো বিষয়ই নিশ্চিত করতে চায় এবং তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে তা করে। তার মৃত্যুর পর ইদ্রিস খাঁ যখন জেল থেকে বের হয়ে গ্রামে ফেরে তখন গ্রামে প্রথম যে কাজগুলোয় সে হাত দেয়, তার একটি হচ্ছে রায়গঞ্জ থেকে আসা রাস্তাটিকে সুরধ্বনি গ্রাম পর্যন্ত নির্মাণ করা এবং তখন, একদিন সুহাসিনীর লোকেরা যখন মোবারক আলির ভিটার ওপরকার কবর ভেঙে রাস্তা তৈরি করার কথা শোনে, তাদের দুলালির কথা মনে পড়ে যায়।

গ্রামের লোকেরা যখন শোনে যে, একদল মাটিকাটা কামলা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় মাটি কেটে খাল ভরাট করে রাস্তা বানাতে শুরু করেছে, তারা প্রথমে শুধু একবার ভাবে যে, এতদিন পর এই রাস্তা এবার তাহলে সুরধ্বনি গ্রামে যাবে, তারপর তারা তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং বিষয়টি ভুলে যায়। তখন একদিন দুপুরের পর তারা জানতে পারে যে, নির্মীয়মাণ এই রাস্তা মোবারক আলির ভিটার ওপর উঠে

এসেছে এবং মাটি কাটা কামলারা ভিটার ওপরকার ছটি কাঁচা কবর ভাঙতে শুরু করেছে; তখন, সেই মুহূর্তে, তাদের বহুদিন পূর্বে মৃত বালিকা দুলালির কথা মনে পড়ে এবং তারা তাদের কাজ ফেলে দ্রুত মোবারক আলির ভিটায় গিয়ে হাজির হয়। তারা যখন মোবারক আলির ভিটায় পৌঁছয়, তারা দেখতে পায় যে, মাটিকাটা কামলারা ইতোমধ্যে পাঁচটি কবর খুঁড়ে হাড়গোড় বের করে এক পাশে জড়ো করেছে এবং সর্ব উত্তরের ছয় নম্বর কবরটিও তারা মাটি খুঁড়ে আলাগা করেছে। গ্রামের লোকেরা তারা বলে যে, তারা ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল, ষষ্ঠ কবরটি দেখে তারা চিনতে পারে যে, এটা দুলালির কবর এবং তখন তারা মাটি কাটা কামলাদের নিবৃত্ত করে, এবং তখন তাদের মোল্লা নাসিরউদ্দিন এবং তার নিঃসঙ্গ কবরটির কথা স্মরণ হয়। সুহাসিনীর কৃষকেরা তখন দুটো লম্বা বাঁশের ওপর একটা তালাই ফেলে খাটিয়া বানায় এবং কলাপাতা কেটে এনে তার ওপর পাতে, তারপর তারা কবরের খুঁড়ে তোলা আলগা মাটি সরিয়ে দুলালির অস্থি ও করোটি সংগ্রহ করে কলাপাতার ওপর রাখে। তখন অন্য কবরের হাড়গুলো একটি গর্ত করে পুঁতে ফেলার পর দুলালির হাড়ের ওপর একটি গামছা বিছিয়ে দিয়ে গ্রামের লোকেরা এই খাটিয়া কাঁধে তুলে নেয় এবং গ্রামের রাস্তা ও ফসলের মাঠের ওপর দিয়ে মিয়াবাড়ির ভিটার দিকে যায়। সেদিন মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কবরের পাশে দুলালির শেষ অস্থির কবর রচনা করার পর গ্রামের লোকেরা যখন শেষ বিকেলের আলোয় ভিটার ওপর থেকে নেমে আসে, তারা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে যে, মিয়াবাড়ির ভিটার পাশ দিয়ে পুব আকাশে এক বিরাট পূর্ণিমার চাঁদ সুহাসিনীর বাড়িঘর, পথ এবং ফসলের মাঠের দিকে তাকিয়ে জেগে উঠেছে।

গ্রামের লোকেরা তখন এই পূর্ণিমার কথা বলে। তারা বলে যে, দুলালির অস্থিসমূহ মোল্লা নাসিরউদ্দিনের কবরের পাশে নূতন এক কবরে দাফন করার পর তারা যখন যার যার বাড়িতে ফেরে, সেদিন রাতে তাদের ভিটার বাড়িঘর এবং গাছপালার ওপর অঝোর ধারায় জ্যোৎস্না ঝরে পড়ে। তারা বলে যে, তারা যখন তাদের হাত শোঁকে তখন তারা তাদের হাতে দুলালির কবরের মাটির সোঁদা গন্ধ পায় এবং দেখে যে, গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে, নরম এবং স্মিতমুখী এক বালিকার ভরা মুখের মতো এই চাঁদ গড়িয়ে যায়। এই চাঁদের কথা যখন গ্রামের লোকেরা বলে তখন তারা তোরাপ আলির কথা শুনতে পায়, সে পুনরায় চাঁদ সম্পর্কে বহুকাল আগে অর্জিত তার বিদ্যার কথা বলে। সে বলে যে, তার ওস্তাদ তাকে চাঁদের রহস্যের কথা বলেছিল, ওস্তাদ আমাক কইছিল যে, জীবনে যদি চান্দের পাহাড় বড় হয়্যা ওঠে তাইলে তা ভালো এবং খারাপ, দুই-ই, চান্দের আলোর মইদ্দে গেলে কেমন নেশার নাহাল নাগে, বোঝা যায় না, ঘুমায়া, না জাইগা আছি; যা-ই দেহি তাই মনে হয় ঠিক কিন্তু আবার তা ঠিকও না; তোরাপ আলি বলে যে, দুলালির জীর্ণ হাড় সংগ্রহ এবং সেই হাড়ের নূতন কবর রচনা করার পর, সেদিন রাতে সে তার বাড়ির ভিটার এক পাশে পেশাব করতে বসে, তখন সে চাঁদটিকে

পুনরায় দেখে এবং তার আলোয় সে প্লাবিত হয়ে যায়। সে বলে, আমার এমন নাগে এই চান দেইখ্যা, আমি কইব্যার পারি না ক্যামন নাগে; তহন, আমি যহন খাড়া হই, মনে হয় যানি চান্দের আলো না, আমি পানির মইদ্দে ভাইসা উইঠল্যাম; আমার হাত-পাউ, সারা শরীল হালকা হয়া যায়; এমন নেশার নাহাল নাগে যে, তহন আমি আমার দোস্তো বাহের তালুকদারের নাম ধইর‍্যা চিক্কুর দিয়্যা উঠি, ওই বাহের, বাহের রে; কেন যে এই রহম চিক্কুর দেই, কইব্যার পারি না, এমনি দেই; ছাওয়াল-পাওয়াল যেমন বৃষ্টি দেইখলে নাপ পাড়ে, আমারও তেমনি ওই চান্দের আলোয় চিক্কুর দিব্যার ইচ্ছা করে, আর আমি চিক্কুর দিয়া উঠি; এবং সে বলে যে, এরপর সে ঘরে ফিরে আসে। গ্রামের লোকেরা যখন তোরাপের কথা শোনে, তারা স্মরণ করতে পারে না সেদিন তারা তার চিৎকার শুনেছিল কি না, তবে তারা বলে যে, সেদিন নেশা লাগানোর মতো জ্যোৎস্না ছিল সুহাসিনীতে।